শরৎ-সান্নিধ্যে

ডক্টর শ্রীকালিদাস রায় (কবিশেখর)

প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা

৫, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট: কলিকাতা-১২

প্রথম প্রকাশ : নভেম্বর, ১৯৫৭

প্রকাশক : বি. ভট্টাচার্য, এন. ভট্টাচার্য এণ্ড কোং
১৩ কলেজ রো, কলিকাতা-৯
মুদ্রাকর : শ্রীদিলীপকুমার চৌধুরী, সরস্বতী প্রেস,
১২ পটুয়াটোলা লেন, কলিকাতা-৯ হইতে মুদ্রিত।

ভূমিকা

শরৎচন্দ্রের শেষজীবনে যাঁরা তাঁর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে এসে তাঁর অফুরন্ত স্নেহলাভে ধন্য হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম কবিশেখর কালিদাস রায়। তিনি ছিলেন শরৎচন্দ্রের একনিষ্ঠ ভক্ত, বহু নিভৃত নর্মালাপের অনুরাগী শ্রোতা এবং তাঁর সাহিত্যের বিদগ্ধ বোদ্ধা। শরৎচন্দ্রের তিরোধানের পর কবিশেখর তাঁর সম্পর্কে অনেক কিছু লিখেছেন—কখনো বিচ্ছেদকাতর অন্তরে স্বতঃস্ফূর্ত তাগিদে; কখনো বা অপরের সনির্বন্ধ অনুরোধে। তাঁর দুইখণ্ডে রচিত ও প্রকাশিত 'শরৎ-সাহিত্যে' তিনি শরৎচন্দ্রের সাহিত্য সম্পর্কে মৌলিক অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন বিচার-বিশ্লেষণ করেছেন। কৌতূহলী ও রসিক-সমাজের কাছে তাঁর আলোচনা বিশেষ আদৃত হয়েছে।

কবিশেখর বহু পত্র-পত্রিকায় শরৎচন্দ্র সম্পর্কে স্মৃতিচারণ করেছিলেন। সেগুলি এতদিন তাঁর পুত্রদের কাছে বিক্ষিপ্ত ও অবিন্যস্ত অবস্থায় সংরক্ষিত ছিল। উৎসাহী প্রকাশক শ্রীভুবন ভট্টাচার্য মহাশয়ের অনুরোধে তাঁরা লেখাগুলি সুবিন্যস্ত আকারে প্রকাশ করবার জন্য আগ্রহী হয়েছেন। কবিশেখর সুস্থ থাকলে তিনি নিজের লেখাগুলি নিজেই সাজিয়ে-গুছিয়ে প্রকাশ করতে পারতেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তিনি এখন চেতনার সীমানা ছাড়িয়ে গেছেন, জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে এসে তাঁর সকল কথা শুধু কেবল মৃদু ওষ্ঠকম্পনের মধ্যে অস্ফুট হয়ে আছে। তাঁর পুত্রগণ এবং ভুবনবাবুর অনুরোধে আমি তাঁর বিক্ষিপ্ত লেখাগুলি সুবিন্যস্তভাবে পারম্পর্য রক্ষা করে একটি অখণ্ড গ্রন্থের আকারে তুলে ধরেছি। পুনরুক্তি দূর করবার জন্য কোনো-কোনো লেখার কিছু-কিছু অংশ বর্জন করেছি। তাই বলে কিন্তু কোথাও আমার নিজের রচনা ঢুকিয়ে দিইনি। তবুও কিছু কিছু পুনরুক্তি হয়তো লক্ষ্য করা যাবে। সেগুলি বাদ দিলে প্রসঙ্গের অবিচ্ছিন্নতা নষ্ট হবে ভেবে সেগুলি অনর্থক বর্জন করিনি।

এই স্মৃতিচারণমূলক গ্রন্থটি শরৎচন্দ্রের জীবনকথা ও ব্যক্তিমানস সম্পর্কে জিজ্ঞাসু পাঠকসমাজের ভালো লাগবে বলেই আমার বিশ্বাস। শরৎচন্দ্রের জন্মশতবর্ষ পূর্তির প্রাক্কালে গ্রন্থটি প্রকাশ করা খুবই সমীচীন হয়েছে।

—অজিতকুমার ঘোষ

এক

প্রীতির আসনে অভিষেক

শরৎচন্দ্রের সঙ্গে আমার প্রথম দেখা হয় কর্নওয়ালিস ষ্ট্রীটে যমুনা পত্রিকার অফিসে। বৎসরটার কথা এখন ঠিক মনে নেই। তখন স্কটিশ চার্চ কলেজে পড়ি। আমি Psychology পড়ছি তখন Stephen সাহেবের কাছে। মনস্তত্ত্ববিদ্ হয়ে উঠছি বলে মনে বেশ একটু অভিমানও জন্মেছে। মনে আছে তাঁর 'বিরাজ বৌ' সম্বন্ধে প্রথম দিন তাঁর সঙ্গে আমার আলোচনা হয়। তাতে আমি সাহস করেই বলেছিলাম—"এই বইখানায় Psychologyর সঙ্গে আপনি Pathology মিশিয়ে ফেলেছেন। তাতেও দোষ হত না, যদি বিরাজ বৌ-এর Pathological Conditionটা Normal Psychological Conditionএর অনুগামী হত। সতীত্বই যার ধ্যান, জ্ঞান, স্বামিসেবাই যার ব্রত তার মানসিক অবস্থার যদি বিকারই ঘটে, তবে তদনুযায়ীই ঘটবে। সে পরপুরুষের নৌকায় চলে যাবে কেন?"

এর উত্তরে শরৎচন্দ্র বলেছিলেন, "কখানা Psychologyর বই তুমি পড়েছ? মানুষের জীবনে যা ঘটে, মানুষ বিচিত্র অবস্থায় যা ক'রে বসে, তাই লক্ষ্য করে শেষে generalise করে Psychologyর নিয়ম তৈরী হয়। আমার নিজের অভিজ্ঞতায় যা পেয়েছি, নিজের চোখে যা দেখেছি আমি তাই লিখে থাকি। Psychologyর বই পড়ে আমি গল্প লিখি না। যে সত্য আমি প্রত্যক্ষ করেছি তাকেই আমি গল্পের রূপ দিই। 'বিরাজ বৌ'-এর ঘটনা সত্যসত্যই ঘটেছে বলেই জানি।"

এর পর আমি কখনো তাঁর লেখা সম্বন্ধে দ্বিধা প্রকাশ করে কিছু বলিনি, কখনো তাঁর বইএর কোন ব্যাপারকে অস্বাভাবিক বা অসঙ্গত বলতে সাহস করিনি। অপরে হয়তো কোন কোন ব্যাপারের স্বাভাবিকতা সম্বন্ধে সংশয় প্রকাশ করেছেন। সব সময়ে তিনি একই জবাব দিয়েছেন—"আমার নিজের চোখে দেখা।" নয়ত বলেছেন,—"আমার নিজের জীবনেই এমনটি ঘটেছে।"

বহু বৎসর পরে তিনি একদিন গল্পচ্ছলে বলেছিলেন—"কালিদাস, মানবচরিত্র অতি বিচিত্র হে! বইএ তার অতি সামান্য পরিচয়ই পাওয়া যায়। বর্মার ছুতোরপাড়ায় একজন বাঙ্গালী ছুতোর ছিল। সে কঠিন রোগে শয্যাগত হল।

প্রায় এক বৎসর ভুগে ভুগে সে মারা গেল। এই এক বৎসর ধরে তার স্ত্রী তাকে প্রাণপণে সেবা করল। সে একদিকে সেবা করত, আর একদিকে দুঃখ মেহনৎ করে সংসার চালাত। আমরাও তাকে কিছু কিছু সাহায্য করতাম। লোকটির চিকিৎসারও ব্যবস্থা করা হয়েছিল। ঐ স্ত্রীলোকটির স্বামিসেবা দেখে আমরা অবাক হয়েছিলাম। এমন সতী নারী বামুন-কায়েতের ঘরেও জন্মায় না। লোকটি মরে গেলে তার স্ত্রী অবিরত কান্নাকাটি করত। তারপরে সে অন্যত্র চলে গেল। তিন চার বৎসর পরে একদিন বর্মার একটা ছোট শহরে দেখলাম সে কাঠের দেওয়াল থেকে ঘুঁটে ভাঙ্গছে। আমাকে দেখে সে ছুটে এসে প্রণাম করল। একটা এক বছরের ছেলে তার কোলে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম—কিরে, তুই এখানে কতদিন আছিস? এ ছেলে কার? সে নতমস্তকে বলল—দাদাঠাকুর কি আর বলব? সবই বুঝছেন। কি করব দাদাঠাকুর, পেট আর চলে না, বয়সও কম, কে বা দেখাশোনা করে? একটা হিল্লে পেয়েছি। ছেলেটির বাবা একটা কারখানায় কাজ করে।"

শরৎচন্দ্র বললেন—আমি ভাবতে ভাবতে এলাম যে, এই সেই সতী শিরোমণি! তখনি মনে হ'ল সেটাও সত্য, এটাও সত্য। এর মধ্যে কোন অসামঞ্জস্য বা অস্বাভাবিকতা নেই। আমাদের জ্ঞানই অল্প।

বহু বৎসর পূর্বে 'বিরাজ বৌ' সম্বন্ধে সংশয়মূলক প্রশ্নের আবার উত্তর পেলাম।

বালিগঞ্জে বাড়ী তৈরী করে শরৎচন্দ্র বাস করতে লাগলেন। প্রথম আলাপের পর বহু বৎসর অতীত হয়েছিল। মাঝে মাঝে দেখা হয়েছিল,—বিশেষ কোন উল্লেখযোগ্য কথাবার্তা হয়েছিল বলে তেমন মনে পড়ে না। মনে পড়ে একবার আমাকে নির্বিচারে পুস্তকাদি সম্বন্ধে মতামত দেওয়ার জন্য তিরস্কার করেছিলেন,

"কালিদাস, এখন তুমি সাবালক হয়েছো, নাম খ্যাতিও হয়েছে, একটা Position হয়েছে। এখন যে কেউ একখানা বই দিয়ে গেলে নির্বিচারে প্রশংসা করো না। তোমার কথার কিছু মূল্য আছে, তুমি স্বীকার না করলেও আমরা তা করি। কবে তোমার দায়িত্বজ্ঞান হবে?"

আমি বললাম—"দাদা, ব্যাপার কি? কোথায় কার বই সম্বন্ধে মতামত দিলাম?"

শরৎচন্দ্র বললেন—"এক পণ্ডিত একখানা কবিতার বই নিয়ে আমার কাছে গিয়েছিল। বইখানায় চোখ বুলিয়ে দেখলাম রাবিশ। বললাম, 'কিছু হয়নি পণ্ডিতমশায়।' সে বললে—সে কি মশায়? কালিদাসবাবু বইটির সুখ্যাতি

করেছেন। আমি বললাম, আমি তাকে জানি, সে কিছুতেই এ বইয়ের প্রশংসা করতে পারে না।

পণ্ডিত তার থলে থেকে এক প্রশংসাপত্র বার করলে, দেখলাম সত্যিই তোমার হাতের লেখা। কেমন যেন অপ্রতিভ হয়ে গেলাম। বললাম, আচ্ছা বই রেখে যান, ভাল ক'রে পড়ে দেখব। দেখ দেখি নির্বিচারে প্রশংসাপত্র দিয়ে কি মুসকিলেই ফেলেছ। তুমি তো দু'কলম লিখে দিয়েই দায়খালাস। আমাদের প্রাণ যে যায়। এ কুকর্ম আর ক'রো না।"

একদিন আমাকে সঙ্গে করে শরৎচন্দ্র কর্নওয়ালিস ষ্ট্রীটের এক বড় প্রকাশকের দোকানে ঢুকলেন। দোকানের কর্তা একটা চেয়ারে বসেছিলেন, তাঁর টেবিলের এধারে একটা বেঞ্চি ছিল, আর কোন চেয়ার ঘরের মধ্যে ছিল না। তিনি গিয়ে সেই বেঞ্চিতে বসলেন—আমি দাঁড়িয়েই রইলাম। তিনি বললেন—"বোসো হে কালিদাস, যেখানে যা ব্যবস্থা।" অনুচ্চ কণ্ঠে বললেন—"তোমার দাদা হ'য়ে আমি বসলাম—তোমার আর আপত্তি কি ?"

দোকান থেকে বেরিয়ে এসে বললেন, "দেখ প্রকাশকদের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার কি কোন উপায় নেই ? লেখকদের এ দুর্দিন কি কোনদিনই ঘুচবে না ? একটা Authors' Association করলে কেমন হয় ?"

তারপর শিবপুরের কবি গিরিজাকুমার বসুর বাড়ীতে তিনি সাহিত্যিকদের একটা সম্মেলন ঘটিয়েছিলেন। তাতে তিনি এই প্রস্তাব তোলেন। এ প্রস্তাব বেশী দূর আগায়নি। অবশ্য তাঁরও এ বিষয়ে চিন্তা করবার আর প্রয়োজন হয়নি।

শরৎচন্দ্রের বালিগঞ্জ আসবার আগে একটা অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেছিল। টাউনহলে শরৎচন্দ্রের একটা সংবর্ধনা দেওয়ার উদ্যোগ চলছিল। ঠিক সেই সময়ে মহাত্মা গান্ধী উপবাস করেছিলেন। আমাদের রসচক্রের চারজন সদস্য লেখকের সঙ্গে আমি একটা চিঠিতে সই করতে বাধ্য হয়েছিলাম। সে চিঠি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। তাতে এ সংবর্ধনা স্থগিত রাখতে উদ্যোক্তাদের অনুরোধ করা হয়েছিল। তাতে বিশেষ ফল হয়েছিল কিনা জানি না। সংবর্ধনার দিন হিজলী দিবস ছিল, সেজন্য কয়েকজন যুবক তাঁর গাড়ীর সামনে সত্যাগ্রহ করে। তাঁর সংবর্ধনা বন্ধ করবার জন্য তারা নানাভাবে চেষ্টাও করে। ফলে, সংবর্ধনা আশানুরূপ হয় নি। আমি উমাপ্রসাদের মুখে শুনেছিলাম, তিনি এজন্য রাগ করেছিলেন। সেকথা শুনে আমি ক্ষমা প্রার্থনা করে তাঁকে একটি পত্র লিখি। সে পত্রের উত্তরে তিনি লিখেছিলেন—"আমার কোন রাগ নেই। রাগ হয়েছিল বটে, কিন্তু চিন্তা করে দেখলাম, তোমার কোন দোষ নেই। তবে তোমার

মনের জোরও নেই। সেটা আমি জানি বলেই তোমার ওপর রাগ করতে পারি নি।"

আমার মনের একটা খটকা কিন্তু কিছুতেই গেল না। অভিনন্দন স্থগিত রাখতে উদ্যোক্তাদের অনুরোধ করা হয়েছিল, বন্ধ করার জন্য তো নয়। যিনি অভিনন্দনীয় তিনি রাগ করলেন কেন? তাঁর তো সম্পূর্ণ উদাসীন থাকবারই কথা। এর উত্তর আমি অনেক দিন পরে পেয়েছিলাম—যশোর রোডের এক বাগানবাড়ীতে।

শরৎচন্দ্রের বিশেষ আগ্রহ ও অর্থসাহায্যে যশোর রোডের এক বাগান-বাড়ীতে ঔপন্যাসিক অসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়ের অভিনন্দন হয়। অভিনন্দন দেওয়া হল রসচক্র থেকে। শরৎচন্দ্র তখন আমাদের রসচক্রের সভাপতি। তিনিই এই অভিনন্দন দেওয়ার জন্য আগ্রহান্বিত হন এবং সবচেয়ে বেশি টাকা চাঁদা দেন।

বলা বাহুল্য, তিনিই অভিনন্দন সভারও সভাপতি ছিলেন। অভিনন্দন-পত্রে নিজের নাম স্বাক্ষর করেন। অভিনন্দন শেষ হওয়ার পর তিনি আমাকে বললেন—"কালিদাস, এবার তোমাকে একটা অভিনন্দন দিতে হবে। আমি একশ টাকা দেব এবং নিজেই মানপত্র লিখব।"

ব্যারিস্টার কবি সুরেশচন্দ্র বিশ্বাসকে তিনি অভিনন্দনের আয়োজন করতে বলেন। আমি তাঁকে বুঝিয়ে দিলাম—অভিনন্দন নিলে আমার খুব ক্ষতি হবে। চারদিক থেকে অপমান গালাগালি ব্যঙ্গ বিদ্রূপ বর্ষণ হবে। আমি তা সহ্য করতে পারব না। আমার সাহিত্যিক Position এমন নয় যে সাহিত্যসমাজ অম্লানবদনে প্রসন্নচিত্তে আমার অভিনন্দনের অধিকার স্বীকার করে নেবে।

তিনি আমার আবেদনের মর্ম বুঝলেন এবং বললেন—"তুমি পছন্দ করছ না যখন তখন থাক। তবে আমি অভিনন্দন দিতে যেমন ভালবাসি, পেতেও তেমনি ভালবাসি। আমি আমার অভিনন্দনে নিজেকে শুধু অভিনন্দিত মনে করি না—উপেক্ষিত অনাদৃত বঙ্গসাহিত্যকেই অভিনন্দিত বলে মনে করি।"

বালিগঞ্জে শরৎচন্দ্র বাস করতে এলেন। এসেছেন শুনলাম, কিন্তু একদিনও গেলাম না। কেমন একটা লজ্জা ও সঙ্কোচ মনে রয়েছে। দ্বিধাও আছে, জানি না কি ভাবে তিনি এখন আমাকে গ্রহণ করবেন।

সহসা একদিন আমার রাজা বসন্ত রায় রোডের বাসাবাড়ীতে তিনি উপস্থিত হলেন। শরৎচন্দ্র বললেন—"আমি কি অপরাধ করলাম, আজ দুমাস এখানে এসেছি। আজো একদিনও গেলে না। ব্যাপার কি? আমাকে এমন ক'রে

ত্যাগ করলে কেন? আমি এলাম তোমাদের সঙ্গ পেতে, আর তুমি দূরে স'রে থাকলে।"

আমি দু-একটা বাজে ওজর দেখিয়ে দোষ কাটাতে চেষ্টা করলাম। তারপর থেকে অবশ্য সপ্তাহে অন্ততঃ তিন দিন তাঁর সঙ্গ পেয়েছি। বলা বাহুল্য, জীবনে অত বড়লোকের সান্নিধ্য আমি কোনদিনই আর পাইনি। কত নামজাদা লোকের সঙ্গেই তো আলাপ আছে, কেউ এত ভালবেসে বুকের কাছে টেনে নেন নি। জীবনে এই একটা মানুষই পেয়েছিলাম। আমার জীবনের সেই কয়টি বছর তাঁর সাহচর্যের সোনা দিয়ে বাঁধানো হয়ে রয়েছে।

তিনি এতই নিকট ছিলেন যে, তাঁকে শরৎদাদা বলে ডাকতাম। একদিন তিনি বললেন—"দাদাই যদি বল, তবে নাম ধরে দাদা বল কেন।"

তারপর থেকে শুধুই দাদাই বলতাম—শরৎদাদা আর বলিনি।

তিনি প্রায়ই আমার বাসায় এসে কাঠের চেয়ারে বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা গল্প করে কাটাতেন। প্রতি রবিবারের সন্ধ্যাবেলায় আমার বাসায় রসচক্রের বৈঠক বসত। প্রায় প্রত্যেকটিতেই তিনি আসতেন। যেদিন রবিবাসরের সভা থাকত সেদিন রবিবাসরের সভাভঙ্গের পরও সেখান থেকে বরাবর চলে আসতেন।

তিনি একদিন বললেন—রসচক্রের মজলিসটা তুমি আমার বাড়ীর কাছাকাছি বসাও তো ভাল হয়। তখন রসচক্রের বৈঠক আমার শিল্পী বন্ধু সতীশচন্দ্র সিংহের বাড়ীতে স্থানান্তরিত করলাম। তিনি সতীশকেও ছোট ভাই-এর মতই ভালবাসতেন, তিনি বৈকাল থেকে সেখানে এসে বসতেন। রসচক্রের প্রত্যেকের সঙ্গে তিনি ঘনিষ্ঠভাবে আলাপ করতেন, কাউকেও কোনদিন অবজ্ঞা করেন নি। বলা বাহুল্য, আমাদের মধ্যে সকলেই তো সাহিত্যিক ছিলেন না। কিন্তু তাঁর সে ভেদজ্ঞান ছিল না।

মানুষ যতটা উপরে উঠলে নীচের সব উঁচু-নীচু জিনিসকে সমতলের অঙ্গীভূত মনে হয়, তিনি ততটা উপরেই সেদিন উঠেছিলেন। তাঁরই আগ্রহে কলিকাতার উপকণ্ঠে কোন-না-কোন বাগানবাড়ীতে আমাদের বাৎসরিক উৎসব জমত। তিনি চলে গিয়েছেন—তারপর কর্ণরথের চক্রের ন্যায় রসচক্রকে পৃথিবী গ্রাস করেছে।

হতভাগ্য আমি কত বড় দরদী বন্ধুই না হারিয়েছি। আমার একটি শিশুপুত্রের সাংঘাতিক পীড়া হয়। এই সময়ে তিনি প্রত্যহ এসে খোঁজ নিতেন, চিকিৎসা সম্বন্ধে উপদেশাদি দিতেন—শিশুটিকে কোলে করে কান্না থামাবার চেষ্টা করতেন। তার মৃত্যু হলে আমি কাতর হয়ে পড়েছিলাম। তিনি প্রত্যহ

বৈকালে এসে আমাকে গাড়ীতে তুলে নিয়ে নানা কথায় আমার শোক ভোলাবার চেষ্টা করতেন। একদিন তিনি আমাকে এজন্য তিরস্কার করে বলেছিলেন—"তুমি পুরুষ মানুষ, তোমার শোক সংবরণ করতে এত দেরী হয়! ছিঃ।"

আজও আমার সেই শিশুপুত্রের স্মৃতির সঙ্গে শরৎদাদার স্মৃতি একই তারে জড়িয়ে আছে।

কত টুকরা-টুকরা কথাই মনে পড়ে। একবার তাঁকে নির্দয়ভাবে আক্রমণ করে একজন সাহিত্যিক কোন পত্রিকায় একটা প্রবন্ধ লিখেছিলেন। প্রবন্ধটা পড়ে আমি বড়ই ব্যথা পেলাম। তার একটা প্রতিবাদ লিখে নিয়ে আমি শরৎদাদার কাছে গেলাম। তাঁকে ব্যাপারটা খুলে বলে প্রতিবাদটা প'ড়ে শোনাতে চাইলাম। তিনি হেসে বললেন—ওটা ছিঁড়ে আমার তামাকের কলকেটার ওপর রাখ, তাহলেই যথাযোগ্য প্রতিবাদ হবে। আমি ভেবেছিলাম, তুমি সাবালক হয়েছ, কিন্তু এখনো দেখছি তুমি সেই স্কটিশচার্চ কলেজের ছাত্র কালিদাসই আছ। তুমি পাগল! তুমি প্রতিবাদ করে ঐ বিদ্বেষপ্রসূত লেখাটাকে importance দেবে কেন? দেশের লোক নিত্যই ঐ সকল বিরুদ্ধ মন্তব্যের প্রতিবাদ করছে। করছে বলেই পথের ফকির আমি বালিগঞ্জের এই বাড়ীতে ইজিচেয়ারে শুয়ে আলবোলা মুখে দিয়ে তোমার সঙ্গে কথা বলছি। সে লেখা নিজের বিষে নিজেই জরে 'মরে' গেছে, তোমাকে আর তার জন্যে নতুন ক'রে ছুরি শানাতে হবে না।"

আর একদিনের কথা। একজন লেখক তাঁর কাছে কোন সময়ে উপকার পেয়েছিল, কিন্তু তার পর তাঁর নিন্দাবাদ করত। আমি তার অকৃতজ্ঞতার কথা তুলে ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলাম। তাতে শরৎচন্দ্র বলেছিলেন—"দেখ, কৃতজ্ঞতা বিধাতার দান। ভগবান সকলকে এ দান দেন নি, অনেকেই তাঁর এ অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিত। কৃতজ্ঞতার অনুভূতিতে কি গভীর আনন্দ তা তারা জানেই না। ওরা হতভাগ্য। নতুন ক'রে ওদের দণ্ডের আর প্রয়োজন নেই।"

তাঁর সমসাময়িক সাহিত্যের মধ্যে এক রবীন্দ্রনাথের রচনা ছাড়া তিনি আর কিছু পড়তেন বলে আমার মনে হয় না। রবীন্দ্রনাথের বহু কবিতা তাঁর মুখস্থ ছিল। রবীন্দ্রনাথই তাঁর গুরু। অনেকে হয়ত মনে করেন, তিনি Continental fiction literature প'ড়ে অপূর্ব রচনাশৈলীর দীক্ষা লাভ করেছিলেন। একথা মোটেই সত্য নয়। হয়ত ফরাসী সাহিত্যের কিছু কিছুর ইংরেজী অনুবাদ তিনি পড়েছিলেন—কিন্তু রচনাভঙ্গির দীক্ষা তিনি সেখান থেকে পান নি। আমি

একদিন বলেছিলাম—"দাদা, আমি একটা আবিষ্কার করেছি। আপনি রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি' পড়ে রচনার দীক্ষা লাভ করেছেন।"

তিনি বললেন, "তুমি ঠিকই ধরেছ—তবে আর একখানা বইয়ের নাম করলে না কেন? সেখানা 'নষ্টনীড়'। এই বই দু'খানা আমি বহুবার পড়েছি—এই বই দু'খানা থেকেই আমার কথাসাহিত্যের দীক্ষা।"

কেউ যদি বলত রবীন্দ্রনাথের লেখা ভাল বুঝতে পারি না, আপনার লেখা বেশ বুঝি। তার উত্তরে তিনি বলতেন—"রবীন্দ্রনাথ লেখেন তোমাদের জন্যে নয়—আমাদের জন্যে। আর আমরা লিখি তোমাদের জন্যে।" রবীন্দ্রনাথের প্রথম জীবনের কথাসাহিত্যের দ্বারা তাঁর রচনা যেমন প্রভাবিত হয়েছিল, রবীন্দ্রনাথের উত্তরজীবনের কথাসাহিত্যের দ্বারা তাঁর শেষ জীবনের রচনাও তেমনি বিশেষরূপ প্রভাবিত হয়েছে বলে মনে হয়।

সভাসমিতি ও সভাপতিত্ব যতদূর সম্ভব তিনি এড়িয়েই চলতেন। অনেক সময়ে সভাপতিত্ব স্বীকার ক'রেও তিনি সভায় যেতেন না। আমি একবার বলেছিলাম, "আপনি যদি সভাপতিত্ব করতে স্বীকৃত হ'ন তবে এমন ভাবে এড়িয়ে যান কেন? এতে আহ্বায়কদের বড়ই অপমান করা হয়।"

তার উত্তরে তিনি বলেছিলেন, "তোমাদের জন্যই এটা করতে হয়। লোকে সাহিত্যিকদের অবজ্ঞা করে, অন্তত ধনী ও পদস্থ লোকদের তুলনায়। তারা মনে করে সাহিত্যিকরা খুব সুলভ। তারাও যে দুর্লভ হ'তে পারে, তারাও যে লোকের দেওয়া left handed compliment উপেক্ষা করতে পারে—তা মাঝে মাঝে জানিয়ে দেওয়া দরকার। সেটা তোমাদের হ'য়ে আমিই করি। লক্ষ্য ক'রে দেখ, যেখানে উদ্যোক্তাদের মধ্যে ধনীলোক থাকে, সেখানে আমি যাব ব'লেও যাই না। কিন্তু আমাদের মত দীনদরিদ্রেরা বা ছাত্রেরা আহ্বান করলে ঠিকই যাই। এ ধরনের আহ্বানে যদি না যাই, তবে জানবে নিশ্চয়ই কোন অনিবার্য ব্যাঘাত ঘটেছে—শরীরের অসুস্থতাও তার একটা কারণ। আমার যে শরীর অসুস্থ হতে পারে, এটা লোকে বিশ্বাস করে না। সভায় না যাওয়াতে একটু নিন্দা হয়, লোকে অসামাজিক ও অভদ্র বলে মনে করে। তা করুক, সেটুকু দুর্নাম নেবার সাহস আমাকে দেশের লোকই দিয়েছে।"

সভাপতিত্ব এড়িয়ে চলবার একটা কারণ আমার মনে হয়েছে এই, তিনি খুব ভাল বক্তা ছিলেন না, তাঁর কণ্ঠস্বর খুব বিরাট সভার উপযোগী ছিল না। অথচ একটা অভিভাষণ লিখে নিয়ে যাওয়ার ধৈর্য ও উৎসাহও তাঁর ছিল না।

দুই

সাহিত্য : সত্য ও কল্পনা

শরৎচন্দ্রকে সাহিত্যিক আলোচনায় নামানো খুব শক্ত ছিল, বিশেষতঃ—তাঁর রচনা সম্পর্কে কোন প্রশ্ন করলে বিশেষ কোন উত্তর পাওয়া যেত না। তিনি বলতেন—'যা বলবার তা গল্পেই বলেছি—যা জানবার তা লেখাতেই জেনেছ। সাহিত্য সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন তুললেই তিনি বিষয়ান্তরে মনোযোগ আকর্ষণ করতেন। "ওসব কথা থাক—শোন, একটা গল্প বলি।"

গল্প বানাবার ও বলবার শক্তি ছিল তাঁর অসাধারণ। গালগল্প শুনে আনন্দ পেতাম সত্য, কিন্তু কৌতূহল নিবৃত্ত হ'ত না। যখন মজলিসে বসতেন—তখন গালগল্প ছাড়া অন্য কোন কথায় কানই দিতেন না। পাঁচজনের মধ্যে সাহিত্যালোচনার প্রসঙ্গ তুলে প্রত্যেক বারই হতাশ হয়েছি। আমি প্রতি সপ্তাহে দু' একদিন শরৎচন্দ্রের গৃহে বেড়াতে যেতাম। সেখানে একলা পেলে সাহিত্যিক প্রসঙ্গ তুলতাম। শরৎচন্দ্র যেন তখন নিরুপায় হয়ে আলোচনায় যোগ দিতে বাধ্য হতেন।

একদিন শ্রীকান্তের ভ্রমণকাহিনীর কথা তুললাম। জিজ্ঞাসা করলাম—"লোকে বলে শ্রীকান্তের ভ্রমণকাহিনী আপনার আত্মকাহিনী। এটা কতদূর সত্য জানতে ইচ্ছে হয়।"

শরৎচন্দ্র বললেন—"তোমার মত একজন সাহিত্যিকের এ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা ঠিক হয়নি। কারণ, তুমি জান কি করে একটা Art-এর সৃষ্টি হয়। ওতে কতটা আমার আত্মকাহিনী আছে, আর কতটা নেই, তা ত' বই পড়েই বুঝতে পেরেছ। না বোঝার ভান করছ কেন?"

আমি বললাম—"বুঝিনি তা নয়, তবে আপনার মুখে কিছু কিছু শোনবার ইচ্ছা, তাই জিজ্ঞাসা করলাম।"

শরৎচন্দ্র বললেন "আচ্ছা, আর্টের কথা থাক। তুমি শুধু কবি নও, তুমি একজন Essayist. তোমাকে জিজ্ঞাসা করি বাংলার গ্রামের একটা চিত্র আঁকতে যদি বলি একটা প্রবন্ধে তা হলে তুমি কি কর? তুমি কি তোমার গাঁয়েরই একটা বর্ণনা দাও?"

আমি বললাম—"না, তা দিই না। আমার গাঁ একটা Typical গাঁ নয়।

আমার গাঁয়ের শুধু বর্ণনা দিলে বাংলার typical গাঁ ফুটবে না। যেমন আমার গাঁয়ে নদী নেই, আমার গাঁয়ে একটা গ্রাম্য দেবতার কোন প্রাচীন দেবালয় নেই, আমার গাঁয়ে জমিদারের একটা ভাঙাচোরা বাড়ীও নেই, আমার গাঁয়ে ছায়াচ্ছন্ন পথ নেই। কাজেই আমি এমন একখানা গাঁয়ের কল্পনা করে নিই যে গাঁয়ে ঐ সবই আছে। তার সঙ্গে আমার গাঁয়ের অনেকাংশই যোগ করে দিই। তারপর গাঁয়ের চিত্র আঁকি। অনেকগুলো গাঁয়ের একটা Generic Image আমার মনে আছে তাতে একটা গাঁয়ের Concept তৈরী হয়। আমি তারই চিত্র আঁকি।"

শরৎচন্দ্র বললেন—"তবে তো ভাই তোমার প্রশ্নের জবাব তুমিই দিলে। শ্রীকান্তেও তাই ঘটেছে। ওতে আমার দেখা জিনিস অনেকই আছে, আমার নিজস্ব অভিজ্ঞতা ও অনুভূতিও ওতে ঠাঁই পেয়েছে। সেই সঙ্গে আরো পাঁচ-জনের অভিজ্ঞতা ও অনুভূতি শ্রীকান্ত নিজস্ব করে নিয়েছে। শ্রীকান্তের মধ্যে আমি অনেকটাই আছি, কিন্তু শ্রীকান্ত ও আমি মোটেই এক নই। এক হিসাবে ওটা আত্মজীবনী—আবার এক হিসাবে নয়। আমার নিজের জীবনের খুঁটিনাটি ওতে গোপন করা হয়েছে—অনেক বড় বড় ঘটনাও ওতে বাদ দেওয়া হয়েছে—সে হিসাবে ওটা আত্মজীবনী নয়। সেগুলো প্রকাশ করা চলে না বলেই যে বাদ দিয়েছি তাও নয়। যেটুকু আর্টের গণ্ডীতে আনা যায়—সেইটুকুকেই এনেছি। যেমন সমুদ্রবক্ষে সাইক্লোনের দৃশ্য—আমি নিজেই ভুক্তভোগী—আমারই একবার বর্মাযাত্রায় ঐ বিপদপাত ঘটেছিল, ঐ সাইক্লোনকে আর্টের গণ্ডীতে সহজেই আনতে পেরেছি, কাহিনীতে তা স্থানও পেয়েছে। যারা আসল আর্টিস্ট নয়—তারা চোখের সামনে যা দেখে তাই আঁকে। আঁকতে গেলে অনেক বড় বড় জিনিসও বাদ দিতে হয়। নিঃশেষ করে বলবার লোভ সংবরণ করতে হয়। পাণ্ডিত্যের লোভ যেমন সংবরণ করতে হয় তেমনি সমস্ত কথা বলে দেওয়ার লোভও সংবরণ করতে হয়। এ হিসেবে শ্রীকান্ত আমার আত্মজীবনী নয়। আবার জীবনের সত্যঘটনা ও আমার নিজের চোখে দেখা দৃশ্য, আমার নিজের অভিজ্ঞতা শ্রীকান্তে ঢের আছে—সে হিসাবে বইটিকে আত্মজীবনীও বলতে পার। তবে এটাও ঠিক যে অনেক জিনিসে একটু বেশী Emphasis দেওয়াও আছে। ইন্দ্রনাথ একটা আসল সত্য চরিত্র—তা তোমরা জান—কিন্তু ওতেও একটু Emphasis দেওয়া হয়েছে—অন্যান্য চরিত্রও জীবন্ত মানুষেরই, কিন্তু সেগুলোতেও emphasis দেওয়া আছে। রাজলক্ষ্মী ও কমললতা সম্পূর্ণ কাল্পনিক চরিত্র—কাজেই ওদের প্রসঙ্গে শ্রীকান্তের আচার-আচরণের সঙ্গে আমার বিশেষ কোন সম্পর্ক নেই। তোমার নিজের কি মনে হয় বল ?"

আমি বললাম—"শ্রীকান্তের ভ্রমণকাহিনী রক্তমাংসের শরৎচন্দ্রের জীবনবৃত্ত নয়—শরৎচন্দ্রের অভিজ্ঞতা ও অনুভূতির ইতিহাস অর্থাৎ এটা চিন্ময় শরৎচন্দ্রের জীবনবৃত্ত।"

শরৎচন্দ্র বললেন—"আসলে সব সাহিত্যই তো তাই।"

আমি বললাম—"সব সাহিত্য তা হবে কেন? লিরিকে কবি তাঁর কোন একটা অনুভূতি অত্যন্ত গভীর হয়ে উঠলেই বাণীরূপ দেন। কবি যখন তাঁর অনুভূতি বিশেষকে আর অন্তরে ধরে রাখতে পারেন না—তখনই তাকে বাহিরে রূপ দান করেন।"

শরৎচন্দ্র বললেন—"একটা লিরিক সম্পর্কে তা হতে পারে, কিন্তু কবির সমস্ত লিরিক নিয়ে বিচার করা কি যায় তখন?"

আমি বললাম—"তখন কবির গাঢ়তম অনুভূতিগুলির পরিচয় পাওয়া যায়—তা চিন্ময় কবির আংশিক জীবনবৃত্ত।"

শরৎচন্দ্র বললেন—"আংশিক কেন?"

আমি বললাম—"আংশিক এইজন্য, কবির জীবনে জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে সর্বপ্রকার অনুভূতি নিরবচ্ছিন্নভাবে পাওয়া যায় না। কবি যদি কোন কাব্য নাট্য উপন্যাসের মধ্যে নিজেকে নায়করূপে অবতীর্ণ করেন তবেই তাঁর অন্তরানুভূতির পরিপূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায়। শ্রীকান্তে আমরা তাই পাচ্ছি। বহু বিচিত্র দৃশ্য, ঘটনায়, অবস্থায় ও পরিস্থিতিতে চিন্ময় শরৎচন্দ্রের অনুভূতির বৈচিত্র্য এতে পাচ্ছি—তাই একে চিন্ময় শরৎচন্দ্রের জীবনবৃত্ত বলছি। নাটক তো হয় সম্পূর্ণ impersonal, নাটকে যে সকল চরিত্রের সৃষ্টি করা হয়—তাদের ব্যক্তিগত সম্ভাব্য অনুভূতিরই তাতে প্রকাশ হয়—নাট্যকার নিজে থেকে যান পর্দার আড়ালে। নাটকে কবির জীবনবৃত্ত সন্ধান করা বৃথা।"

শরৎচন্দ্র বললেন, "বুঝলাম তারপর কি বলছিলে বল—"

আমি বললাম—"শ্রীকান্ত আপনি নন—কিন্তু আপনারই প্রতিবিম্ব। প্রতিবিম্বের activity থাকে না—সে সম্পূর্ণ Passive. শ্রীকান্ত চরিত্রটা আগাগোড়া Passive."

শরৎচন্দ্র বললেন—"Passive যদি তবে সে অনুভব করে কি ভাবে?"

আমি বললাম—"শ্রীকান্ত যেন একটা দর্পণের মত। বহু বিচিত্র পরিধিতে আপনার নিজের যে অনুভূতি তাই ঐ দর্পণে চিত্রপরম্পরার মত প্রতিফলিত হয়ে চলেছে। যাকে লোকে প্লটে বাঁধা সম্পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস বলে—শ্রীকান্ত তো তা নয়; তা কতকগুলি চিত্রের সমষ্টি আর ঐ চিত্রগুলোর দ্বারা উদ্দীপিত কতকগুলো অনুভূতির রূপপরম্পরা 'সূত্রে মণিগনা ইব'—এই সূত্রই শ্রীকান্ত।"

দেশে রবীন্দ্রশিষ্য কবিদের যথাযোগ্য প্রতিষ্ঠা হয়নি বলে শরৎচন্দ্র প্রায়ই ক্ষোভ প্রকাশ করতেন। তিনি বলতেন, "দেখ, কোন কথা-সাহিত্যিকের লেখা পড়ে আমার হিংসে হয় না। কিন্তু তোমাদের কবিতা পড়ে আমার হিংসে হয়। মনে হয়—আহা, আমি যদি এমনি করে কবিতা লিখতে পারতাম !"

আমি বললাম—"আমরা ছন্দে লিখি এই পর্যন্ত, কিন্তু কবি যে আপনি ঢের বড়। আপনার রচনা যে কবিত্বের কুবের ভাণ্ডার। আপনার রচনা পড়ে আমরা কবিত্বের inspiration পাই—আপনার লেখা থেকে হাজারটা কবিতা লেখা যায়।

আপনার হিংসে হয় শুনে অবশ্য আমরা খুব flattered হব—কিন্তু আমাদের লেখা তো হিংসার বস্তু নয়। দেশের লোকে আমাদের লেখার তো আদর করেনি।"

শরৎচন্দ্র বললেন—"সেটা দেশের লোকের culture-এর অভাব। অন্য কোন সভ্য দেশ হ'লে তোমার লেখার সমাদর হ'ত—তোমরাও দেশবরেণ্য কবি হতে।"

আমি বললাম—"আমার শক্তি সামান্য। 'তোমার' বলে কথা বলবেন না—তাতে আমিও included হয়ে পড়েছি।"

তিনি হেসে বললেন—"রবীন্দ্রশিষ্য কবিদের কথাই বলছি। ব্যাপারটা কি জান ? এদের ক্ষমতা কম তো নয়ই বরং যথেষ্টই বলতে হবে। একটা নক্ষত্রের শক্তি কি কম ? রবির আলোকে সব নক্ষত্র যেন লুপ্ত হয়ে আছে। কিন্তু তারা যেমন বৈজ্ঞানিকের চোখে লুপ্ত নয়—রসজ্ঞের কাছেও কবিরা তেমনি নগণ্য নন। কিন্তু সে রসজ্ঞ দেশে কজন আছে ? রবীন্দ্রনাথ শুধু অসীম শক্তিসম্পন্ন নন। তাঁর রচনার বৈচিত্র্য ও পরিমাপও অশেষ। তিনি অতি দীর্ঘদিন ধরে অজস্র দান করেছেন। এরূপ ক্ষেত্রে রবীন্দ্রশিষ্যদের দিকে দেশের লোকের দৃষ্টি স্বচ্ছন্দে পড়তে পারে না।"

আমি বললাম—"রবীন্দ্রনাথ শুধু কবি নন, তিনি কথাসাহিত্যিকও। তবু কথাসাহিত্যিকরা তো রবির আলোকে হারিয়ে যায় নি। তাঁদের আদর কবিদের চেয়ে ঢের বেশি।"

শরৎচন্দ্র বললেন—"সেটা সাহিত্যশাখার বৈশিষ্ট্যের জন্যই সম্ভব হয়েছে। তোমাদের শাখাটা বেশি Popular হ'তে পারে না—কোন দেশেই তা হয়ও না।"

দেশের সকল লোকই কথাসাহিত্য যতটা বোঝে, কবিতা ততটা বোঝে না।

জনসাধারণ কথাসাহিত্য থেকে যত আনন্দ পায়, কবিতা থেকে ততটা পায় না। শাখা নির্বাচনই এজন্য দায়ী। আমরা সাহিত্যের এমন শাখার লেখক যে-শাখার পাঠক আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা, আর তোমাদের শাখার পাঠক শুধু বিদ্বজ্জন বা রসিকজন। জনসাধারণ চায় নিত্য নতুন গল্প উপন্যাসের বই—বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথের বই অল্প দিনেই ফুরিয়ে যায়, তারপর নিত্যকার যোগান চাই। চাহিদার জন্যই যোগানদারদের আদর। কবিতার বেলায় তা তো নয়—সাধারণ লোক কবিতা বোঝেই না; পুরাতন কবিতাই বারবার পড়ে এবং ভাবে এর পর আর নতুন কবিতা কী-ই-বা হ'বে আর দরকারই বা কি? নতুন কবিতা পেলেও সহজে তাকে আমল দেয় না। কবিতা যতই পুরানো হবে ততই তার আদর।

কবিতার জন্য আদর পেতে হ'লে মরতে হয়। তারপর কবিলোকে গিয়ে যশের পিণ্ড লাভ করতে হয়। আর কথাসাহিত্য যত পুরানো হবে ততই তা আবর্জনা। বেশিদিন বাঁচলে কথাসাহিত্যিক নিজের যৌবনের লেখার দুর্দশা দেখে যেতে পারেন। দেশে সমাদর বজায় রাখতে হলে বুড়ো বয়স পর্যন্ত নিত্য নতুন যোগান দিতে হবে। তাছাড়া দেশ, কাল, সমাজ, রুচি, যুগধর্ম সব যাচ্ছে বদলিয়ে। পূর্বে পঞ্চাশ বৎসরে যতটা বদলাতো, এখন পাঁচ বছরেই তা বদলে যাচ্ছে। কথাসাহিত্যিক যদি তার সঙ্গে তাল রেখে চলতে না পারে—তাহলেই তার দফা শেষ। জনসাধারণ পরিবর্তিত কালের উপযোগী কথাসাহিত্যই চায়—তারই আদর করে।

এই দেখ না—আমার লেখাই এখন তরুণতরুণীদের আর ভাল লাগে না—তারা আমাকে সেকেলে বলে মনে করে। এই তো সেদিন একজন তরুণ সাহিত্যিক বলছিল—আপনি যে সব স্ত্রীলোকের কথা লিখেছেন—সেরকম নির্বোধ অশিক্ষিত ইতরস্বভাবের স্ত্রীলোক আপনার সম্পূর্ণ মনগড়া, এরকম স্ত্রীলোক তো দেখি না। সত্যই তারা দেখেনি—শহরে তো নেই, পাড়াগাঁয়েও আজকাল তাদের সংখ্যা কমে এসেছে। যারা আছে তাদের সঙ্গে এদের জীবনের যোগাযোগ ঘটেনি। কাজেই তাদের মনগড়া ব'লেই মনে হবে। তোমরা দেখেছ,—তাদের মধ্যেই প্রতিপালিত হয়েছ তাই তোমাদের জীবন্ত মনে হয়। এদের দোষ কি? যুগ বদলে যাচ্ছে—এযুগে বিন্দু-নারায়ণী হেমাঙ্গিনী কোথা পাবে—পোড়া কাঠকেই বা কোথা পাবে? কাদম্বিনী-দিগম্বরী-বা পাবে কোথায়? যদি তারা থাকে তবু তারাও হুঁসিয়ার হয়েছে।"

আমি বললাম—"তা না পেতে পারে—কিন্তু তাদের দিয়ে গড়া সাহিত্যে যে universal appeal আছে তা' তারা miss করে কি ভাবে? ভারতচন্দ্রের

মালিনীকেও আমরা আর দেখি না—কিন্তু মালিনীর মধ্যে Universal appeal আছে তা' miss করব কি করে ?"

শরৎচন্দ্র বললেন—"তুমি যা বললে তা' খাঁটি রসজ্ঞ লোকের কথা। বহু দেশের সাহিত্য যার পড়া আছে এবং স্বদেশের সাহিত্য যার ভাল করে পড়া আছে তারই কথা। কিন্তু কথা হচ্ছিল জনসাধারণের।"

আমি বললাম—"কিন্তু আপনি যে বলছিলেন একজন তরুণ সাহিত্যিকের মন্তব্যের কথা। তার কাছে এটা তো প্রত্যাশা করতে পারি।"

শরৎচন্দ্র বললেন—"লেখাপড়া জানা সাহিত্যিক হলে কি হবে—আজকাল এই তরুণদের, সাহিত্যের রসের চেয়ে তার বিষয়বস্তুর উপরই যত ঝোঁক তা বুঝি জান না। আর এরাই ত' ভবিষ্যতের সাহিত্যিক এবং সমালোচক। তবেই বুঝতে পারছ কথাসাহিত্যের ভবিষ্যৎ। কথাসাহিত্যে নগদ বিদায়টা ভালোই হয়—ধারে কারবার নেই। জীবদ্দশাতে বড়ো হবার আগে অবশ্য তারা যে আদর পাবে সে আদর তোমরা পাবে না।"

আমি বললাম—"কথাসাহিত্য সম্বন্ধে যা বললেন কবিতার সম্বন্ধেও তো সে কথা খাটে। বিষয়বস্তু পুরানো হলে কবিতারও সেই দশা হবে।"

শরৎচন্দ্র বললেন—"কবিতার সম্বন্ধে সে কথাটা খাটে না। কথাসাহিত্যে যে কথা বলা হয় দশ পাতা ধ'রে—পাত্রপাত্রীর কথোপকথনে এবং আচার-আচরণে, কবিতায় সে কথা থাকে ঘনীভূত হ'য়ে দশ লাইনে। তা'ছাড়া কবিতায় বিশেষত তোমাদের গীতি-কবিতার পাত্রপাত্রী থাকে না। মানুষের চিরন্তন অনুভূতির বদল আর কি হবে ? তা'ছাড়া কবিতা বিদ্বজ্জনেরই আলোচ্য হয়ে থাকে। তারা ঘনীভূত ভাবকে ধরতে পারে, আর তারা ইতিহাস, দর্শন ইত্যাদি পড়ে যে সময়ের লেখা—নিজেদের মনটাকে সে সময়ে সহজে নিয়ে যেতে পারে—সে আবহাওয়ায় নিজেকে transfer করতে পারে।"

আমি বললাম—"কবিতার এই সৌভাগ্যের কথা স্মরণ করেই কি কবিতা পড়ে আপনার হিংসা হয় ?"

শরৎচন্দ্র বললেন—"হাঁ, তাই বটে। তা'ছাড়া আর একটা কথা আছে। ভাবকে যেমন তরল ক'রে এক সম্প্রদায়ের কাছে ধরে দিচ্ছি, তেমনি আবার ছন্দের বাঁধনে ঘন ক'রেও যদি তা আর এক সম্প্রদায়ের কাছে দিতে পারতাম—তা'হলে কি আরো তৃপ্তি হ'ত না ? একটা হলো বর্তমানের জন্য আর একটা থাকত ভবিষ্যতের জন্য। একটা ইহলোকের জন্য, আর একটা পরলোকের জন্য। তোমাদের দেখছি ইহলোকে কোন আশা নেই। অন্য-দেশ হ'লে ইহলোকেও

কিছু পেতে। ইহলোকে কোন পুরস্কার না পেয়েও তোমরা লিখে চলেছ—একথা যখন ভাবি তখন তোমাদের প্রতি আমার শ্রদ্ধা হয়।"

আমি বললাম—"একেবারে কিছু আমরা পাই না তা' নয়, লিখে একটা আনন্দ পাই। একজনও যদি আদর করে তাতেই পুরস্কৃত বলে মনে করি। তা'ছাড়া এ একপ্রকার self-realisation বা আত্মাভিব্যক্তি—এতে মনের ভারমুক্তি হয়, আত্মা লঘু হয়, পাওয়ার আনন্দ পাওয়া যায় না বটে—তবে ঋণ মুক্তির আনন্দ পাওয়া যায়।"

শরৎচন্দ্র বললেন—"সেই আনন্দেই থাক।"

আমি বললাম—"তা'ছাড়া আর একটা কথা আছে। কথাসাহিত্যের স্থায়িত্ব সম্বন্ধে আগে আপনি যা বললেন তা' সত্যি। বিদ্বৎসমাজ কথাসাহিত্যকে রক্ষা করে না। কিন্তু আপনার অধিকাংশ বই বঙ্কিমের বইয়ের মত classic হয়ে গিয়েছে—বিদ্বৎসমাজ বঙ্কিমের বইএর মত আপনার বইও রক্ষা করবে—তবে সব বই নয়। রবীন্দ্রনাথের কাব্যই তাঁর উপন্যাসগুলোকে রক্ষা করবে। রবীন্দ্রনাথ শুধু যদি ঔপন্যাসিক হতেন, তা'হলে তাঁর খুব অল্প খানকয়েক উপন্যাসকে বিদ্বৎসমাজ রক্ষা করত। তাঁর গল্পগুচ্ছের কথা স্বতন্ত্র। বিদ্বৎসমাজ রবীন্দ্রনাথের সবই রক্ষা করবে। বাকি কথাসাহিত্যিকদের পুস্তকগুলি এরপর Reprinted হবে কিনা সন্দেহ। যারা পুস্তক প্রকাশ করে—তারা নতুন বই ছাপবে, না পুরানো বইএর সংস্করণ করবে? শিক্ষাবিভাগ, বিশ্ববিদ্যালয়, সাহিত্য পরিষদ্ এবং অন্যান্য বিদ্বৎ-প্রতিষ্ঠান বিপুলায়তন কথাসাহিত্যের রাশিকে বাঁচিয়ে রাখতে পারে না। কবিতার সম্বন্ধে একটা কথা এই—কবিতার Anthology চিরদিনই বেরুবে, তাতে রবীন্দ্র-শিষ্যদের কবিতা কিছু কিছু থাকবে—তাঁদের কতকগুলো গানও থাকবে—আবৃত্তির জন্যও কতকগুলোকে পৃথক সংকলন পুস্তক বাঁচিয়ে রাখবে। দেশের শিক্ষাক্ষেত্রের অসংখ্য পাঠ্যপুস্তকের মধ্যে তাদের কবিতা ছড়িয়ে রয়েছে—সেগুলো পুস্তক থেকে পুস্তকান্তরে নামতে নামতে চলতে থাকবে কিছুকাল। তা'ছাড়া কবিদের গ্রন্থাবলী বের করবার প্রথা আছে। বিশ্ববিদ্যালয় নিজের প্রয়োজনেও সংকলন পুস্তকে অনেক কবিতাকে ঠাঁই দেবে। একেবারে হতাশ হবার কথা নয়। অবশ্য খুব ভাল ছোট গল্পগুলো কবিতার মত টিঁকে যাবে। এ হিসাবে কবিতার ভাগ্য সাহিত্যের অন্যান্য শাখা থেকে কিছু ভালো। অবশ্য তা থেকে খুব যে সান্ত্বনা পাওয়া যায় তা নয়।"

শরৎচন্দ্র বললেন—"দেখ আমার মনে হয় কথাসাহিত্যিকদের তো দেশের লোক সমাদর করছেই—শুধু শ্রদ্ধা দিয়ে নয়, অর্থ দিয়েও। কবিদের সম্মান করা

উচিত বিদ্বৎসমাজের। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তব্য তাঁদের ডিগ্রী দিয়ে সম্মান করা, সরকারেব উচিত উপাধি দিয়ে মর্য্যাদা দেওয়া আর বিদ্বৎসমাজের উচিত বৎসর বৎসর তাঁদের অভিনন্দিত করা।”

বহুদিন পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রের রচনার যথাযোগ্য মর্যাদা দান করেন নি, শরৎচন্দ্রের শক্তি স্বীকার ক'রে তিনি কিছুই লেখেন নি, এজন্য এবং অন্যান্য কয়েকটি কারণে রবীন্দ্রনাথের প্রতি শরৎচন্দ্রের একটা ক্ষোভ ও অভিমান ছিল। শরৎচন্দ্রের শেষ জীবনে এ ক্ষোভ ও অভিমান আর ছিল না। রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রের প্রতিভা স্বীকার ক'রে মুক্তকণ্ঠে প্রাণ খুলে প্রকাশ্য সভায় অভিনন্দিত করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে যে অভিনন্দন পত্র দিয়েছিলেন তা হাতে ক'রে তিনি আমাদের কাছে এসে নিজে প'ড়ে আমাদের বারবার শুনিয়েছিলেন। সেদিন তাঁর চোখে মুখে যে আনন্দের উজ্জ্বলতা দেখেছিলাম তেমনটি কখনো দেখিনি। তারপর যেদিন রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রের গৃহে রবিবাসরের সভায় উপস্থিত হয়েছিলেন সেদিন তাঁর জীবনের মহা মহোৎসব। সভা ভাঙ্গবার পর আমি আর সতীশ সিংহ ছিলাম। শরৎচন্দ্র উচ্ছলিত কণ্ঠে বললেন—“আজ আমার গৃহ ধন্য, জীবন ধন্য, আমার লেখনী ধারণও ধন্য হ'ল।”

সমসাময়িক কথাসাহিত্য তিনি বিশেষ কিছু পড়তেন না। যখনই বলতাম —অমুক লেখে বেশ, তখনই বলতেন, হাঁ অমুক বেশ ভাল খেলে। আমি একদিন জিজ্ঞাসা করলাম—“দাদা এরা সব বই দিয়ে যায়, আপনি পড়েন না কেন?” তিনি বললেন,—“দেখ আমি কয়েক পাতার বেশী পড়তে পারি না। পড়তে গিয়ে যখন দেখি এসব তো আমি সহজেই লিখতে পারতাম ছোট বেলাতেই, তখন আর এগুতে ইচ্ছে করে না। কোন লেখা পড়ে যদি হিংসে না হয়, তবে তা আমার পক্ষে পড়া কঠিন। যদি কিছু পড়তে গিয়ে মনে হয়, এ আমি লিখতে পারতাম না, তাহলে তা পড়ি বই কি। তেমন কিছু লেখা তো পাই না। সেজন্য আমি কবিতা বরং পড়ি। কারণ ছন্দ মিলিয়ে আমি এ জিনিস কখনো লিখতে পারতাম না। তাই তোমাদের কবিতা বরং আমি কিছু কিছু পড়েছি। তাছাড়া, যার রসবোধের ওপর আমার শ্রদ্ধা আছে, তার যে কোন বই পড়ে দেখতে বল্‌লে পড়ব।”

অবশ্য এ প্রসঙ্গে এ কথাও বলতে হয় যে, শেষ জীবনে তাঁর ধৈর্যের বড় অভাব ছিল। একসঙ্গে ছবির Exhibition অনেকবার দেখতে গিয়েছি। একটা ঘরের ছবি দেখার পর তিনি ক্লান্ত হয়ে একটা চেয়ারে বসে বলতেন—“বস গল্প করি। এই রকমই তো সব ঘরে ঘরে। ও আর কি দেখব?” গানের মজলিসে

দু'খানার বেশী গান একসঙ্গে শুনতে পারতেন না। গানের মজলিসে যাবার সময় বলতেন—"ওহে অমুক গায় ভালো বলছ তো, কিন্তু থামে তো ?" কেউ কোন লেখা তাঁকে শোনাতে গেলে দুই-এক পাতা শুনেই একটা মত প্রকাশ ক'রে গল্প জুড়ে দিতেন।

একসঙ্গে আমরা কয়েকবার Group photo তুলতে বসেছিলাম। ফোটোগ্রাফার দেরী করলে তিনি অস্থির হ'য়ে উঠতেন। ফোটো তোলা শেষ হলে তিনি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বলতেন, "বাঁচা গেল, বাপরে, এ এক বিড়ম্বনা।"

যারা তাঁর Portrait আঁকতে চেষ্টা করেছেন, তাঁরা জানেন, তিনি বেশীক্ষণ Pose দিয়ে বসতে পারতেন না। তাঁকে কথায় কথায় ভুলিয়ে কোন প্রকারে একটা sketch নিতে হ'ত।

রসচক্রের উদ্যান সম্মেলনে আমরা দেখতাম খেতে দিতে দেরি হ'লে তিনি অস্থির হয়ে উঠতেন—আমাদের খুবই বকৃতেন, বলতেন—"এত রান্নার দরকার কি ? একি একটা বিয়ের ভোজ ?"

একদিন ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত আমার কবিতা সম্বন্ধে বলেছিলেন—"শ্যামের বাঁশীই কালিদাসবাবুর সর্বনাশ করেছে। এযুগে কি আর বৃন্দাবন নিয়ে কবিতা হয় ?" শরৎচন্দ্র তৎক্ষণাৎ তাঁর কথার প্রতিবাদ ক'রে বলেন—"শ্যামের বাঁশীই ওকে বাঁচিয়ে দিয়েছে। বৃন্দাবন কখনও বাংলাদেশে পুরানো হয় না। শ্যামের বাঁশী ওকে না বাঁচালে আপনাদের সংস্কৃত কাব্যের আবহাওয়ায় পড়ে ওর লেখা এ দেশের পাঠকের অপরিচিত হয়েই থাকত।"

শ্যামের বাঁশী আমাকে বাঁচাক না বাঁচাক, সেদিন শরৎচন্দ্র আমাকে দিঙ্‌নাগের আক্রমণ থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছিলেন।

আর একদিন এক গার্হস্থ্য সান্ধ্যসম্মেলনে একজন রূঢ়ভাষায় মন্তব্য প্রকাশ করেন, আমার কবিতা সংস্কৃত সাহিত্যের প্রভাব ও দুরূহ শব্দের আতিশয্যে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। অনেকের মধ্যে এইরূপ মন্তব্য হওয়ায় আমি একটু লজ্জিত হ'য়ে পড়ছিলাম। বলা বাহুল্য, শরৎচন্দ্রের প্রতিবাদ করার উপায় ছিল না, তিনি সে ক্ষেত্রে নীরব ছিলেন। তিনি পথে যা বলেছিলেন আজো তা আমার সান্ত্বনা। তিনি বলেছিলেন—"তুমি দুঃখ ক'রো না। তুমি যা লিখেছ তা আর যাই হোক—গতানুগতিক নয়। রবীন্দ্রনাথের অনুকরণ যে তা নয় তা অমুকবাবু প্রকারান্তরে স্বীকারই করলেন। কি হচ্ছে না হচ্ছে তা মহাকাল বিচার করবেন, শুধু এইটুকু জেনে রেখ লোকে নিজেরা চেষ্টা ক'রে যা কিছুতে

পারে না, তাই অপকৃষ্ট বলে মনে করে এবং নিজেদের অক্ষমতা ক্ষমাহীনতার দ্বারা জোর গলায় এইভাবে প্রচার করতে চায়।"

আর একদিন রাজনীতি প্রসঙ্গে বলেছিলেন—"অন্যান্য জাত নিজেদের বড়-লোকদের বাড়িয়ে গৌরব অনুভব করতে চায়। আর বাঙ্গালী নিজেদের বড়লোকদের প্রাণপণে ছোট করতে চায়, আর অন্য দেশের লোককে ঢের বড় ব'লে প্রমাণ করতে চায়। কেউ কেউ স্বার্থের জন্য স্বদেশের কোন কোন বড়লোককে বড় ব'লে স্বীকার করেছে—কিন্তু স্বার্থের সম্পর্ক যেখানে নেই, সেখানে কিছুতেই বাঙ্গালী স্বদেশের বড়লোককে বড় বলে স্বীকার করে না। জাতীয় চরিত্রের জন্মগত হিংসা থেকেই এ প্রবৃত্তির জন্ম হয়েছে।"

শরৎচন্দ্র দেশবন্ধুকে ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ নেতা বলে মনে করতেন এবং সুভাষচন্দ্র সম্বন্ধে তাঁর যে উচ্চ ধারণা ছিল আজ তা বাস্তবে পরিণত হয়েছে। তিনি বলতেন, "অন্যান্য প্রদেশের কর্তারা বাঙ্গালী নেতাদের ছোট করবার জন্য বাঙ্গালীদের দমিয়ে রাখবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করে। বাঙ্গালী বড়লোকদের আমলই দিতে চায় না। তাদের সঙ্গে বাঙ্গালীরা নিজেরাও যদি যোগ দেয় তবে জাতীয় আত্মহত্যা ছাড়া আর কি হবে? বড়ই দুর্ভাগ্য আমাদের, আমরা নিজেদের কল্যাণ বুঝি না।"

রবীন্দ্রনাথের ব্যাপারটা দেখ না। বাঙ্গালী ত্রিশবছর ধ'রে প্রাণপণে চেষ্টা করেছে রবীন্দ্রনাথের প্রতিভাকে অস্বীকার করতে। শেষে ইউরোপ প্রতিভা স্বীকার করলে বাধ্য হ'য়ে বিজ্ঞ বাঙ্গালী একটা মস্ত বড় দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে—"হাঁ, রবীন্দ্রনাথ বড় কবি বটে তবে তাঁকে নিয়ে একটু বাড়াবাড়ি হচ্ছে।"

একজন তরুণ কবি শরৎচন্দ্রের কাছে গিয়ে বলেছিলেন—তাঁর লেখার বড় বড় সরকারী ও বেসরকারী পদস্থ ব্যক্তি মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করেন—অনেক বড় বড় অধ্যাপক বলেছেন, রবীন্দ্রনাথের পর তিনিই সবচেয়ে বড় কবি। তার উত্তরে শরৎচন্দ্র বললেন—"ওতে তোমার কবিপ্রতিভার ঠিক পরিচয় হ'বে না। বর্তমান যুগের সমসাময়িক কবিরা প্রশংসা না করলে ও প্রশংসার কোন দাম নেই। জজ, সাবজজ, ম্যাজিষ্ট্রেট ইত্যাদির বিচার এক্ষেত্রে বড় নয়। তাদের বিচারের দাম আদালতে।"

উক্ত কবিটি আমার কাছে এসে বললেন,—"শরৎবাবু বলেছেন যে, আপনারা প্রশংসা না করলে আমার কবিতার প্রকৃত পরিচয় হবে না। তিনি বললেন, আপনাদের কাছে প্রশংসামূলক মন্তব্য আদায় করতে।"

আমি বললাম—"তোমার কথা বুঝতে পারছি না—তুমি তো একজন দেশবিখ্যাত কবি, তোমার আবার পরিচয়ের প্রয়োজন কি?"

সন্ধ্যার সময় শরৎদাদার সঙ্গে দেখা হলে বললাম—"অমুককে আপনি আমাদের কাছে appreciation নিতে বলেছেন কেন?" তিনি বললেন—"আরে তা বলিনি। আমি বলেছিলাম যে,—সমসাময়িক কবিরা তোমার প্রশংসা না করলে হাইকোর্টের বা বিশ্ববিদ্যালয়ের বড় বড় লোকের প্রশংসার দাম কি? তার উত্তরে সে বললে—অন্যান্য কবিরা আমাকে হিংসা করে,—তারা ভাল বলবে কেন? প্রত্যুত্তরে আমি বলেছিলাম যে তোমায় কেউ হিংসা করে একথা আমি স্বীকার করি না, যদি হিংসা করেই তারও-তো একটা সীমা আছে, যখন তুমি এতই ভাল লিখবে যে তাদের হিংসাকেও ছাড়িয়ে উঠবে—তোমাকে বড় কবি ব'লে স্বীকার করা তাদের পক্ষেও অনিবার্য হয়ে উঠবে তখনই বুঝবে তুমিই সর্বশ্রেষ্ঠ কবি। আমার কথা বুঝতে না পেরে সে তোমার কাছে গিয়েছে appreciation আনতে। যতীন আর কুমুদের কাছেও গিয়েছিল বোধহয়। বুদ্ধিটা কবির মতোই বটে।"

শরৎচন্দ্রের কোন University Degree ছিল না। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে কোন Degree দেয় নি, জগত্তারিণী পদক মাত্র দিয়েছিল। দেশের লোক তাঁকে সাহিত্যের মহারথী বলে স্বীকার করেছিল তা তাঁর পুস্তকের দেশব্যাপী সমাদর থেকেই তিনি বুঝেছিলেন। বিদ্বৎসমাজের সমাদর যে কতটা তাতে বোঝা যায় নি। বিদ্বৎসমাজের recognition-এর জন্য তাঁর মনে একটু প্রচ্ছন্ন লোভ ছিল—সুস্পষ্ট স্বীকৃতি না পাওয়ার জন্য একটু ক্ষোভও ছিল।

শরৎচন্দ্রের যদি বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রী থাকতও, তাহলেও বিশ্ববিদ্যালয়ের recognition-এর জন্য আকাঙ্ক্ষা থাকা অশোভন বা অস্বাভাবিক হ'ত না। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ডি. লিট. উপাধি দিলে তিনি খুবই গৌরব অনুভব করেছিলেন। এমন কি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি তাঁর একটা কৃতজ্ঞতার ভাবও জন্মেছিল।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মুসলমানদের প্রভুত্ব সেজন্য মুসলমান জাতির প্রতিই তাঁর একটা অনুরাগ ও কৃতজ্ঞতা জন্মেছিল। তিনি এক 'মহেশ' গল্প ছাড়া এবং চতুর্থ পর্ব শ্রীকান্তে গহর ছাড়া তাঁর সমস্ত রচনাবলীতে মুসলমান চরিত্রের কোন স্থান দেন নি। 'পল্লীসমাজে' মুসলমান লাঠিয়ালদের উল্লেখ আছে। সেটা মুসলমান জাতির কথা নয়, লাঠিয়াল জাতির কথা। অবশ্য তার একটা কারণ, তিনি যে অঞ্চলের লোক সে অঞ্চলে মুসলমানের আধিক্য ছিল না—মুসলমান

জাতির জীবনযাত্রা সম্বন্ধে তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাও ছিল না। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা না থাকলে তিনি কিছু লিখতে পারতেন না—লিখলেও তা উৎকৃষ্ট সাহিত্য হবে বলে মনে করতেন না।

তিনি মুসলমান জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষা-সুখদুঃখ নিয়ে সাহিত্য রচনা করবেন ব'লে শেষজীবনে পরিকল্পনা করেছিলেন। কিন্তু তারপর আর বেশীদিন বাঁচেন নি, সেজন্য তাঁর পরিকল্পনা কাজে পরিণত হয় নি। এসম্বন্ধে তাঁর সঙ্গে আমার আলোচনা হয়েছিল।

তিনি বলতেন—"শ্রীকান্তের চতুর্থ পর্বের গহর চরিত্রের মত চরিত্র-সংযোগে অনায়াসে উপন্যাস লেখা চলতে পারবে। সামাজিক জীবনের যে অঙ্গে হিন্দুমুসলমানে কোন ভেদ নেই সে অঙ্গে মুসলমান চরিত্র সৃষ্টি করতে আমার পক্ষে কোন অসুবিধা হবে না। কিন্তু স্বতন্ত্রভাবে মুসলমান সমাজের জীবনযাত্রা নিয়ে আমার পক্ষে লেখা কঠিন। আবহাওয়া সৃষ্টি করতে না পারলে তো আর্ট হয় না। এই আবহাওয়া প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ছাড়া কি ক'রে সৃষ্টি করা যায়? গুরুও পারেন নি, শিষ্যও তা পারবে না।"

সকাল থেকে অবিরত লোক আসছে—সাহিত্যিক, অসাহিত্যিক। কেউ অটোগ্রাফ নিতে, কেউ প্রণাম করতে, কেউ কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে—কেউ শুধু দেখতে, শরৎচন্দ্র সকলের সঙ্গেই হাসিমুখে অত্যন্ত অন্তরঙ্গভাবে আলাপ করছেন। তিনি নিজেকে সমগ্র দেশেরই যেন পরমাত্মীয় বলে মনে করতেন।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম—"আপনার বিরক্ত লাগে না? এ বিড়ম্বনা তো কম নয় আপনার।"

শরৎদাদা বললেন—"না হে বিরক্ত লাগে না, এ আমার বেশ লাগে। বাড়ীতে বসে-বসেই সারা দেশের একটা পরিচয় পাচ্ছি। কত রকমের মানুষ, তাদের ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি লক্ষ্য করছি। সবচেয়ে আমার ভাল লাগে কি জান? এই সব লোক বিনা স্বার্থেই আমার কাছে আসে কেবল ভালবাসে বলেই, এটা তো কম কথা নয়। দেশের গণ্যমান্য লোকদের বাড়ী যাও, দেখবে তাঁদের কাছে এমনই দলে দলে লোক আসে, কিন্তু একজনও বিনা স্বার্থে আসে না। স্বার্থসেবীদের ভিড়ে তাদের আনন্দ পাওয়ার কথা নয়, বিরক্ত হবারই কথা। কিন্তু আমার তা তো নয়। গণ্যমান্য লোকেরা এ সব সহ্য করে সানন্দে, বোধহয় অনেকের মুরুব্বি, অনেকের অভিভাবক বলে গৌরব অনুভব করে ব'লে।

তবে যখন লিখতে বসি তখন কেউ শুধু শুধু আপ্যায়িত করতে এলে বিরক্ত হই। তখন অনেক সময়ে নীচে নেমে দেখা করি না, নয়ত দু'একটা কথা ব'লেই

বিদায় করে দিই। অন্যমনস্ক থাকি, কাজেই একটু রুক্ষতাও দেখাতে হয়। আমি যখন বৈঠকখানায় বসে থাকি, তখন যত লোক আসুক না কেন, তাতে আপত্তি নেই, খুশীই হই। যখন উপরে থাকি তখন তো অলসভাবে বসে থাকি না, তখন ডাকাডাকি ক'রে না নামালেই খুশী হই।"

একদিন আমি জিজ্ঞাসা করলাম—"দেউল্‌টিতে আপনার সময় কি ক'রে কাটাতেন?"

তিনি বললেন—"গাঁয়ে অবসর কাটানোর অসুবিধা কিছুই নেই। বেরিয়ে পড়তাম সকালে কিংবা বিকালে কৈবর্ত্ত পিসী মুড়ি ভাজছে, সেখানে একটু বসে গল্প করলাম। জেলেরা পুকুরে মাছ ধরছে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে দেখলাম। দুলে পাড়ায় দুই জায়ে তুমুল ঝগড়া চলছে, তাদের দুপক্ষের অভিযোগ শুনে বিবাদ মিটিয়ে দিলাম, বাঁড়ুজ্যে মশায় পাল মশায়ের সঙ্গে দাবা খেলছে তাদের কাছে একটু বসলাম, দুটো উপর চাল বলে দিলাম। নিজেও দু'বাজি খেললাম। অশত্থ তলায় ডোমেরা ঝুড়ি বুনছে, নয়ত কেউ ফুটো ঘটি-বাটিতে রাঙঝাল দিচ্ছে, তাদের কাছে বসে একটু গল্প করলাম। একমুঠো মুড়ি খেতে খেতে কামাররা লোহা পিটুচ্ছে, সেখানে দাঁড়িয়ে আগুনের ফিনকি ছড়ানো দেখলাম।...

গাঁয়ের দাদাঠাকুর আমি, কত যে সালিশি মধ্যস্থতা করতে হয়, কত যে মামলা মেটাতে হয়, কত যে গৃহ-কলহের নিষ্পত্তি করতে হয়—এমন কি স্বামী-স্ত্রীর বিবাদ-বিসংবাদেরও মীমাংসা করতে হয় তার ইয়ত্তা নেই। এছাড়া বারোয়ারির চাঁদা তোলার তদারক করার প্রয়োজন হয়, ঘরে আগুন লাগলে নিভাবার ব্যবস্থা করতে হয়, কারো কঠিন ব্যারাম হলে চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হয়, বিয়ের ঘটকালি করতে হয়—বিয়ে বাড়ী, শ্রাদ্ধ বাড়ীতে গিয়ে বিলিব্যবস্থা করতে হয়—এমনি কত কাজ। গাঁয়ে আমাকে কেউ অসাধারণ বলে জানে না, সেখানে আমি শুধুমাত্র দাদাঠাকুর, আর পাঁচজনের মত আমিও একজন সাধারণ মানুষ। অসাধারণত্বে গৌরব আছে, দাদাঠাকুর হওয়ায় কিন্তু একটা আনন্দ আছে। সে আনন্দ হয়ত সত্যি দাদাঠাকুরেরা পায় না। কারণ সত্যিই তারা নিতান্ত সাধারণ মানুষ, কিন্তু আমি সবার সঙ্গে সাধারণ হয়ে অসাধারণত্বের বোঝা ঘাড় থেকে নামিয়ে লঘুচিত্তে মিশতে গিয়ে একটা কৌতুক অনুভব করি ব'লেই আনন্দ পাই।

এখানেও সাহিত্যিক অসাহিত্যিক গণ্য নগণ্য অগণ্য লোকের সঙ্গে সমভাবে মেলামেশা ক'রে নিজের অসাধারণত্বের বোঝা ঘাড় থেকে নামিয়ে একটা আরাম ও স্বস্তি পাই। তাই নির্বিচারে সবার সঙ্গেই মিশতে চাই।" *

তিন

সাহিত্য ভাবনা

সাহিত্য সম্বন্ধে একটা প্রবন্ধ একদিন পড়িয়ে তাঁকে শুনিয়েছিলাম। তিনি শুনে বললেন—"এসব প্রবন্ধ অমুক পত্রিকায় ছাপতে দাও না কেন? এতে অনেকের উপকার হবে।"

আমি বললাম—"কে ছাপে? কবিতাই কেবল চায়। প্রবন্ধ দিলে ফেলে রাখে। বোধহয় ভাল প্রবন্ধ আমার কাছে প্রত্যাশাই করে না।"

এর উত্তরে তিনি বলেছিলেন—"এক কাজ কর। প্রবন্ধগুলো সব আমার নামে ছাপতে দাও। প্রবন্ধগুলোর তলায় আমি স্বাক্ষর করে দিচ্ছি। তারপর একখানা পুরো বইএর মত ছাপা হয়ে গেলে তখন একখানা চিঠি ছেপে দেব, 'ঐ প্রবন্ধগুলো আমার নামে বেরুলেও আমার লেখা নয়, অমুকের লেখা।' তারপর তুমি নাম দিয়ে বই বের করো। বেশ ফাঁকি দিয়ে প্রবন্ধগুলো ছাপিয়েও নেওয়া যাবে। কিছু দক্ষিণার টাকাও তোমার পকেটে আসুক। যেমন সব সম্পাদক আর কাগজওয়ালা, ব্যবস্থাও তেমনি হওয়াই উচিত।"

তাঁর এই রসিকতার মধ্যে বেশ একটা শাণিত ইঙ্গিত আছে।

সাহিত্য ক্ষেত্রে দলাদলি রেষারেষি তিনি আদৌ ভালবাসতেন না। তিনি চাইতেন, সকলে মিলেমিশে শান্তিতে এক সারস্বত গোষ্ঠীর পরিজন হ'য়ে সাহিত্যসেবা করুক। তা নিয়ে ঝগড়াঝাঁটি গালাগালি আড়াআড়ি করলে সরস্বতীর সেবায় শ্বেতচন্দনের বদলে রক্তচন্দনের উপচয় হবে। রসচক্র থেকে যখন কবিবর যতীন্দ্রমোহন বাগচীকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়, তখন আশীর্বাদ প্রেরণের জন্য আমি শরৎদাদাকে লিখেছিলাম। তার উত্তরে আশাতীত আনন্দ প্রকাশ ক'রে উপসংহারে তিনি লিখেছিলেন—"অনেকে উপস্থিত আছে, এই সুযোগে একটা দুঃখের অনুযোগ জানাই। আগেকার দিনের সকল কথা তোমার স্মরণ না থাকলেও কিছু কিছু হয়ত মনেও পড়বে। এদিনের মতো সেদিনে আমরা এমন ক'রে ছিদ্র খুঁজে বেড়াতাম না। এক-আধটা ব্যতিক্রম হয়ত ঘটেছে, কিন্তু এখনকার সঙ্গে তার তুলনাই হয় না। সাহিত্যসেবকদের মাঝখানে ভাবের আদানপ্রদান, একের কাছে অপরের দেওয়া-পাওয়া চিরদিনই চ'লে আসছে, চিরদিনই চলবে। তরুণদের মধ্যে আজকাল একি হতে চলল? নিন্দে

করার একি উদ্দাম উৎসাহ! গ্লানি প্রচারের একি নির্দয় অধ্যবসায়। কেবলি একজন আর একজনকে চোর প্রতিপন্ন করতে চায়। খবরের কাগজে যত দেখি ততই যেন মন লজ্জায়, দুঃখে পরিপূর্ণ হ'য়ে আসে। ক্ষমা নেই, ধৈর্য নেই, বেদনাবোধ নেই, হানাহানির নিষ্ঠুরতার যে শেষ হতেই চায় না। কোথায় কার সঙ্গে কার কতটুকু মিলেছে, কার লেখা থেকে কে কতখানি নকল করেছে— রুক্ষ কটুকণ্ঠে এই খবরটা বিশ্বের দরবারে ঘোষণা ক'রে যে এরা কি সান্ত্বনা অনুভব ক'রে আমি ভেবে পাইনে। ঘরে বাইরে এরা কেবলি জানাতে চায় যে বাঙলা দেশের সাহিত্যিকদের বিদেশের চুরি করা ছাড়া আর কোন সম্বলই নেই। অতি পরিশ্রমে খুঁজে খুঁজে এই গোয়েন্দাগিরির কাজটা তখনও আমাদের সাহিত্যিক মহলে প্রচলিত হ'য়ে ওঠেনি। যাই হোক, কামনা করি তোমাদের রসচক্রের রসিকদের মধ্যে যেন এ ব্যাধি কখনো প্রবেশ করবার দরজা খুঁজে না পায়।"

এর কিছুকাল পরে তিনি নিজে রসচক্রের দরজায় বেত্রহস্তে এসে দাঁড়িয়েছিলেন—কাজেই ঐ ব্যাধি রসচক্রের মধ্যে কোনদিনই প্রবেশ করতে পায়নি।

শরৎচন্দ্রের এই চিঠিটা যতীন্দ্রমোহনের সংবর্ধনা সভায় পড়ে শুনিয়েছিলাম— এজন্য আমার লাঞ্ছনা কম হয় নি। শরৎচন্দ্র ছিলেন তাঁর উদ্দিষ্ট লেখকদের নাগালের বাইরে, কাজেই তাঁদের আক্রোশটা আমার উপর পড়েছিল—সাময়িক সাহিত্যের পাঠকমাত্রেই তা জানেন। বলা বাহুল্য শরৎচন্দ্রের মতের সঙ্গে আমার মতের পার্থক্য ছিল না—সেজন্যই বোধহয় এত আক্রমণ সহ্য করতে হয়েছিল।

সাহিত্যসেবা শরৎচন্দ্রের জীবনের মহাব্রত যে ছিল সে বিষয়ে কারো সন্দেহ নেই। মাঝে মাঝে তিনি রসিকতা করে বলতেন—লেখাটা আমার পেশা, পেটের দায়ে লিখি। একদিন তিনি বললেন—"ওহে, লেখা অভ্যেস করেছিলাম ব'লেই বেঁচে গিয়েছি। আমার দ্বারা আর কোন কাজ হ'ত না। চিরকাল চাকরি করা আমার ধাতে সইত না। বর্মায় কিছুকাল চাকরি করেছিলাম, তাকে চাকরিও বলতে পার—লড়াইও বলতে পার। ওপর-ওয়ালার সঙ্গে একদিনও বনে নি। তোমাদের কলকাতায় যা দেখছি—তাতে তো আমার পেটের ভাত যোগাড় করাই কঠিন হ'ত। এখানে দেখছি ওপর-ওয়ালার মন যোগানোর জন্য লোকে কি অসাধ্য সাধনই না করছে! এও আমি পারতাম না। ভাগ্যে তোমাদের মত ডিগ্রীফিগ্রী পাইনি। যত্ন করে লেখাটা অভ্যেস করেছিলাম—তাই বেঁচে গিয়েছি।"

একদিন তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম—"বাঙালীর পল্লীসংসারে আমরাও তো প্রতিপালিত হয়েছি—অন্যান্য সাহিত্যিকরাও প্রতিপালিত হয়েছেন, কিন্তু পল্লীসংসারের অন্তরের অন্তস্থলের এত গূঢ় সংবাদ তো আমরা পাই নি—আপনার কি তৃতীয় নেত্র আছে?"

শরৎচন্দ্র হেসে উত্তর করেছিলেন—"জান, আমি কোনদিনই তোমাদের মত সংসারী বা গৃহস্থ নই, বাল্যকাল থেকে ভবঘুরে 'স্রোতের শেওলা', কিন্তু আমি সন্ন্যাসীও নই, চিরদিন লোকালয়ে গৃহসংসারের আশ্রয়েই আছি। চিরদিন নির্লিপ্ত থাকার জন্য এবং সমাজসংসারের বিধিনিয়ম অনুসরণ করে না চলার জন্য আমি ভাল ক'রে সমাজসংসারের অন্ধিসন্ধি দেখবার অবসর পেয়েছি। সমাজসংসারের বাইরে যে থাকে সে সবটা দেখবার অবসর বা সুযোগ পায় না, আবার সংসারজীবনে যে আকণ্ঠ নিমগ্ন সে-ও সব দেখবার সুযোগ পায় না। নাটকে যারা ভূমিকা গ্রহণ করে তারা নাটকটার অভিনয় ভাল করে দেখতে পায় না—উপভোগ করতেও পারে না। ভাল ক'রে দেখে ও উপভোগ করে রঙ্গালয়ের দর্শকরা। রঙ্গালয়ের বাইরে নাটক প'ড়েও পাঠক বিশেষ কিছু উপভোগ করতে পারে না। আমি খাঁটি সংসারী না হয়ে সংসারের আনাচে কানাচে ঘুরে ঘুরে সমস্তটুকু দেখে নিয়েছি। যা দেখেছি তাই লিখে গিয়েছি—কিছুই বানাই নি। যা দেখিনি শুধু শুনেছি, বই বা খবরের কাগজ পড়ে পেয়েছি—তা লেখার মধ্যে গুঁজে দিই নি। শুধু চোখে দেখা সত্য ব্যাপারগুলোর কথা লিখে গেলে যে এমন সাহিত্য হয়ে উঠতে পারে, তা কোনদিন ভাবিও নি; বিশেষ ভরসা নিয়েও লিখতে শুরু করি নি।"

আমি বললাম—"শুধু কি এই দৃষ্টির প্রখরতা? গাঢ় ও গভীর অনুভূতি, অসামান্য দরদ, অপূর্ব সরস রচনাভঙ্গী—এ সমস্ত না হলে কেবল অন্তর্দৃষ্টির ফলে এত বড় সাহিত্য হ'তে পারত না।"

তিনি বললেন—"সে সব আমার অনুশীলনের ফল নয়। সেগুলোকে বিধিদত্ত শক্তি বা স্বাভাবিক শক্তিও বলতে পার—সে সব আমার মানসিক চরিত্রেরই অঙ্গীভূত। তুমি সেদিন বলেছিলে—শোক হ'তেই শ্লোকের জন্ম। বাল্যকাল থেকে বাঙলার পল্লীসংসারের কি দুঃখকষ্ট, অভাব, দারিদ্র্য, লাঞ্ছনা ও অসহায়তার চিত্রই না দেখেছি। দুঃখ পেয়েছিও কম নয়—তবে নিজের দুঃখে কখনও মুহ্যমান হইনি। বাঙালী সংসারের দুঃখে, বিশেষতঃ বাঙ্গালী নারীর দুঃখে আমার বুক ফেটে কান্না আসত। সেই বেদনাই আমার চরিত্রকেও

গড়েছে—সাহিত্যকেও গড়েছে। এর বেশী কিছু বলতে চাই নে। এর বেশী কিছু বলতেও পারব না।"

আমি একদিন বলেছিলাম—"দাদা, আপনার বইগুলো নিয়ে আলোচনা হওয়ার দরকার। আপনার ভক্ত অনেক, কিন্তু কেউ বইগুলো নিয়ে তেমন আলোচনা করে না। আমার ইচ্ছা আপনার এক একখানা বই ধরে প্রবন্ধ লিখি।"

তিনি তার উত্তরে বলেছিলেন—"আলোচনার কি প্রয়োজন? আমার বই পড়ে বোঝা ত খুবই সোজা। বইগুলোও এই দেশের লোকেদেরই জীবনের আলোচনা—আলোচনার আবার আলোচনার কি প্রয়োজন? হ্যাঁ, আলোচনা, ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ প্রয়োজন রবীন্দ্রনাথের লেখার। দেশের লোক রবীন্দ্রনাথের লেখা বোঝে না—বুঝিয়ে দেওয়ার দরকার।"

আমি বললাম—"আপনার বই পড়ে দেশের লোক বোঝে সন্দেহ নেই, কিন্তু কতটুকু বোঝে? যতটা বোঝে তার চেয়ে ঢের বেশী বুঝবার আছে; হরফের কথাগুলো পড়ে লোকের ভাল লাগে সন্দেহ নেই—উপরি উপরি যতটা বোঝে তাতেই প্রচুর আনন্দ পায়, যদি ভিতরে প্রবেশ করতে পারত, তাহলে আরো বেশী আনন্দ পেত। আপনার লেখা রসে ভরপূর—কিন্তু সে রস উপরে যতটা, ভিতরে তার চেয়ে ঢের বেশী। তাছাড়া সাধারণ পাঠক যে শাঁসেই পৌঁছায় না। প্রত্যেক রচনার অন্তঃস্থলে একটা জীবনসত্য আছে, সেটার সন্ধান দেওয়ার প্রয়োজন। একটা কোন তত্ত্বমূলক আদর্শ এক একটা গল্পের রূপ ধরেছে—সেটাকে দেখিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন। তা ছাড়া টেকনিক আছে। সেটারও বিশ্লেষণ দরকার।"

শরৎচন্দ্র বললেন—"ঐগুলোকেই ত আমি ভয় করি, ভাই। দেশের লোক যা বুঝেছে—তাই খাঁটি বোঝা। যাদের কথা তারা যা বুঝেছে সেই বোঝাই আসল বোঝা। তাছাড়া যা কিছু আছে—তা উপরি পাওনা। পাঠকের উপরি পাওনার উপর আমার দাবিদাওয়া কিছু নেই। যারা সাহিত্যস্রষ্টা, তারা যদি আলোচনা করে, তবে সে উপরি পাওনাটা আদায় হ'তে পারে। কিন্তু তারা ত আলোচনা ক'রে সময় নষ্ট করবে না—তারা বরং নূতন করে সাহিত্য সৃষ্টি করবে ঐ লেখা থেকে ইঙ্গিত প্রেরণা পেয়ে। যারা সাহিত্যসৃষ্টি করতে পারে না, অথচ বিদ্বান অর্থাৎ অধ্যাপকের দল, সমালোচনা করবে তারাই। তাদের কিন্তু আমি ভয় করি, তারা আমার লেখার ভিতর কি আছে তা দেখবার জন্য ততটা ব্যগ্র নয়,—নিজেদের বিদ্যা প্রকাশের জন্যই তারা উদ্‌গ্রীব। এজন্য আমার লেখার

মধ্যে যা নেই—যা আমি কখনও ভাবিনি তাও আমার লেখার ঘাড়ে তারা চাপাতে প্রস্তুত। মোট কথা, লেখকের চেয়ে তারা যে কত বেশি জানে—তারা যে কত বড়, তাই জানাবার জন্যই তারা ব্যাকুল। তারা যেরকম খুঁটিনাটি ক'রে বিচার করতে যায়—তাতে পাঁচটা গুণের কথা যদিই বা আবিষ্কৃত হয়—৫×৫=২৫টা ত্রুটিও তাদের চোখে পড়ে। প্রশংসা লিখতে তারা বসে, কিন্তু বিশ্লেষণ করতে করতে তারা বইপড়া বিদ্যের কষ্টিপাথরে ঘষতে ঘষতে শেষে প্রশংসার জিনিষ বেশি কিছু পায় না—তখন শেষে উপসংহার করে তাঁদের বলতে হয় এই সকল ত্রুটি সত্ত্বেও এঁর লেখা প্রথম শ্রেণীর লেখা। লেখার মধ্যে কি কি আছে বলতে গিয়ে কি কি নেই, তারও একটা তালিকা তারা দেয়। এই এই থাকলে লেখা ভাল হ'ত—এটা এভাবে না হয়ে ওভাবে বল্‌লে ভাল হ'ত—এসব কথা মানবজীবন সম্বন্ধে গভীর অভিজ্ঞতা যাদের নেই, যারা এক কলম সাহিত্য রচনা করেনি, তাদের মুখে শুনতে কি ভাল লাগে? এই সব সমালোচকদের মুরুব্বিয়ানা সকল সাহিত্যিকেরই অসহ্য নয় কি? তারা এমন সব বিলিতী বইএর নাম ক'রে বলবে—এই বইএর অমুক চরিত্র থেকে শরৎচন্দ্র অমুক চরিত্র লিখেছেন—অমুক বইএর রচনাভঙ্গীতে অমুক বইএ অনুসরণ করেছেন ইত্যাদি। বলা বাহুল্য আমি মুখ্যুসুখ্যু মানুষ, সে সব বইএর নামও কখনো শুনিনি। কেউ বলবে এই চরিত্রটি শরৎবাবু নিজে, অমুক চরিত্রটি শরৎবাবু তাঁর বাল্যবন্ধু অমুকের চরিত্র থেকে নিয়েছেন। যেন সমালোচক আমার জীবনের সব কথাই জানেন এবং আমার মনেরও খবর রাখেন। কেউ বলবে—শরৎচন্দ্রের নারী চরিত্রগুলো সবই এক। যেন বাঙ্গালী পল্লীনারীর চরিত্র দশ রকমের হয়! কেউ বলবে—এসব চরিত্র স্বাভাবিক নয়—যেন সকল প্রকার চরিত্রের সঙ্গেই সমালোচকের ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে। এমনি সব কথার দ্বারা রচনার কি যে সত্যোদ্ধার বা রসোদ্ধার হয় তা বুঝি না। কাজ নেই ভাই আমার লেখার আলোচনা হয়ে। শবেরই ব্যবচ্ছেদ হয়—জীবন্তের ব্যবচ্ছেদ তাকে হত্যা করা।"

আমি বললাম—"আপনি সমালোচনা চান না ব'লেই ত তা রোধ করতে পারবেন না। একদিন আপনার বইএর আলোচনা করে বহু শিক্ষার্থী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি.লিট্. পি-এইচ ডি হবে। তাছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ে আপনার বই পড়ানো হবে, তখন আলোচনা অনিবার্য হয়ে উঠবে।"

তিনি বললেন—"সে যখন হবে আমি তখন থাকব না। আর অধ্যাপকরা কেমন করে বিশ্লেষণ ক'রে পড়াবেন তাও আমি শুনতে আসব না।"

আমি বললাম—"তবে আপনি আমাকে আলোচনা করতে নিষেধই করছেন।"

তাতে তিনি বললেন—"তুমি লিখতে চাও লেখ—তোমার উপর অনেকটা নির্ভর করতে পারি—প্রথমতঃ তোমার গভীর শ্রদ্ধা আছে। দ্বিতীয়তঃ তুমি অধ্যাপক নও, বিদ্যার প্রচণ্ডতা তোমার নেই। তৃতীয়তঃ তুমি নিজে সাহিত্যিক, সাহিত্যপথের দুর্গমতা আর ও পথযাত্রীর দায়িত্ব তুমি জান—তার প্রতি স্বাভাবিক দরদও তোমার আছে।"

শরৎচন্দ্রের বইগুলি সম্বন্ধে এতদিনে আমি কিছু কিছু লিখেছি, তাঁর জীবদ্দশায় কিছুই লেখা হয়নি। তবু একটি কারণ তাঁর পক্ষ থেকে কোন তাগিদ ছিল না—তাঁর সঙ্গলাভে এবং তাঁর কথামৃত পানে এমনি মুগ্ধ ও বিভোর ছিলাম যে, নিজের অন্তর থেকেও কোন তাগিদ আসে নি। আজ তিনি নেই—এখন তাঁর বইগুলি দিয়ে তাঁর সাহচর্য ক্ষতিপূরণ করছি। কাজেই স্বতই বইগুলোর আলোচনা করবার আগ্রহ জন্মেছে। সাহিত্যিকরূপে তিনি এদেশে যে প্রতিষ্ঠা ও মর্যাদা লাভ করেছিলেন তা অসামান্য না হলেও সামান্য নয়। এ বিষয়ে শেষজীবনে তাঁর আর ক্ষোভ ছিল না। কিন্তু এতেই তিনি তুষ্ট হন নি। তিনি চাইতেন—অন্যান্য সাহিত্যিকরাও তাঁদের প্রাপ্য মর্যাদা লাভ করুন। তাঁর সঙ্গে আমরা যেখানেই গিয়েছি, দেখেছি তিনি প্রভূত মর্যাদা লাভ করেছেন। কিন্তু তিনি তাতে তুষ্ট না হয়ে কেবলি আমাদের দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলতেন—'এরাও খুব বড় সাহিত্যিক। এরা আমার বন্ধু, এদের আমি খুব শ্রদ্ধা করি। ভাবটা এই—এদেরও তোমরা আমার মতই মর্যাদা দান কর। বলা বাহুল্য এ মর্যাদা তো সাহিত্যগুরুর আদেশ-উপদেশের উপর নির্ভর করে না—নিজের শক্তিতে তা অর্জন করতে হয়, সে শক্তিও আমাদের নেই। আমি কেবল তাঁর হৃদয়বত্তা ও মনুষ্যত্বের কথাই বলছি।

একদিন এই প্রসঙ্গেই তিনি বলেছিলেন মনে আছে—দেখ, অন্যান্য দেশে একজন ফিলজফির অধ্যাপকের চেয়ে একজন ফিলজফারের সম্মান বেশী। একজন ইতিহাসে দিগ্‌গজ পণ্ডিতের চেয়ে একজন প্রদেশ-বিশেষের ঐতিহাসিকের মর্যাদা বেশী। আর সহিত্যের খুব বড় অধ্যাপকের চেয়ে একজন ছোট সাহিত্যসম্রাটও অধিকতর শ্রদ্ধেয়। কিন্তু এদেশে তার বিপরীত। একজন সাহিত্যের অধ্যাপক, এমন কি একজন সাহিত্যে এম-এ পাশ করা লোকও যে-কোন প্রথম শ্রেণীর সাহিত্যিকের অধিক মর্যাদা পায়। আরে সাহিত্য সাহিত্যই; তা' বাংলায় লেখা বলে কি তুচ্ছ হল নাকি? ডি-লিট, পি এইচ

ডি-দের শিক্ষা বিভাগের লোকেরাই চেনে—মরার পরে কেউ তাদের নামও করবে না। আর সাহিত্যিককে চেনে দেশের শিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত সবাই, মৃত্যুর পর তার রচনা অমর হয়ে থেকে যাবে। আর কিছু না বুঝিস বাপু এটা ত বুঝিস্। কিন্তু তোমাদের এই শহরের শিক্ষিত সমাজে কি দেখি? কোন সভায় গেলে দেখি বড় বড় চাকুরেরা ব্যারিষ্টার উকিলরা আর অধ্যাপকেরা প্যাণ্ডেল জঁাকিয়ে বসে আছেন, আর প্রথম শ্রেণীর সাহিত্যিক দূরে এক বেঞ্চিতে ভিড়ের মধ্যে বসে আছেন। নিমন্ত্রণ বাড়ীতে গিয়ে দেখি কর্মকর্তা মোটরে চড়া বাবুদের আর সাহেবদের নিয়েই ব্যস্ত, সাহিত্যিকদের প্রতি ফিরেও চান না।

এদেশ আবার সভ্যতার গর্ব করে? একেই কি বলে কালচার? দেশের লোক uncultured বলেই সাহিত্যিকরা যথাযোগ্য মর্যাদা পায় না এবং সাহিত্যিকরা দরিদ্র। যে সমাজে সাহিত্যিকরা যথাযোগ্য মর্যাদা পায় না, সে সমাজে বাস করে সাহিত্যিকদের আর দ্বেষাদ্বেষি করা উচিত নয়, একজন আর একজনকে ছোট করবার জন্য যে প্রচণ্ড চেষ্টা করে তাতে নিজেদের পায়েই কুড়ুল মারা হয়। বরং বিপরীত পথে চলা উচিত। প্রত্যেকের উচিত অন্যকে অনেক বড় ব'লে প্রতিপন্ন করা, যতদূর সম্ভব অপরের মান বাড়ানো। তা দেখে সমাজের অন্যান্য লোকেও শ্রদ্ধা করতে শিখবে। সমাজের লোকেরা যে আমাদের শ্রদ্ধা করে না তার একটা কারণ, আমরা নিজেদেরই শ্রদ্ধা করি না, উপেক্ষা করি, ছোট করে দেখি।

চার

ব্যাকরণ বিচিন্তা

শরৎচন্দ্র আমার কোন কবিতার বই পড়েছিলেন কিনা জানি না—মাসিক পত্রে ২।৪টা কবিতা পড়ে আমার সম্বন্ধে তাঁর একটা ধারণা সম্ভবতঃ হয়েছিল। তবে তিনি একখানা বই যে মন দিয়ে পড়েছিলেন সে বিষয়ে সংশয় নেই। সেখানা কবিতার বই নয়—সেটা ছাত্রপাঠ্য পুস্তক 'রচনাদর্শ'। রচনাদর্শ পড়ে তিনি লিখেছিলেন—"বইখানি আমি আদ্যোপান্ত শ্রদ্ধার সহিত পড়িয়াছি এবং উপকৃত হইয়াছি।" এই মন্তব্যের জন্যই বোধহয় কোন পত্রিকায় তাঁর ব্যাকরণ জ্ঞান সম্বন্ধে একটা ব্যঙ্গাত্মক মন্তব্য প্রকাশিত হয়েছিল।

তিনি এ বই থেকে কি উপকার পেয়েছিলেন তা জানি না—তবে আমি তাঁর কাছ থেকে উপকার পেয়েছিলাম। খাঁটি বাংলার বাক্যগঠন ও ইডিয়াম সম্বন্ধে তিনি আমাকে অনেক উপদেশ দিয়েছিলেন, দোষ ত্রুটিও দেখিয়েছিলেন।

আমার বই-এ ছিল—'স্বভাব যায় না ম'লে ইল্লত যায় না ধুলে।' তিনি বলেছিলেন—ওটা হবে 'ইল্লত যায় ধুলে, স্বভাব যায় না ম'লে।' অর্থাৎ 'না'-টা হবে না।

আমার বই-এ ছিল—'ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো'। তিনি বলেছিলেন ওটা হবে—'ঘরের খেয়ে বনের মশা তাড়ানো।' তিনি বলেছিলেন—খেলা-ধুলা ধুম-ধাম ইত্যাদির বানানে 'ধূ' লিখবার প্রয়োজন নেই। লক্ষ্মীছাড়া বানানে "ক্ষ্ম" না লেখাই উচিত। সংস্কৃত 'লক্ষ্মীর' সঙ্গে ছাড়া না লাগিয়ে বাংলা লক্ষীর সঙ্গেই লাগানো উচিত। দ্বাদশ বৃহস্পতি—দ্বাদশে বৃহস্পতি; একাদশ বৃহস্পতি—একাদশে বৃহস্পতি এরূপ ইডিয়াম হবে। এইরূপ অনেক মূল্যবান Suggestion দিয়েছিলেন।

তিনি বলতেন—আগুনের সঙ্গে গুণের, মেহেরবাণির সঙ্গে বাণীর, পোষাকের সঙ্গে পোষের কোন সম্বন্ধ নেই, অতএব আগুন, মেহেরবানি, পোষাক, খোরপোশ ইত্যাদি বানান হবে।

তিনি একদিন বললেন, "ওহে, বাক্যে ঘন ঘন আমি 'ইয়া' লাগাই ব'লে দোষ ধরেছ তোমার বই-এ।"

আমি রচনাদর্শে বাক্যে ঘন ঘন 'ইয়া' প্রয়োগ দোষাবহ এই মন্তব্য ক'রে শরৎচন্দ্রের 'রামের সুমতি' থেকে বাক্য তুলেছিলাম। সে বাক্য দুটা এই—

(ক) একদিন ভাত খাইতে খাইতে রাগিয়া উঃ আঃ করিয়া বার দুই জল খাইয়া রাম ভাতের থালাটা টান মারিয়া ফেলিয়া দিয়া দাঁড়াইয়া উঠিয়া নাচিতে লাগিল।

(খ) তারপর নারায়ণী মায়ের হাত ধরিয়া টানিয়া গিয়া দুই পায়ে জল ঢালিয়া আঁচল দিয়া মুছাইয়া লইয়া একটা পিঁড়ির উপর বসাইয়া পাখা লইয়া তাঁহাকে বাতাস করিতে লাগিলেন।

শরৎচন্দ্র বললেন—দেখ, মার্জিত ভাষায় লিখতে গেলে এ অসুবিধা হবেই। আমি ঘন ঘন ইয়া ব্যবহার এড়াতেই চাই, কিন্তু অনেক স্থলে নিরুপায় হয়ে ব্যবহার করি—অনেক স্থলে অনবধানতাও যে নেই তা নয়—বাক্যগুলি ভেঙ্গে ছোট ছোট ক'রে নিলেই চলে। রবীন্দ্রনাথ এইজন্য বোধহয় মার্জিত ভাষা ছেড়ে চলতি ভাষা ধরেছেন। চলতি ভাষাতে কোন অসুবিধা হয় না। রবীন্দ্রনাথ যখন মার্জিত ভাষায় লিখতেন, তাঁরও এ বিপদ ঘটত।

এই বলে তিনি রবীন্দ্রনাথের 'গল্পগুচ্ছ' আনালেন এবং তা থেকে দুটি জায়গা আমাকে দেখালেন—

(ক) যে লোক সমস্ত জীবন কঠোর ত্যাগ স্বীকার করিয়া নানা প্রলোভন অতিক্রম করিয়া লোকমুখের তুচ্ছ খ্যাতি অবহেলা করিয়া অভ্রান্ত ও সতর্ক কৌশলে সমস্ত প্রতিকূল বাধা প্রতিহত করিয়া এক একটি রৌপ্যের স্তরে সম্পদের একটি সমুচ্চ পিরামিড একাকী স্বহস্তে নির্মাণ করিয়া গিয়াছেন তিনি হাঁটুর নীচে কাপড় পরিতেন বলিয়া যে কম লোক ছিলেন তাহা নয়।

(খ) অনুকূলের স্ত্রী কোন প্রশ্ন কোন বিচার না করিয়া তাহাকে কোলে বসাইয়া তাহাকে স্পর্শ করিয়া তাহার আঘ্রাণ লইয়া অতৃপ্ত নয়নে মুখ নিরীক্ষণ করিয়া কাঁদিয়া হাসিয়া ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন।

আমি ঐ দুটি অংশও নোট করে নিলাম। শরৎচন্দ্র বললেন—"দেখ তুমি বড় বেশী সর্বনাম ব্যবহার কর। বারবার তিনি, তাঁহার, তাঁহাকে শুনতেও বিশ্রী লাগে। তার চেয়ে নামটাই বার বার ব্যবহার করা ভালো। একাধিক লোকের কথা থাকলে তিনি, তাঁহার, সে ইত্যাদি কাকে বোঝাচ্ছে তা ধরাই কঠিন হয়। আমার মতে গোড়ায় নামটা ক'রে মাঝে মাঝে নাম করে সর্বনাম চালালেই ভালো হয়।"

তিনি বললেন—মার্জিত ভাষায় লেখার জন্য আর একটা অসুবিধা হয়—

বাংলা ইডিয়াম অনেক ছেড়ে দিতে হয়। অনেক সময়ে বাংলা ইডিয়ামকে মার্জিত করে নিতে হয়—তাতে ইডিয়ামের ঠিক senseটা থাকে না—একথাও তুমি বইএ বলেছ। আমি আমার নিজের মুখের বিবৃতিতে তাই ইডিয়াম বড় লাগাই না—পাত্রপাত্রীর মুখের জবানে অজস্র ইডিয়াম চালাই—এটা বোধ হয় লক্ষ্য করেছ।

শরৎচন্দ্র আমাদের মজলিসে কোনদিনই খুব সাবধানে কথাবার্তা বলতেন না। মজলিসে কোন জাতের, কোন অঞ্চলের কোন লোক উপস্থিত আছে সে দিকে লক্ষ্য না রেখেই বলতেন—'আরে বারেন্দ্রকে বিশ্বাস করো না।' 'আমি বদ্দিকে বড় ভয় করি।' 'ভুলে যাচ্ছ কেন ও যে পদ্মার ওপারের লোক, ওর কাছে এর বেশী প্রত্যাশা ক'রো না।' অথবা 'একে বাঙ্গাল তাহে বদ্দি—একেবারে সোনায় সোহাগা।' 'লোকটার মুখে এক বুকে এক, লোকটা ব্রাহ্ম না হয়ে যায় না।' ইত্যাদি। বলা বাহুল্য এগুলোর একটাও তাঁর প্রাণের কথা নয়। তিনি এসব ভেদাভেদের অনেক উপরে ছিলেন। তবু এসব যে বলতেন সে শুধু পরিহাসচ্ছলে এবং পরখ করে দেখতেন—এসব কথা কে কি ভাবে নেয়। তাই আমাদের সামনেই আমাদের জাতি বা সম্প্রদায়কে আঘাত করতেন।

আমি কিন্তু প্রথম-প্রথম ঠিক বুঝতে পারি নি। এজন্য বেশ একটু ক্ষুণ্ণই হতাম। কিন্তু কোনদিন প্রতিবাদ করিনি। তবে সবার হাসিতে বা আমোদে যোগ দিতেও পারতাম না। এই ব্যাপার নিয়ে একটা কবিতা লিখে তাঁকে একদিন শোনালাম। কবিতাটা এই—

রমেশ রায়ের খুলনা বাড়ী? তবে ত বদ হবেই হবে।
জয় ভাদুড়ী হাড় বজ্জাত বারেন্দ্র হয় ভদ্র কবে?
গুপ্ত মাখন বদ্দি যখন
কখখনো সে নয়ক সুজন
বাঙাল নাকি উমেশ চাকী? লোক ত সোজা নয়ক তবে।
রামজাদু দাস জাতে নাপিত? ছোট জাত কি হয়রে ভাল?
বুঝেছি শ্যাম ঘোষ যে পাজি দেখে তাহার বর্ণ কালো।
হরিশ গুহ বরিশেলে
কাটবে গলা সুযোগ পেলে।
শরৎবাবু চাটুয্যে ত? বুঝবে ঠেলা ঠকবে যবে।
দক্ষিণে লোক নন্দ ঘোষাল বিশ্বাস তায় ক'রো নাক,
একে কায়েত মিত্তি তাতে রাজগোপালে চিনে রাখ।

বাপরে! নগু বর্ধমেনে
জাতে আবার গন্ধ বেনে,
বাইশ বছর মাসটারি যার মানুষ বলো সেই রাঘবে?
কমল রাহা বেন্ধ তাহা দুমুখো সাপ জানবে তারে
অমল সাহা জাল করেছে? বাড়ী বুঝি পদ্মাপারে।
যদুর বাড়ী শান্তিপুরে
প্রণাম নদে জেলার ক্ষুরে,
একে গোঁসাই তাতে উকিল ভদ্র বল নীলমাধবে?

কবিতাটা শুনে শরৎচন্দ্র একটু গম্ভীর হলেন। আমি ত খাতা গুটিয়ে পালাবার উদ্যোগ করছি। শরৎচন্দ্র বললেন—তুমি আমাকেই এই কবিতায় পরিহাস করেছ। আচ্ছা তুমি কি মনে কর আমি যে মাঝে মাঝে বারেন্দ্র, বদ্দি বাঙাল ইত্যাদি বলে মন্তব্য করি তা seriously করি? তুমি কি জান না—আমার কাছে জাতের মূল্য কি? মনুষ্যত্ব বা মহত্ব কোন জাতের, কোন বংশের কোন সম্প্রদায়ের, কোন জেলার, কোন সমাজের কোন বয়সের একচেটিয়া নয়—ওটা সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত ব্যাপার আমার চেয়ে বাংলাদেশে সাহিত্যে, জীবনে আচরণে আর কেউ দেখিয়েছেন? তোমার-আমার গুরুদেব রবীন্দ্রনাথও নন। আমার কাছে দেবতার মত উপাস্য, ভারতবর্ষের সর্বশ্রেষ্ঠ জননায়ক অসামান্য মহাপুরুষ দেশবন্ধু একাধারে বাঙাল, বৈদ্য ও ব্রাহ্ম। একথা তোমরা জান আমি দেশবন্ধুকে মহাত্মা গান্ধীর চেয়েও বড় বলে ঘোষণা করার জন্য তোমাদের রসচক্রের সভ্যেরা কত তর্ক করেছে, কেউ কেউ আমাকে উপহাস করেছে, একজন ত ক্ষেপেই গিয়েছিল।

আমি হুগলি জেলার রাঢ়ী ব্রাহ্মণ সমাজের লোক। আমার বেশির ভাগ বই-এ বিশেষত পল্লীসমাজ, বামুনের মেয়ে, পণ্ডিতমশাই, অরক্ষণীয়া ইত্যাদি বইএ হুগলী জেলার চিত্রই এঁকেছি। এসব বইএ হুগলী জেলার রাঢ়ী ব্রাহ্মণ সমাজের চরিত্রের কি চিত্র আমি এঁকেছি? ব্রাহ্ম দয়ালের চরিত্র আমিই এঁকেছি। আমি মুখে তোমাদের কাছে বদ্দি, বারেন্দ্র ইত্যাদির নাম ক'রে পরিহাস ক'রে থাকি। বইএ পাতায় পাতায় হুগলি রাঢ়ী ব্রাহ্মণ সমাজের চরিত্রকে কালির দাগে চিরস্থায়ী করে রেখেছি এবং দেশময় প্রচার করেছি। সব জেনে-শুনে আমার মুখের হাসি ঠাট্টার কথাগুলোকে তোমার seriously নেওয়া ভাল হয়নি।"

আমি বললাম—"দাদা Seriously কই নিলাম? আপনি পরিহাস

করেছেন জানি বলেই পরিহাস করে উত্তর দিলাম। কবিতাটি একটা ব্যঙ্গ কবিতা, Serious কবিতা ত নয়। Seriously যদি নিতাম—তাহলে সঙ্গে সঙ্গেই মজলিসেই প্রতিবাদ করতাম। ক্ষুব্ধ হ'বার লোক ত আমার দলে কম ছিল না। আপনার কত কথারই সবিনয়ে প্রতিবাদ করেছি—এরও প্রতিবাদই করতাম। আপনি কি এতে রাগ করলেন ?"

শরৎচন্দ্র বললেন—"না রাগ করিনি, তুমি বেশ লিখেছ—কবিতাটা তুমি ছেপ। আমি যে কবিতাটা শুনামাত্র গম্ভীর হয়ে গিয়েছিলাম তাও ক্ষুব্ধ বা বিরক্ত হ'য়ে নয়। আমার মনে এই ভাবনা হ'ল—সত্য-সত্যই তোমরা আবার মন্তব্যে রাগ কর নাকি, তুমি না রাগ করতে পার তুমি আমাকে খুব ভাল করেই জান—তোমার বন্ধু-বান্ধবরা রাগ করে নাকি ? এ কথাই আমার মনে হ'ল। তা হ'লেও আমার অন্যায়ই হয়। কারণ, কথাগুলো তুমি মনে রেখেছে এবং কবিতার ছলে আমাকে মনে করিয়েও দিচ্ছ। যাক ও সবে রাগটাগ যেন ক'রো না।"

আমি বললাম—"দাদা, আপনি যখন কলম ধরেন—তখন আপনি দেশ-কাল-পাত্রের অতীত কূটস্থ পুরুষ—কলম ছাড়লেই আপনি আমাদের মত সাধারণ বাঙালী—কূট শিখর থেকে নেমে আমাদের সঙ্গে মিশে যান। সাধারণ বাঙালী মুখে যা বলে তখন আপনার মুখ থেকে সেই সব কথাই বেরোয়। সাধারণ বাঙালীর যে ধর্ম তা তখন আপনি পালন করেন—আপনাকে স্বধর্মচ্যুত হতে বলতেও পারি না—আপনি স্বধর্মচ্যুত হ'ন তা আমরা চাইও না। রাগ কেন করব ? বরং খুশীই হই এ মনে ক'রে যে আপনি আমাদেরই একজন—আমাদেরই মত আপনার কথাবার্তা চাল-চলন। কলম ধরলেই আপনি আসামান্য—কলম ছাড়লে আপনি আমাদেরই মত সাধারণ বাঙ্গালী।"

পাঁচ

সমকালীন সাহিত্যসমাজ

শরৎচন্দ্রের সমাদর দেশে যা হয়েছিল—তা আমাদের দেশে রবীন্দ্রনাথ ছাড়া কোন বড় লেখকও জীবদ্দশায় পান নি। তাঁর বই বিক্রীর আয়ের দ্বারাও তিনি তা বুঝতেন। তা ছাড়া দেশের লোক তাঁকে নানাভাবে অভিনন্দিত করেছে। সভাসমিতি তিনি এড়িয়ে চলতেন, কিন্তু যে কোন সাহিত্যিক সভায় সভাপতিত্বের জন্য লোকে আগে তাঁর কাছেই যেত।

একটা ক্ষোভ তাঁর ছিল—দেশের কবিরা তাঁর যে সমাদর করেছেন—কথাসাহিত্যিকরা সেরূপ সমাদর করেন নি। কেউ কেউ তাঁর বিরুদ্ধে লেখনী চালনাও করেছেন। সেদিন একজন বিখ্যাত কথাসাহিত্যিক একজন সাহিত্যিকের সঙ্গে এসেছিলেন। কথাসাহিত্যিকটি রাস্তায় মোটরে বসে থাকলেন—আমার বাড়ীতে এসে দেখাও করলেন না।

এর উত্তরে আমি বলেছিলাম—কথাসাহিত্যিকরা প্রকাশ্যভাবে আপনার সমাদর যা করেছেন তা হয়ত আশানুরূপ নয়। কিন্তু মনে মনে তাঁরা যে সমাদর করেন তার সিকিও আমরা করতে পারিনি। বর্তমান যুগের কথা-সাহিত্যিকরা রবীন্দ্রনাথের অনুকারক ন'ন—তাঁরা আপনারই অনুকারক। আপনি কথাসাহিত্যে যে রচনাভঙ্গীর প্রবর্তন করেছেন—তারা সেই রচনাভঙ্গীরই অনুসরণ করে। তাদের রচনার বিষয়বস্তু অনেক স্থলেই হয়ত স্বতন্ত্র। কেউ গল্পের আবেষ্টনী গঙ্গাতীর থেকে পদ্মাতীরে বা অজয় ময়ূরাক্ষীর তীরে নিয়ে গিয়েছেন—কেউ বা বাঙ্গালীর সাধারণ পারিবারিক ও সামাজিক গণ্ডী অতিক্রম ক'রে বৃহত্তর সমাজের রচনার উপজীব্য খুঁজছেন—কেউ-বা আপনার কল্পিত পাত্রপাত্রী সমাজের যে স্তরের—সে স্তরের ঊর্ধ্বে অথবা আরো নিম্নে তাঁদের সাহিত্যের পাত্রপাত্রী সংগ্রহ করেছেন—কেউ বা সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের নানা তথ্য ও সমস্যার অবতারণা করেছেন, কিন্তু আপনি যে রচনাভঙ্গীর প্রবর্তন করেছেন—তারা জ্ঞাতসারেই হোক আর অজ্ঞাতসারেই হোক, তারই অনুসরণ করেছে। যে দরদী দৃষ্টি নিয়ে আপনি বাংলার দুঃস্থ দুর্গত নরনারীদের দেখেছেন—তারাও সেই দরদী দৃষ্টিরই অনুসরণ করেছে। সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের যে উদার সংস্কারমুক্ত নৈতিক আদর্শের আপনি প্রতিষ্ঠা করেছেন

তারাও তারই অনুসরণ করেছে। কেবল প্রকৃতি সম্বন্ধে attitude পেয়েছে রবীন্দ্রনাথ থেকে।

সংস্কৃত ভাষা থেকে প্রাকৃত ভাষার সৃষ্টি—তা থেকে হয়েছে বাংলা। বাংলা ভাষার সঙ্গে সংস্কৃত ভাষার যে সম্বন্ধ তাদের রচনার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের রচনার সেই সম্বন্ধ। আর বাংলা ভাষার সঙ্গে মাগধী প্রাকৃত ভাষার যে সম্বন্ধ তাদের রচনার সঙ্গে আপনার রচনার সেই সম্বন্ধ। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বের, আপনি বাংলার। বর্তমান যুগের কথাসাহিত্যিকের কারো দৃষ্টি বিশ্বের পানে নয়, বাংলার পানেই—কাজেই রবীন্দ্রনাথ তাদের গুরু আর আপনি তাদের অগ্রজ। তারা যদি সর্বপ্রকারে আপনারই পদাঙ্ক অনুসরণ ক'রে থাকে—তবে তার চেয়ে সমাদর আর কে করেছে ?

শরৎচন্দ্র বললেন—"অনুজ কি শুধু অগ্রজের অনুসরণ করে—তাকে ভালবাসে না—শ্রদ্ধা করে না ?"

আমি বললাম—"দেখুন, তাদের পক্ষ থেকেও ত অভিমানের কিছু থাকতে পারে। এ অভিমানও ত অস্বাভাবিক নয়—এ অভিমান অগ্রজের প্রতিই অনুজের থাকতে পারে।

শরৎচন্দ্র বললেন—কি অভিমান ?

আমি বললাম—রবীন্দ্রনাথ আপনার যথাযোগ্য সমাদর করেন নি বলে আপনি অভিমান প্রকাশ করতেন, সেই অভিমান তো এরাও আপনার প্রতি পোষণ করতে পারে। আপনি তো তাদের শক্তি স্বীকার ক'রে তাদের ডেকে বুকের কাছে টেনে নেন নি। আমি যদি বলি অমুক বেশ ভাল গল্প লিখছে—আপনি বলেন অমুক—হ্যাঁ, ছোকরাটি বেশ ভদ্র, বড় অমায়িক। এ তো recognition নয়। তাদের কোন বই পড়েছেন কিনা যদি জিজ্ঞাসা করি—তাতে হয় বলেন—না পড়ি নি। নয়ত বলেন—কই সে বই ত আমাকে দেয় নি। কাজেই তাদেরও অভিমান হতে পারে। কাউকে কাউকে আপনি যে certificate দেন নি তা নয়, কিন্তু তা বই পড়ে দিয়েছেন বলে মনে হয় না। ওরকম certificate আমি নির্বিচারে দিই বলে আমাকে তিরস্কারই করেছেন।"

শরৎচন্দ্র সত্যই সহৃদয় ব্যক্তি ছিলেন—তিনি এতে একটু লজ্জিতই হলেন। তিনি বললেন—"দেখ এদের বই নিয়ে আমি পড়তে গিয়ে কিছুদূর পড়েই যখন মনে হয়েছে এ লেখা আমিও অক্লেশে লিখতে পারতাম—তখনই আর আগাতে পারিনি। শেষ পর্যন্ত আর পড়া হয়নি।"

আমি বললাম—"আপনি যদি ধৈর্য ধরে শেষ পর্যন্ত পড়ে দেখতেন—তা হলে এমন জিনিষ অনেক পেতেন যাতে মনে হতে পারত—বাঃ এটা তো নতুন কথা, এটা ত আমার মনে আসেনি—এটা ত আমি লিখতে পারতাম না। তা ছাড়া যদি কিছুদূর এগিয়েই মনে হয়ে থাকে—এ লেখা আমিও লিখতে পারতাম—তা হ'লেও সেটা ত উপেক্ষণীয় নয়—প্রশংসনীয়। আপনি যা লিখতে পারতেন—তাও যদি কেউ লিখে থাকে—তাকে উৎসাহ দেওয়া কি আপনার কর্তব্য ছিল না?"

মোট কথা—নিজের রচনার সময় শরৎচন্দ্রের ধৈর্যের অভাব ছিল না, অধ্যবসায়ের অন্ত ছিল না। একই অংশ কতবার কেটে লিখতেন, সহজে তাঁর মনস্তুষ্টি হ'ত না। অনেক সময়ে আট-দশ পাতা নির্মমভাবে কেটে ফেলে নতুন করে লিখতেন। কিন্তু অন্যের পুস্তকপাঠে তাঁর ধৈর্যের অভাব ঘটত। গোড়া থেকেই খুব ভাল করে না জমে উঠলে তিনি কোন বই পড়ে উঠতে পারতেন না। Ivanhoe-র মত বই তিনি পড়তে পারেন নি। তিনি একদিন বলেছিলেন, "ওহে শুনেছি বঙ্কিমবাবু Ivanhoe থেকে দুর্গেশনন্দিনীর আখ্যানবস্তু পেয়েছেন—তাই শুনে Ivanhoe পড়তে গেলাম—কয়েক পাতা পড়ে মনে হ'ল—একথা কখনো সত্য নয়, বঙ্কিমবাবু কখনো Ivanhoe শেষ পর্যন্ত পড়তে পারেন নি।"

শরৎচন্দ্রের বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন উপাধি ছিল না। বিশ্ববিদ্যালয়ের recognition-কে তিনি কিন্তু স্পৃহনীয় মনে করতেন। একদিন বলেছিলাম—"আপনার ডি-লিট পাওয়া উচিত।"

তাতে তিনি বলেছিলেন—"কি হবে ভাই ও-উপাধি পেয়ে। দেশের লোক তো আমাকে তার চেয়ে ঢের বেশি সম্মান দিয়েছেন।" একটু ভেবে শেষে বললেন—"বোধহয় সাহিত্যসেবার জন্য কোন উপাধি দেওয়ার প্রথাই নেই। সাহিত্য ছাড়া অন্যান্য বিষয়কে এরা recognise করে।"

আমি বললাম—"তাও নয়, Thesis submit করলে ওরা Doctorate দেয়। যারা Thesis submit করে তারা তো এই উপাধির জন্যই করে। যাঁরা উপাধি পাওয়ার উপলক্ষ না করে স্বাধীনভাবে যে-কোন ক্ষেত্রে সারস্বতসাধনা করেন—আমাদের দেশের বিশ্ববিদ্যালয় তাঁদের উপাধি দিয়ে recognise করে না। তা করলে রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, বিজয়চন্দ্র মজুমদার, রমাপ্রসাদ চন্দ, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত ইত্যাদি মনীষীরা কবে Doctorate পেতেন। এঁরা জগতের যে-কোন দেশের পক্ষেই গৌরব।

যে সব বিষয়ে Thesis লিখে লোকে Doctorate পায়—সে সব Thesis-এর মূল্যের তুলনায় ঢের বেশি কাজ এঁরা করেছেন।"

শরৎচন্দ্র বললেন—"National University যখন হবে তখন তা দেশের মনীষীদের গৌরব দান করবে। আমি আর তখন থাকব না—তোমরাই পাবে।"

অল্পদিন পরেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ডি-লিট উপাধিতে ভূষিত করলেন। ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার এর দু' বৎসর আগেই আমাকে বলেছিলেন—"আমরা শরৎবাবুকে ডি-লিট দেওয়ার চেষ্টা করছি। কোন কোন পক্ষ থেকে আপত্তি হচ্ছে। সে আপত্তি কাটিয়ে উঠতে পারা যাবে বলে মনে হচ্ছে।"

শরৎচন্দ্র ডি-লিট উপাধি লাভ করলে আমরা রসচক্র থেকে একটা উদ্যান-সম্মিলনীর ব্যবস্থা করি—সেই সম্মেলনে নিম্নলিখিত অভিভাষণ পঠিত হয়েছিল।

"আপনারা সকলেই শুনিয়াছেন—গঙ্গাতীরের সর্বশ্রেষ্ঠ কথাশিল্পীকে বুড়ীগঙ্গাতীরের বিদ্বৎসমাজ ডি-লিট উপাধির দ্বারা ভূষিত করিয়াছেন। একদিন বঙ্গের রবিকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এই সম্মান দান করিয়া নিজের সম্মানই রক্ষা করিয়াছিল—আমরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নক্ষত্র, আমরা রবির প্রখর আলোকে বিলুপ্ত,—সে সম্মানে আমরা নিজেদের সম্মানিত মনে করি নাই। শরৎচন্দ্রের এই সম্মানেই নক্ষত্রেরা আজ সম্মানিত।

শরৎচন্দ্রের প্রতি এই মর্যাদা দান রস-সরস্বতীরই উপাসনা, রসের উদ্দেশে জ্ঞানের অর্ঘ্যদান, শিল্পের বেদীতে তত্ত্বের প্রণিপাত। রস-সরস্বতীকে যশোলক্ষ্মী বহুদিন আগেই বরণ করিয়াছে—আজ ঐশ্বর্যমদ-গর্বিতা ইন্দ্রানী যে তাহার রত্নকিরীট অবনত করিয়াছে—তাহাতে রস-সরস্বতীর সেবক মাত্রই বিজয় গৌরব অনুভব করিবে। নগণ্য সেবক হইলেও আজ আমরাও গৌরব অনুভব করিতেছি। কাক যদি কোকিলতা প্রাপ্ত হয়—তবে কোন্ কোকিলের না আনন্দ হয়? কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন—

অরসজ্ঞ কাক চোষে জ্ঞান নিম্বফলে
রসজ্ঞ কোকিল বুলে প্রেমাগ্র-মুকুলে॥

কাক যদি জ্ঞান-নিম্বফল ত্যাগ করিয়া একদিনের জন্য প্রেমাগ্র-মুকুলে বিলাস করে—তবে মুকুলকুঞ্জের কোন্ কোকিল আনন্দ অনুভব না করে? রসিক চিরদিনই রসের মর্যাদা বুঝে, তাহাতে নতুন করিয়া উল্লাসের কিছু নাই—কিন্তু যেখানে রসজ্ঞতার প্রত্যাশা করা যায় না—সেখান হইতে মর্যাদা আসিলেই উল্লাসের কারণ ঘটে। Old Testament-এর Prodigal Son-এর

উপাখ্যানের কথা মনে পড়ে, অনুগত সন্তানের আনুগত্যের জন্য উৎসবের প্রয়োজন হয় নাই—Prodigal Son যেদিন ফিরিয়া আসিল সেই দিন হইল মহা-মহোৎসব।

যাহারা সাহিত্যের খবর রাখে, সাহিত্যের জন্মকোষ্ঠী রচনা করে, যাহারা তাহার ঘটক কারিকা ও কুলুজির ভাণ্ডারী—যাহারা সাহিত্যের ঘরসংসারের তদারক করে এবং শেষ পর্যন্ত তাহার আদ্যশ্রাদ্ধ সপিণ্ডীকরণ পর্যন্ত সমাপ্ত করে—আমাদের বিদ্বৎসমাজ চিরকাল তাহাদেরই সম্মানিত করে—কিন্তু যাহারা সাহিত্য সৃষ্টি করে তাহাদিগকে কোন সম্মান দেওয়া তাহার রীতি-নীতি বিরুদ্ধ।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ঐ রীতি না মানিয়া প্রীতির বশে যাহা করিয়া ফেলিল—তাহা ভারতবর্ষের ইতিহাসে চিরদিন ভাস্বর হইয়া থাকিবে।

বিজ্ঞানের অধ্যাপকের চেয়ে বৈজ্ঞানিক, দর্শনের শিক্ষকের চেয়ে দার্শনিক ও ইতিহাসের ব্যাখ্যাতার চেয়ে ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক যে বড়, এ দেশের বিদ্বৎসমাজ একথা স্বীকার করিলেও সাহিত্যের অধ্যাপকের চেয়ে যে সাহিত্য-স্রষ্টা ঢের বড় এ কথা স্বীকার করে না। এই কথা স্বীকার করাইতে হইলে সাহিত্যস্রষ্টাকে মরিতে হয়—বাঁচিয়া থাকিয়া তাঁহার নমস্য বা বরেণ্য হইবার উপায় নাই। আজ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, যিনি খঞ্জ নহেন, অন্ধ নহেন, জরাজীর্ণ নহেন, হাসপাতালে শয্যাগত নহেন এমন একজন সুস্থ সবল জীবন্ত জলন্ত সাহিত্যিককে মর্যাদা দান করিয়া অসম্ভব সম্ভব করিল।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শরৎচন্দ্রকে এই মর্যাদা দান করিয়া নিজের মর্যাদাই বহু গুণে বৃদ্ধি করিল। শরৎচন্দ্রের গৌরবদ্যুতি নূতন করিয়া কি বাড়িবে জানি না। শরৎচন্দ্রের নামের সহিত যুক্ত হইয়া উপাধিই গৌরবান্বিত হইল বলিয়া মনে করি।

আজিকার এই উদ্যান-সম্মিলনে আমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও আমাদের পরম ভক্তিভাজন শরৎচন্দ্রকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি।

আমরা কোন ঘটা সমারোহের ব্যবস্থা করি নাই—আমরা কোন মামুলি বচনবিলাসের আড়ম্বর করি নাই, আমরা সভাপতি ভাড়া করিয়া আনি নাই—আমরা অভিনন্দনপত্র রচনা করি নাই—আমরা ফুলের মালা পর্যন্ত পরাই নাই—আমরা আমাদের প্রাণের দাদাকে আমাদের অন্তরের আনন্দটুকু জানাইতেছি। রসস্রষ্টা হইতে পারা বহু জন্মের সাধনার ফল,—রসস্রষ্টা হইতে না পারি যেন রসের পরিপূর্ণ মর্ম উপলব্ধি করিয়া 'রসচক্র' নাম সার্থক করিতে পারি এই আশীর্বাদ তাঁহার কাছে চাই।"

ছয়

বাংলাসমাজের চিত্রকর

শরৎচন্দ্র বিনয়ের ভানে সভাসমিতি, বৈঠক মজলিসে প্রায়ই বলতেন—"আমি মুক্খুসুক্খু পাড়াগেঁয়ে লোক। আমার বিদ্যেবুদ্ধি কিছুই নেই। বাল্যকাল থেকে একটু লেখার অভ্যেস করেছিলাম—তাই ক'রে খাচ্ছি।"

একথা শুনে শুনে অনেকের ধারণা হয়ে গিয়েছিল যে, সত্যই শরৎচন্দ্রের বুঝি বিদ্যাবুদ্ধি কিছুই ছিল না।

একদিন শরৎচন্দ্র কথায় কথায় বললেন—'ওহে লোকে মনে করে আমি বুঝি একটা মূর্খ, লেখাপড়া কিছুই জানি না।"

আমি উত্তর করলাম—"এ জন্য আপনি নিজেই কতকটা দায়ী।"

শরৎচন্দ্র বললেন—"আচ্ছা মুখে না হয় আমি বিদ্যের পরিচয় দিতে পারি না, কিন্তু আমার লেখাগুলো পড়লে কি মনে হয়, বলত।"

আমি উত্তর করলাম—"মনে হয় মানবচরিত্র সম্বন্ধে এই গভীর জ্ঞান অতি অল্প লোকেরই আছে। আপনার বেদান্ত পড়া আছে কিনা, আপনার Political Philosophy study করা আছে কিনা—সে পরিচয় পাওয়া যায় না। লোকে যদি আপনাকে অশিক্ষিতই মনে করে, করুক না,—তাতে আপনার গৌরব ও কৃতিত্ব বাড়ছে বই কমছে না, আপনি যা দিয়েছেন তা তো বই পড়ে নয়। আপনি যে এই দুনিয়ায় কোন গ্রন্থকার বা পণ্ডিতের কাছে ঋণী ন'ন—সবই যে আপনার নিজের প্রতিভার সৃষ্টি, এর চেয়ে গৌরবের কথা কি আছে ?"

শরৎচন্দ্র বললেন—"শুধু বিদ্যাবুদ্ধির সম্বন্ধে সন্দেহ নয়, এই দেখ না একজন লিখেছে—'শরৎচন্দ্র অভিজাত সম্প্রদায়ের সঙ্গে মেশেননি কখনো, তাদের কথা রবীন্দ্র-সাহিত্যের মত তাঁর সাহিত্যে নেই।' আরে বাপু, তুই জানলি কি ক'রে আমি কার সঙ্গে মিশেছি ? এসব কি সাহিত্য সমালোচনা ? তুই যাদের কথা বলছিস্ বাপু, তাদের সঙ্গে মিশে যদি তাদের প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করতে না পেরে থাকি তবু কি সাহিত্যে তাদের স্থান দিতে হবে ?"

আমি বললাম—"দাদা, এতে তো অগৌরবের কিছুই দেখছি না। আপনি বাঙ্গালী জাতির প্রধান সাহিত্যিক। রবীন্দ্রনাথকে বিশ্বের সাহিত্যিক ধরলে আপনাকেই বাংলার বর্তমান যুগের সর্বপ্রধান সাহিত্যিক বলতে হয়। আপনি

বাংলার মাটির খাঁটি মালিকদের সঙ্গে, খাঁটি বাঙ্গালীদের সঙ্গে জীবন কাটিয়েছেন। যাদের উপর আপনার কোন শ্রদ্ধা নেই—তাদের এড়িয়ে চলেছেন। এতো ভাল কথা। তাদের সঙ্গে মিশতে গেলে তো মোসাহেব হয়ে মিশতে হ'ত। ও কথা বলে লেখক অজ্ঞাতসারে আপনাকে মর্যাদাই দিয়েছেন।"

শরৎচন্দ্র উত্তরে বললেন—"তুমি তো বেশ একটা interpretation দিলে। কথাটা তো ও-ভাবের নয়।"

শেষ বয়সের দিকে এই সকল মন্তব্যে তিনি একটু ক্ষুণ্ণই হতেন। তাঁর সাহিত্যই সাক্ষ্য দেয়, তথাকথিত অভিজাত সম্প্রদায়ের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ছিল না—তাদের কথা নিয়ে তিনি যে একেবারে সাহিত্যরচনা করেন নি তা নয়—তবে সে সাহিত্য তেমন জমে নি। তা তাঁর হৃদয়ের রঙে রঙীন হয়ে ওঠেনি—তাঁর অন্তরের দরদ পেয়ে তা জীবন্ত হয়ে ওঠেনি। ধনের আভিজাত্য, বিদ্যার আভিজাত্য, রক্তের আভিজাত্য, বর্ণের আভিজাত্য,—কোনটার প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ছিল না—সাহিত্যেও না—জীবনেও না। কোন কোন সম্প্রদায়ের প্রতি তাঁর যে রীতিমত বিদ্বেষভাব ছিল ব'লে লোকে রটায়, তা নিতান্ত অমূলক নয়। তার মূল এই অশ্রদ্ধায়।

ভণ্ডামি, কপটতা, নিষ্ঠুরতা ও ভোগসর্বস্বতাকে তিনি ঘৃণাই করতেন। এগুলো যে সম্প্রদায়ের লোকের মধ্যে বেশি—সে সম্প্রদায়কে তিনি কোনদিন সহ্য করেন নি। 'দত্তা'র রাসবিহারীর মত চরিত্র এই অশ্রদ্ধারই সৃষ্টি।

'বাঙ্গালীর দেশভক্তি' নামে একটা প্রবন্ধে আমি দেখিয়েছিলাম—শরৎচন্দ্রের আগের সাহিত্যিকদের চোখে বাঙলা দেশ ছিল 'স্বপ্ন দিয়ে তৈরী, স্মৃতি দিয়ে ঘেরা।' সে বাঙালীর প্রতুলতা ও ঐশ্বর্যের অন্ত নেই। শরৎচন্দ্রই আমাদের বাংলাদেশের সত্য রূপই ফুটিয়েছেন—গভীরতম দরদের সঙ্গে। বাংলাদেশ যে দরিদ্র এবং আগেও দরিদ্র ছিল—সে কথা অস্বীকার ক'রে বা গোপন ক'রে দেশভক্তির প্রচার তিনি করেন নি। এ প্রবন্ধটা একদিন তাঁকে আমি শুনিয়েছিলাম। শরৎচন্দ্র সেদিন বলেছিলেন—"দারিদ্র্য? কি যে নিদারুণ দারিদ্র্যের চিত্র বাল্যকালে আমি দেখেছি—তা তোমরা কল্পনাও করতে পার না। বাল্যকালে দেখা বাংলার পল্লীর দারিদ্র্য থেকে অনুমান করে নিয়েছি—বাংলাদেশ কোনদিন সোনার বাঙলা ছিল না। দু-মুঠা ভাত দু'বেলা পেলেই দারিদ্র্য ঘুচে না। কাপড় কি দুর্লভ বস্তু ছিল পল্লীবাসী বাঙালীর কাছে, তা তোমরা ভাবতেই পার না! একখানা নূতন কাপড় পরলে গুরুজনদের প্রণাম

করতে করতে কপালে ঘা হয়ে যেত। পাঁজিতে নববস্ত্র পরিধানের শুভদিন দেওয়া থাকত। শুভদিনে কাপড় পরলে কাপড় সহজে ছিঁড়বে না—হারাবে না। গাঁয়ে ভদ্রলোকদের গায়েও জামা দেখিনি। পায়ে জুতা দেখি নি। পূজোর উৎসবের প্রধান অঙ্গ নতুন কাপড় পাওয়া। গাঁয়ের ভদ্রলোকেরাও মাদুরে শুতো ময়লা তেলা বালিশ মাথায় দিয়ে। অবস্থাপন্ন লোক ছাড়া কারো বাড়ীতে একটা তক্তাপোশও ছিল না। জমিদার আর দু-একজন বড় চাকরে ছাড়া কারো কোঠাবাড়ী ছিল না। মেয়েরা জীর্ণ মলিন সেলাই করা কাপড় পরেই গৃহের কাজ করত। ধোপার বাড়ী কাপড় ধুতে দেওয়ার প্রথাই ছিল না। সাজি মাটি দিয়ে কাপড় কেচে নিত। আমরাও শীতকালে দোলাই গায়ে দিয়েছি। রাত্রে কাঁথা গায়ে দিয়ে ঘুমিয়েছি। লেপ কেবল ধনী লোকেরাই ব্যবহার করত। ভদ্রলোকদের ঘরে একটা পেটরা কিংবা কাঠের বাক্স থাকত। অনেক ভাল জিনিসও থাকত—হাঁড়ির ভেতর। মাটির হাঁড়িতে রান্না হত। পিতল কাঁসার বাসনই ছিল সবচেয়ে দামী সম্পত্তি, সেগুলো যাতে চোরে না নেয় সে দিকেই ছিল গৃহস্থদের সজাগ দৃষ্টি।

নিম্নশ্রেণীর লোকদের কুঁড়ে-ঘরে কপাট ছিল না, ছিল আগড়। তারা ঘরে মাটীর প্রদীপ আধ-ঘণ্টা কাল জ্বালত। দু'বেলা রান্নার বালাই অধিকাংশ লোকেরই ছিল না। একবেলা রেঁধে দুবেলা খেত।

অনেকে গামছা পরে কাপড়খানা শুকিয়ে নিত। গরীবদের রঙীন গামছা ছিল বিলাসভূষণ। গরীবদের চালা-ঘরে বর্ষাকালে জল পড়ত। বর্ষাকালে অনেকের ঘরে দেখেছি মেঝের স্থানে স্থানে ছাই ভরা সরা, তার উপর চালের ফুটো দিয়ে টপটপ করে জল পড়ছে। সেই জল ছাই-এ শুষে নিচ্ছে। আর কি বলব, একটা সিকি কি দুয়ানীর জন্যও পথে ঠেঙাড়েরা মানুষ ঠেঙিয়ে মারত! গাঁয়ে কোন কাজ হলে ভোজন-লোলুপদের কি উল্লাস তার চিত্র তো পল্লী-সমাজেই পেয়েছ? ওতে যে বর্ণনা আছে তার একটুও অতিরঞ্জন নয়—বর্ণে বর্ণে সত্য।

প্রাচীনকালে দুর্দশা আরো বেশী ছিল। দেশের দারিদ্র্য যে ঘুচেছে তা তোমরা হয়ত বুঝবে না। আমি আজো পল্লীবাসী, শহরে দুদিন বাড়ী করেছি, পল্লীর সঙ্গে সম্পর্ক ঘোচে নি। এখনো পল্লীতে যাই—থাকি। এখন দেখতে পাই আকাশ-পাতাল তফাৎ রয়েছে। দারিদ্র্য এখনও আছে, কিন্তু যে নিদারুণ দারিদ্র্য আমি বাল্যকালে দেখেছি এখন আর তা নেই। দেখে আমার মত আনন্দ আর কারো হবে না। জমিদার মহাজন ও ব্রাহ্মণের অত্যাচার অনেক

কমেছে। গফুরকে আজ গোরু মেরে গাঁ থেকে কাঁদতে কাঁদতে বিদায় নিতে হয় না, অভাগীর চিতার জন্য কাঠ জুটে।

তবু বলতে হয়, এ দারিদ্র্যই বা থাকবে কেন? জগতে মানুষ কোথাও এত দরিদ্র নেই। আজকে আমরা সমগ্র জগতের খবর জানি। সমগ্র জগতের তুলনায় একটা সভ্য জাতির শাসনে যতটা দারিদ্র্য ঘোচা উচিত ছিল—ততটা ঘোচে নি।"

সাত

সাহিত্যে প্রশ্ন ও তার উত্তর

শরৎচন্দ্র একদিন বললেন—"দেখ, লোকে বলে আমি যত সমস্যা তুলেছি আমার রচনায় তার সমাধান দিইনি।"

আমি বললাম—"যারা একথা বলে তারা একটু মন দিয়ে পড়লেই বুঝতে পারত ; সমাধান আপনি দেননি বটে কিন্তু সমাধানের ইঙ্গিত দিয়েছেন—কোন্ পথে এর সমাধান তা আপনি আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন। যেমন পল্লী-সমাজে ও পণ্ডিতমশাইয়ে।"

শরৎচন্দ্র বললেন—"হাঁ, কিন্তু সমাধানের ঐ ইঙ্গিত না দিলেই ভালো হত। আমার কাজ তো সমস্যার সমাধান নয়। এমন কি আমার কাজ শুধু query, তার জবাবও আমার দেওয়ার কথা নয়। আমি যদি প্রবন্ধ লিখতাম তবে সে দায়িত্ব আমার থাকত। আমি লিখি গল্প। আমার চারিপাশে যা ঘটছে, আমি আমাদের সামাজিক জীবনে যা ঘটতে দেখেছি তাই বলে যাই—তাতে যদি সমস্যাই জেগে ওঠে, সমাজ তার সমাধান করুক। লোকের যা চোখে পড়েনি তা আমি চোখের সম্মুখে ধরে দি। ব্যাস, এতেই আমার কর্তব্য শেষ।"

আমি বললাম—"সমস্যার সমাধান বা প্রশ্নের উত্তর আপনি দেন নি, কিন্তু মতামত আপনি ব্যক্ত করেছেন স্থানে স্থানে—কখনও নিজেরই জবানিতে—কখনও যে চরিত্রটি আপনার মর্মের অংশ দিয়ে গড়া সেই চরিত্রটির মুখে। যে চরিত্র আপনার হৃদয়ে প্রতিবিম্বিত হয়েছে তার মুখের কথা আপনারই মুখের কথা মনে করে নেওয়া একেবারে অনিবার্য। 'পণ্ডিতমশাই'-এর বৃন্দাবন যা বলছে তা আপনার প্রাণের কথা নয়—একথা কি বলতে পারেন? 'পল্লীসমাজের' জ্যাঠাইমার মুখের কথা কোন বর্ষীয়সী পল্লীরমণীর মুখের কথা নয়, আপনারই মুখের কথা। এ সব কথাতেই আমাদের জাতীয় সমস্যার সমাধানের ইঙ্গিত আছে। 'বিষবৃক্ষে' রূপজ মোহ ও প্রেম নিয়ে বঙ্কিমবাবু যেমন বিচার-বিশ্লেষণ করেছেন—রবীন্দ্রনাথ 'দুই বোনে' যে দুই শ্রেণীর নারী নিয়ে আলোচনা করে একটা মাঝামাঝি মীমাংসার ইঙ্গিত দিয়েছেন, এই শ্রেণীর Discourse অবশ্য আপনার লেখায় নেই, কিন্তু মতামত আপনিও ব্যক্ত করেছেন। তাতে দোষ কিছু নেই। ঐটুকু মতামত প্রকাশ না করলে Art সম্পূর্ণাঙ্গ হ'ত না।"

শরৎচন্দ্র বললেন—"তবে 'শেষ প্রশ্নটা' কিন্তু আমার আগাগোড়া প্রশ্নই, জবাব ওতে নেই। কিন্তু সমালোচকরা ওতে আমার নিজের মতামত খুঁজেছে। আমি নিজের মতামত প্রকাশের জন্য common চরিত্রের অবতারণা করিনি। আমার মনের চরম প্রশ্নগুলো ওর কথায় ওর আচরণে বসিয়েছি। যে সব প্রশ্ন সমাজের সাধারণ মানুষের মনে জাগে না—সে সব প্রশ্নের জন্যই ঐ অসাধারণ চরিত্রটার অবতারণা। অপ্রত্যাশিত ও অস্বাভাবিক ক্ষেত্র ও আবহাওয়া থেকে ঐ অসাধারণ নারীটির আমদানী করতে হয়েছে। এর জন্য আমাকে অনেক গালই খেতে হয়েছে।"

আমি বললাম—"তা হয়েছে। সে সব কথা আপনাকে জানাইনি। শাহ্‌নগর ইনষ্টিটিউটে একটা সভা হয়—তার আলোচ্য বিষয়ই ছিল 'শেষ প্রশ্ন'। তাতে সভাপতি ছিলেন জয়গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় এবং প্রধান বক্তা ছিলেন ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত। আরও অনেক অধ্যাপক ও সাহিত্যিক সে সভায় ছিলেন। অধ্যাপকরা বললেন—বইখানা Art হিসাবে failure. এতে কেবল কতকগুলো সমস্যা নিয়ে বাদানুবাদ মাত্র আছে। সে বাদানুবাদও তেমন Logical নয়। শরৎচন্দ্র আর্টিষ্ট—তাঁর এসব অনধিকার চর্চা।"

শরৎচন্দ্র—তাতে তোমরা কোন প্রতিবাদ করলে না?

আমি—হাঁ, আমাদের পক্ষ থেকে প্রতিবাদ করলেন কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত। ঠিক মনে নেই কি একটা অমর্যাদাসূচক কথা একজন ব্যবহার করেছিলেন—সম্ভবতঃ আপনার বিদ্যাবুদ্ধি সম্বন্ধে।

শরৎচন্দ্র—বল কি? যতীন প্রতিবাদ করলে! যতীন তো আমার উপর প্রসন্ন নয়।

আমি—আপনি কি করে জানলেন যে আপনার উপর সে প্রসন্ন নয়। সে তো আপনার পরম ভক্ত। সে-ই তো সে সভায় আমাদের মান রেখেছিল। সে ছাড়া সে সভায় আপনার পক্ষে কেউ ছিল না।

শরৎচন্দ্র—আমার টাউন হলে অভিনন্দন বন্ধ করার জন্য খবরের কাগজে পাঁচজন যে চিঠি লিখেছিল, তার মধ্যে সে ছিল?

আমি—হাঁ, তার সঙ্গে আমিও তো সই করেছিলাম। সে তো অভিনন্দন বন্ধ করার জন্য নয়, অভিনন্দন মুলতুবী রাখবার জন্য। মহাত্মা গান্ধী তখন উপবাস করছিলেন—তাঁর জীবন সম্পর্কে তখন দেশের লোক বড়ই আতঙ্কিত। সে সময়ে অভিনন্দন স্থগিত রাখবার জন্য আমরা খবরের কাগজে চিঠি দিয়েছিলাম। সেটা কোন দোষের হয়েছিল বলে মনে করি না।

শরৎচন্দ্র—অভিনন্দনের আয়োজন যখন ক'রে ফেলেছে তখন বাধা দেওয়া তোমাদের ঠিক হয়নি। ওটাকে তোমরা পণ্ড করলে তো।

আমি—পণ্ড আমরা করিনি, দাদা। আপনি ভুলে যাচ্ছেন—সে দিন 'হিজলী দিবস' ছিল। আপনার পরম ভক্তরাই 'হিজলী দিবস' বলে আপনার গাড়ী আটকেছিল। আমাদের চিঠির ফলে কোন কোন সাহিত্যিক হয়ত উপস্থিত হয়নি, এর বেশী নয়। তা ছাড়া অভিনন্দনের আয়োজন এমন ধরনের নয় যে মুলতুবী রাখলে কোন ক্ষতি হয়। ভোজ হলে ক্ষতি হতে পারে। আমরা যখন মুলতুবী রাখতে চিঠি দিয়েছি তখন ফুলও কেনা হয়নি। একমাত্র চিঠিপত্র আবার ছাপাতে হ'ত।

শরৎচন্দ্র—মোটকথা বাঙ্গালী যত বড়ই হোক তোমরা তাকে ছোট করতে চাও—আর অবাঙ্গালীকেই বেশি আদর শ্রদ্ধা কর।

আমি—এটা দাদা ভুল বুঝছেন। এখানে অ-বাঙ্গালী যে সে নন! সমগ্র ভারতবর্ষের পরিত্রাতা জাতীয় মহাগুরু মহাত্মা গান্ধী। বাংলাদেশ ভারতেরই একটা অংশ—কাজেই মহাত্মার জীবন সংশয় সময়ে কোন প্রকার উৎসব-আমোদ শুধু অপ্রীতিকর নয়, রীতিমত unseemly মনে হয়েছে। অবাঙ্গালী কোন মনীষী বা মহাপুরুষকে শ্রদ্ধা করলেই বাঙ্গালী মনীষী ও জননেতা বা সাহিত্যরথীকে ছোট করা হল এটা অন্যে মনে করতে পারে, আপনার মনে করা উচিত নয়। আপনি আমাদের ঘরের লোক, আপনার অভিনন্দন নিত্যই বাংলার ঘরে ঘরে হচ্ছে। বছর বছরই আপনার অভিনন্দন আমরা দেব—সেবার ওটা কয়েকদিন পরে দেওয়া হোক, এই প্রস্তাব ছাড়া সে চিঠিতে অন্য কিছুই ছিল না।

শরৎচন্দ্র—অথচ তোমরা সেই দিনই গেলে চেতলায় চণ্ডীদাস 'স্মৃতিসভা' করতে। জীবিত সাহিত্যিক থাকল পড়ে—পাঁচশ বছর আগে যে সাহিত্যিক গেছেন ম'রে তোমরা গেলে তাঁরই স্মৃতিপূজা করতে। অথচ এই চণ্ডীদাস যে কে, কেউ ছিল কি না ছিল তারই ঠিক হ'ল না আজো।

আমি—এটা আপনাকে কোন দুর্জন বুঝিয়েছে। ঐরূপ একটা সভার আমন্ত্রণ আমরা পেয়েছিলাম—আমন্ত্রণপত্রে আমাদের সম্মতি না নিয়েই বক্তা হিসাবে আমাদের নাম ছেপেছিল—সভা জমাবার জন্য। এ দুষ্কর্ম আমাদের দেশের ভুঁইফোঁড় সাহিত্যসভাগুলো প্রায়ই করে থাকে। আমরা কেউই সে সভায় যাইনি। কেউ আপনাকে আমন্ত্রণপত্রখানি দেখিয়ে বুঝিয়েছে—আমরা আপনার অভিনন্দন সভায় যোগ দিলাম না—কিন্তু মহাত্মা গান্ধীর উপবাস কালে অন্য

সাহিত্যসভা করতে গিয়েছি। মহাত্মার উপবাস অজুহাতমাত্র। আসলে আপনাকে অভিনন্দন দেওয়ার পক্ষপাতী আমরা নই, বরং বিরোধী—এই কথা সে বুঝিয়েছিল আপনাকে।

শরৎচন্দ্র—তাই নাকি। যাক যতীন তা হলে আমার উপর বিরূপ নয়। একটা ভ্রান্ত ধারণা দূর হল। বেশ এখন যে কথা হচ্ছিল। বাদানুবাদ থাকলে সাহিত্য হয় না, তবে রবীন্দ্রনাথের 'গোরা', 'ঘরে বাইরে' এসব বই সাহিত্য নয়?

আমি—না, এরা বলে বাদানুবাদে ভরিয়ে দিলে Art হয় না, তবে এক প্রকারের সাহিত্য হয়—সে সাহিত্য সমস্যামূলক।

শরৎচন্দ্র—'শেষপ্রশ্ন' সে-সাহিত্যও হয়নি পণ্ডিতমশাইদের এটাই কি রায়?

আমি—বিশ্বপতি বলেছে, গোরা, ঘরে বাইরে ইত্যাদি উপন্যাসে যেখানে বাদানুবাদ চলছে সেখানে উভয় পক্ষের কথা কবি নিঃশেষে বলেছেন। উভয় পক্ষকে সমান সবলই করেছেন। কবি কোন পক্ষ নেননি। যখন একপক্ষের কথা হচ্ছে কবি তখন তার মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছেন—তাঁর বক্তব্যে যা কিছু যুক্তি আছে সবই নিঃশেষে বলেছেন—আবার অন্য পক্ষ যখন তার জবাব দিয়েছে—তখন কবিতার মধ্য দিয়ে যুক্তিখণ্ডন ও আত্মসমর্থন করতে আরম্ভ করেছেন, তখন মনে হয়েছে এই তো চরম কথা। পরে অন্য পক্ষ যখন জবাব দিতে আরম্ভ করেছে তখন মনে হয়েছে এর বুঝি আর জবাব চলে না? এইভাবে সমস্যাটার বাদানুবাদের ফলে পরিপূর্ণ বিশ্লেষণ হয়েছে। এই বিশ্লেষণের ফল সমাধানের দিকেও আগিয়ে নিয়ে চলেছে। এ এক প্রকারের উচ্চ শ্রেণীর সাহিত্য। আর আপনি 'শেষ প্রশ্নে' নিজেকে একজনের সঙ্গেই identified করেছেন। যার সঙ্গে identified হয়েছেন তার কথাগুলো খুবই জোরালো সন্দেহ নেই—কিন্তু যাদের সঙ্গে সে বাদানুবাদ করছে তারা উচ্চশিক্ষিত লোক হলেও তাদের মুখে একটি যথাযথ জবাব জুটছে না—তারা যেন কেবল শ্রোতামাত্র। যদি-বা তারা জবাব কখনও কখনও দিচ্ছে তাতে সমস্যার দ্বিতীয় পক্ষটা উদঘাটিত হচ্ছে না—তাদের ক্ষীণ কণ্ঠের উত্তর প্রধান বক্তার কথাগুলোকেই আরও জোরালো করছে। এই একতরফা বক্তৃতায় সমস্যামূলক সাহিত্যও হচ্ছে না।

শরৎচন্দ্র—আমি লিখছি উপন্যাস, সমস্যামূলক সাহিত্য তো লিখি নি, কাজেই এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের অনুকরণ করিনি। আমার এই পদ্ধতিতে সমস্যার সর্বাঙ্গীণ বিশ্লেষণ হয়নি, কিন্তু চরিত্র ফুটেছে। রবীন্দ্রনাথ সমস্যামূলক সাহিত্যই যদি লিখতে গেলেন তখন উপন্যাসের রূপ দিতে গেলেন কেন? আমি একটা চরিত্রের সঙ্গে identified হয়েছি বলছ, বাকি চরিত্রগুলোর তো ব্যক্তিগত

স্বাতন্ত্র্য আছে। আর রবীন্দ্রনাথ আছেন প্রত্যেক চরিত্রটার মধ্যেই। এক্ষেত্রে উপন্যাসের রূপ না দিলেই পারতেন।

আমি—রবীন্দ্রনাথ যৌবনে এ শ্রেণীর সাহিত্যকে উপন্যাসের রূপ দেননি। তাঁর 'পঞ্চভূত' এ-শ্রেণীর সাহিত্যের চরমোৎকর্ষ। তাতে পাত্রপাত্রীর অবতারণা করে বাদানুবাদ করেছেন, কিন্তু তাকে উপন্যাসের রূপ দেন নি। পরে বোধহয় তিনি ভাবলেন এর মধ্যে জীবনসঞ্চারের প্রয়োজন, নতুবা সরস হচ্ছে না।

শরৎচন্দ্র—কিন্তু উপন্যাসগুলোর জীবনসত্তার কি হয়েছে ?

আমি—'গোরা'র যে জীবন সঞ্চার হয়েছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। 'ঘরে বাইরে' এবং অন্যান্য দু' তিনখানা উপন্যাসের জীবনীশক্তির অভাব আছে। আর 'শেষের কবিতা'কে আমরা উপন্যাসই বলি না। নামও শেষের কবিতা—ও-টা গদ্যকাব্য। যেখানে গদ্যে কুলোয়নি—সেখানে কবি পুরো কবিতারই আশ্রয় নিয়েছেন। এটা সমস্যামূলক সাহিত্য নয়—একজন আর্টিস্টের জীবনের বাঙ্ময় বিশ্লেষণ বলা যেতে পারে।

* * * *

একদিন একটা বিজ্ঞাপনের উপর চোখ পড়তেই বললেন—"ওহে তোমরা সব কি ? সাহিত্য ফৌজদার, সাহিত্য-সুবাদার, সাহিত্য-কোতোয়াল, সাহিত্য-মনসবদার এই রকম কি তোমাদের খেতাব ?"

আমি—আপনি যদি হ'ন সাহিত্যরথী, আর হরিদাসবাবু যদি হ'ন সাহিত্য-সারথি—তাহলে আমরা সবাই সাহিত্য পদাতিক।

শরৎচন্দ্র—আরে তুমি তো সাহিত্যের রণক্ষেত্রে চলে গেলে। সাহিত্যরাজ্যের কথাই বল। এই দেখ না রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যসম্রাট, অনুরূপা দেবী উপন্যাস সম্রাজ্ঞী, দক্ষিণারঞ্জন শিশুসাহিত্যসম্রাট। আরে পৃথিবীতে কোথাও সম্রাট নেই—এই গণতন্ত্রের যুগে তোমাদের সাহিত্যরাজ্যে সম্রাটের ছড়াছড়ি। লেখক-লেখিকাদের পরিচয় দেওয়ার জন্য আর কোন বিশ্লেষণ পাওয়া যায় না ? এসব বড় Bad Taste—আমার ঘাড়ে যেন কোন রাজ্যভার চাপিও না। আমি গরীব ব্রাহ্মণ, দু'কলম লিখে দিন গুজরান করি—আমার দ্বারা বাপু কোন রাজ্যভার বহন বা রাজকার্য সাধন চলবে না।

আমি—কেন আপনার উপনাম হয়েছে অপরাজেয় কথাশিল্পী।

শরৎচন্দ্র—এই বিশেষণটা দেখলে আমার গা জ্বলে যায়। সাহিত্যক্ষেত্রটা যেন রণক্ষেত্র। এখানে কেবল লড়াই হয়, জয় পরাজয়ের দ্বারা লড়াই-এর বিচার হয়। আমি বাপু লিখে যাই, কারো সঙ্গে লড়াই বিবাদ করি না।

আমি লড়াই করলাম কবে এবং জয়লাভ করলাম কবে? কথাশিল্পের যুদ্ধে আমাকে কেউ পরাজয় করতে পারেনি এই তো অর্থ।

আমি—ঠিক তা না, হলে হ'ত অপরাজিত কথাশিল্পী। অপরাজেয় বলতে বোঝাচ্ছে কেউ পরাজয় করতে পারেনি, কেউ পারবেও না।

শরৎচন্দ্র—আরে বাপু তুই জানলি কি করে কেউ আমাকে পরাজয় করতে পারবে কি না।

আমি—না দাদা, এ এক প্রকারের আশীর্বাদ বা শুভবাসনা। বলা হচ্ছে কেউ যেন তোমাকে পরাজিত করতে না পারে।

শরৎচন্দ্র—দেখ দেখি খুঁজে খুঁজে বিশেষণ বার করেছে একি! আর আশ্চর্য দেখেছ একজন কেউ একটা বিশেষণ লাগালেই হল, অমনি নির্বিচারে সবাই সেই বিশেষণ চালাতে লাগল। নূতন একটা বিশেষণ দেওয়ার সামর্থ্য নেই। তবু যদি বুঝতাম রবীন্দ্রনাথ একটা বিশেষণ দিয়েছেন—দেশের লোক তারই অনুসরণ করছে, তা হলে বুঝতাম এর দাম আছে। হয়ত বসুমতীর সতীশই প্রথম ঐ বিশেষণটা লাগিয়েছে—আর দেশসুদ্ধ লোক সতীশেরই অনুসরণ করছে। তাও যদি কথাটা বেশ যুতসই হ'তো।

আমি—'অপ্রতিরথ' কথাটা more respectable.

শরৎচন্দ্র—আবার সেই রণক্ষেত্রেই গেলে?

আমি—সাহিত্যরথী কথাটা চলে গেছে। রথীর লক্ষ্যার্থে প্রয়োগ বুঝতে কারো কষ্ট হয় না। তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখতে হলে অপ্রতিরথই বলতে হয়।

শরৎচন্দ্র—কিছুই না বলা most respectable.

আমি—তবুও আপনাকে কেউ বঙ্গসাহিত্যের ব্যালজাক, কি ইবসেন, কি টমাস হার্ডি বলেনি। মাইকেল ছিলেন মিলটন, নবীন সেন ছিলেন বাইরন, বঙ্কিম ছিলেন স্কট, আর রবীন্দ্রনাথ ছিলেন শেলি।

শরৎচন্দ্র—বোধহয় মোপাঁসাতেই ঐ নামকরণ শেষ হয়েছে—প্রভাত মুখুজ্যে ছিলেন বঙ্গসাহিত্যের মোপাঁসা।

আমি—না বার্নার্ড শ-এ শেষ হয়েছে আপাততঃ।

শরৎচন্দ্র—সে আবার কে?

আমি—কেন? প্রমথনাথ বিশী বঙ্গসাহিত্যের বার্নার্ড শ।

আট

স্বদেশপ্রীতি

কথা হচ্ছিল সভাপতিত্ব নিয়ে। শরৎচন্দ্র বললেন—"ওহে অমুক এত সভা করে বেড়ায় কি করে? মিছামিছি এত পরিশ্রম করে বেড়াবার দরকার কি? সভায় দিনের পর দিন কি বলে?"

আমি বললাম—"আমাদের পূজাপার্বণে যেমন পুরুত লাগে—সভায় তেমনি একজন পুরুতের দরকার। রজনীকান্ত লিখেছেন—'বাড়ী বাড়ী দুটো ফুল ফেলে দিয়ে দুশো কালীপূজো করি।' এদের সভা করাও তেমনি আর কি?"

শরৎচন্দ্র বললেন—"আরে তাতে তো চাল কলা নৈবিদ্যিও পায়—দুচার আনা দক্ষিণেও পায়! এতে পায় কি? একটা ফুলের মালা ছাড়া আর কি পায়?"

আমি বললাম—"যার যাতে লোভ। এরা চায় আত্মপ্রচার, সভাপতির আসনে বসে কিংবা বক্তৃতা ক'রে আত্মপ্রসাদ লাভ করে। আর হাততালি।"

শরৎচন্দ্র বললেন—"হাততালি পেতে হলে তো খুব ভাল বক্তৃতা করতে হয়। বক্তৃতা বুঝি খুব ভাল করে?"

আমি বললাম—"সভায় কি আর ভাল বক্তৃতা করতে হয়? না—সবাই বিপিনচন্দ্র পালের মত বক্তৃতা করতে পারে? মামুলী কথাই বলে। আর হাততালি তো যে যাই বলুক তার পর দেওয়াই মামুলী প্রথা। তাকে সাধুবাদ বলে না। আপনি তো সভাপতি হতেই চান না।"

শরৎচন্দ্র বললেন—"শুধু সভাপতি কেন, সভায় যেতেও চাই না। গেলেই কিছু বলতে হয়—আর সভাপতি যার হবার কথা সে তো প্রায়ই আসে না। কাজেই সভাপতিও হ'তে হয়। অর্থাৎ যিনি নির্বাচিত সভাপতি তাঁর গাড়ু গামছা বইতে হয়।"

আমি বললাম—"দেশে আপনার যে প্রতিষ্ঠা তাতে তো সভাপতিত্ব এড়ালে চলবে না। দেশের সর্বপ্রধান সাহিত্যিকদের এ ঝঞ্ঝাট পোহাতেই হবে।"

শরৎচন্দ্র বললেন—"দেখ মামুলী দুটো কথা যে বলতে পারি না, তা নয়। কিন্তু তা ব'লে হাততালি নিতে আমার ঘৃণা হয়। যদি বেশ নূতন ধরনের দু'কথা চমৎকার করে না বললাম—তবে সভাপতির মানই বা থাকে কি করে? তা করতে গেলে—একটু বাড়ী থেকে ভেবে যেতে হয়—পরিশ্রম করতে হয়।

সে পরিশ্রম করা বৃথা মনে হয়। বাড়ীতে প্রবন্ধ লিখে নিয়ে গিয়েও পড়া যায়—কিন্তু সেটাও ভস্মে ঘি ঢালা। সে প্রবন্ধ আর কোন কাজে লাগে না। তার চেয়ে উপন্যাসের একটা পরিচ্ছেদ লেখা ভালো। সেটা কাজে লাগে। তার একটা স্থায়ী মূল্য আছে। তাছাড়া দেখ আমি হয়ত একটা উপন্যাস লিখছি—সেটা নিয়েই কদিন থেকে চিন্তা করছি—তার মধ্যে একটা সভার বিপর্যয় এসে পড়লে সব খি-হারা হয়ে যায়। তুমি তো জান, আমার এমন বাগ্মিতা নেই যে গলার জোরেই মাত করে দিয়ে আসব। এজন্য যে ফিজিক্যাল ফিগারের দরকার তাও আমার নেই।"

আমি বললাম—"দাদা, আপনার উপস্থিতিই সভার একটা শোভা। মুখের কথা যেমনই হোক, তাতে কি আসে যায়?"

শরৎচন্দ্র বললেন—"আরে একি সেই দেশ! এখানে সভায় ছেলেছোকরাই থাকে বেশি। তারা বড় গোলমাল করে—গলার জোর না হলে সভা ম্যানেজ করা যায় না। আমার ঠিক ঠাঁই তোমাদের রসচক্র কিংবা রবিবাসর। এখানে দুচার কথা বেশ গুছিয়ে বলতে পারি। আমি তো সাহিত্যসভার জন্য ভাবি না। দুকথা লিখে পড়লেও চলে। এক সময় বাগ্মিতার ভারি দরকার হয়েছিল। যখন অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিলাম—দেশবন্ধু হাওড়া জেলা কংগ্রেস কমিটির সভাপতি করে দিলেন। তখনকার দিনে কংগ্রেসের বাণী অশিক্ষিত অর্ধশিক্ষিত ও জনগণের সভায় বক্তৃতা করে প্রচার করবার প্রয়োজন ছিল খুবই। সে সব সভায় তো আর প্রবন্ধ পড়া চলে না। আমার সহকর্মীরা বলত—'দাদা আপনি বক্তৃতা করা অভ্যাস করুন।' আমি বলতাম—ও আর এ শরীরে সইবে না। বক্তৃতার বারো আনা দৈহিক স্বাস্থ্য ও শক্তির উপর নির্ভর করে। আমার সহকর্মীদের মধ্যে প্রবোধ ছিল খুব কাজের লোক, সেও বক্তৃতা করতে পারত না। তার শরীর ভাল ছিল না। সেজন্য তাকেও আমি বক্তৃতা অভ্যাস করতে দিই নি। আমাদের দলে বক্তৃতার অভাবটা মেটাত মৌড়ীর নারায়ণবাবু। তাঁর বক্তৃতা ছিল খুব মর্মস্পর্শী। প্রবোধকে আমি বড় ভালবাসতাম। বেচারা খেটে খেটে ম'রে গেল। দেশের কাজে সে প্রাণ দিলে বলা যেতে পারে।"

আমি বললাম—"আপনার কাজ কি ছিল তবে?"

শরৎচন্দ্র বললেন—"কংগ্রেসের যে প্রোগ্রাম ছিল তাকেই কাজে পরিণত করা—হাওড়ার কংগ্রেস কমিটির কাজ চালানো, চরকা প্রবর্তন, তাঁতের বস্ত্র প্রচলন, বিলাতী পণ্য বর্জনের জন্য চেষ্টা, অসহযোগ প্রচার। তার উপর দেশবন্ধু ভার দিয়েছিলেন—মেয়েদের জন্য পৃথক প্রতিষ্ঠান গঠন ও পরিচালনার।"

আমি বললাম—"মেয়েদের জন্য পৃথক প্রতিষ্ঠান কেন? ছেলেমেয়েরা তো একসঙ্গেই কংগ্রেসের কাজ করেছে।"

শরৎচন্দ্র বললেন—"না, প্রথম প্রথম পৃথক প্রতিষ্ঠান গঠনই করা হয়েছিল। দেশবন্ধুর ইচ্ছা ছিল যে, ছেলে ও মেয়েদের জন্য পৃথক প্রতিষ্ঠান থাকাই উচিত।"

আমি বললাম—"আপনি কি তাদের একত্রে কাজ করায় দুর্নীতির প্রশ্রয় দেওয়া হবে মনে করেছিলেন?"

শরৎচন্দ্র বললেন—"আমি তা মনে করি নি। বরং আমি মনে করেছিলাম—একসঙ্গে কাজ করার অভ্যাস করুক, তাতে সংকোচ কেটে যাবে। নরনারীর সম্পর্ক সহজ ও স্বাভাবিক হোক। যে সকল নারীকে প্রকাশ্য হাট-বাজারে মেলায় জনতায় শোভাযাত্রায় কাজ করতে হবে, পিকেটিং করতে হবে—তাদের নিজের ভাইদের থেকে দূরে রেখে চললে চলবে কেন? আর একটু আধটু নীতি লঙ্ঘন যদি হয়ই—তাতে মহাভারত অশুদ্ধ হবে না। দেশের জাতীয় সরোবরের জল যদি নির্মল হয়ে ওঠে, আর তা পদ্মফুলে ভ'রে যায়—তবে তার তলে একটু-আধটু পাঁক থাকে থাকুক। মেয়েরা ছেলেদের কাজে বাধা হবে না—বরং শক্তি ও প্রেরণা যোগাবে, এই ছিল আমার ধারণা। তবে আমরা দেশবন্ধুকে গুরুর মত মানতাম—তাই তাঁর আদেশে ভবানীপুরে স্বতন্ত্র নারী কর্ম-মন্দির স্থাপন করা হ'ল। এর ভার দেওয়া হল দেশবন্ধুর ভগিনী উর্মিলা দেবীকে। মহিলা কর্মী সংসদ বলে আর একটা প্রতিষ্ঠান করা হল, তার ভার দেওয়া হল হেমপ্রভা মজুমদারকে। এই দুটো প্রতিষ্ঠানই আমার পরিকল্পনা অনুসারে গঠিত হয়েছিল এবং আমাকে এর তদারক করতে হ'ত।"

আমি বললাম—"আপনাকে তখন তাহলে খুব খাটতে হ'ত?"

শরৎচন্দ্র বললেন—"তুমি সামর্থ্য-নিয়োগের কথাই বলছ—শুধু কি সামর্থ্য? তোমরা ভাব, বই বিক্রী করে শরৎদাদা কত টাকাই না জমিয়েছে! টাকা জমত হে জমত—কিন্তু তাঁত-চরকার গোলকধাঁধায় পড়ে আর স্বেচ্ছাসেবকদের তাগিদ আর চাহিদা মিটাতেই আমি তখন সর্বস্বান্ত হয়ে পড়েছিলাম। তাছাড়া আমার সাহিত্যসেবা শিকেয় উঠেছিল। তাতে কম লোকসান হয়নি—অর্থের দিক থেকেও বটে—সাহিত্যে দানের দিক থেকেও বটে। তোমাদের সাহিত্য-গোষ্ঠী তো আমি ছেড়েই দিয়েছিলাম—যতক্ষণ তোমাদের সঙ্গে মিশব, ততক্ষণ হয়ত চরকা কাটলে কাজ হবে মনে হ'ত। আমি রাজনীতি ক্ষেত্রে না নামলে তোমরা আরো খানকয়েক বেশি উপন্যাস পেতে পারতে।"

আমি বললাম—"আপনি রাজনীতি ক্ষেত্রে নামায় আমাদের কোন লাভ

হয়নি তাহলে। এ আপনার স্বধর্মচ্যুতি। রাজনীতি ক্ষেত্রে তো আপনি একটা নক্ষত্র বই তো নন। কোটী কোটী নক্ষত্রে ভরা আকাশে আপনি অকারণে জ্বলেছেন। ভগবান আপনাকে যে ব্রত-ভার দিয়ে পাঠিয়েছিলেন—সে ব্রত-ভার বহনই ছিল আপনার মিশন। বাকি সবই পরধর্ম।"

শরৎচন্দ্র বললেন—"না হে না। এরও সার্থকতা ছিল। আমার লেখা পড়ে তোমার কি মনে হয় না যে, তার সঙ্গে আমার এই নূতন ব্রতের অঙ্গাঙ্গী যোগ ছিল। দেশের সেবা শুধু কি বাক্য দিয়েই হয়—কর্মের দ্বারাও সকল সেবকেরই সেবা করা উচিত। এতে চিত্তশুদ্ধি হয়। রাজনীতি ক্ষেত্রে নেমে আমি নূতন মানুষ হয়ে গিয়েছিলাম। দেশবন্ধু আমার জীবনে একটা প্রকাণ্ড বিপ্লব ঘটিয়ে দিয়েছিলেন। কর্মক্ষেত্রে নেমে আমার কত দুর্বলতা, কত খেয়াল, চরিত্রের কত ত্রুটি যে চিরদিনের জন্য দূর হয়ে গেছে, আর একদিন তোমাকে সে সব কথা সবিস্তারে বলব।

রবীন্দ্রনাথ যে মনোভাব থেকে লিখেছিলেন—'এবার ফিরাও মোরে', সে মনোভাব আমারও জেগেছিল। তিনিও কর্মলক্ষ্মীর আহ্বান উপেক্ষা করতে পারেন নি, শ্রীনিকেতন-শান্তিনিকেতন তাঁর জীবনের কম অংশ দখল করেনি আর আমি তো মা সরস্বতীর পলাতক ছেলে। আমি যে এতদিন তাঁর মন্দিরে সুবোধ ছেলের মত ছিলাম—সেটাই আশ্চর্য। বাহিরের আহ্বানগুলোকেও কবিগুরু কবিতায় বাণীরূপ দিয়েছেন—আমি তা দিতে পারিনি। আমি পালিয়ে গিয়ে যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়েছিলাম। তাছাড়া দেখ, আমার লেখাগুলোও কেমন একঘেয়ে হয়ে যাচ্ছিল—কেবলি মনে হচ্ছিল শক্তির শেষ সীমায় পৌচেছি—আমার সাহিত্যের ব্রত শেষ হয়েছে। রবারের মত অবশিষ্ট শক্তিটুকুকে টেনে বাড়িয়ে লাভ কি? কর্মক্ষেত্রে কিছুদিন কাটিয়ে এসে আবার যেন একটু শক্তি সঞ্চার ও সঞ্চয় হল—বহু প্রকার নরনারীর চরিত্রের সঙ্গে পরিচয় হল। এদের আমি পল্লীজীবনে বা প্রবাসজীবনে দেখিনি—কত শিখলাম, কত জানলাম, কত ভ্রান্ত ধারণা চলে গেল, কত নূতন নূতন রসের আস্বাদ পেলাম—আমি যেন ক্রমে দেশের ও দশের কাছ থেকে স্বতন্ত্র হয়ে পড়েছিলাম—কর্মক্ষেত্রে নেমে দশের সঙ্গে একাসনে বসে আমার অসাধারণত্বের বোঝা ঘাড় থেকে নেমে গেল। আমি নতুন মানুষ হয়ে ফিরেছি। যারা আমার আগেকার জীবন জানে এবং পরের জীবনের পরিচয়ও রাখে—তারা এসব ধরতে পারবে। আমার লেখার মধ্যে ভঙ্গী ও আদর্শের পরিবর্তন কি লক্ষ্য কর না? না কালিদাস, লোকসান হয়নি। ভাববিলাস থেকে কর্মকোলাহলে গিয়ে

চিত্তকে দৃঢ়তর ক'রে ফিরে আসা সকল সাহিত্যিকেরই উচিত বলে মনে করি। তাতে রচনা বৈচিত্র্যহীনতা থেকে রক্ষা পায়—নতুন বাণীরূপ লাভ করে।"

আমি বললাম—"সাহিত্য ছেড়েছিলেন, কিন্তু রাজনীতিক সাহিত্যও কি সে সময়ে লেখেননি? কই তার তো কোন নিদর্শন দেখি না।"

শরৎচন্দ্র বললেন—"রাজনীতির ব্যাপার নিয়ে যে লিখতে হ'ত না তা নয়। তবে সে সব নিজের নাম দিয়ে বার করতাম না। দেশবন্ধুকে প্রতিদিন সংবাদ-পত্রে যে সব বিবৃতি, মন্তব্য, আবেদন, কৈফিয়ত ইত্যাদি ছাপতে হত—অনেক সময়ে সে সব লিখে দিতে হত। হেমন্তই (সরকার) অধিকাংশ লিখত—আমাকে সবই দেখে দিতে হত। তাছাড়া আরও অনেক লেখাই ছিল—সে সব হারিয়ে গিয়েছে। সে সব বই-এর আকারে প্রকাশ করবার খেয়াল তখন ছিল না।

ছাত্রদের যখন স্কুল, কলেজ ছাড়বার জন্য ডাক দেওয়া হ'ল—তখন দলে দলে তারা বার হয়ে এসে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীতে যোগ দিতে লাগল। প্রমাদ গণলেন স্বর্গত স্যার আশুতোষ। রবীন্দ্রনাথও এর প্রতিবাদ জানালেন। রবীন্দ্রনাথ যখন প্রতিবাদ করতে লাগলেন, তখন আমার হল বিপদ। তখন আমাকে তাঁর অভিমতের বিরুদ্ধেও কলম ধরতে হয়েছিল। আমার এখনো বিশ্বাস, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা—দেশের জনকতক ছেলের জন্য। এ শিক্ষা লাভ ক'রে বাঙালীর ছেলে আদর্শ নাগরিক হয়ে উঠতে পারবে না। জীবিকার্জনের সহায়তাও কিছুদিন পরে এর দ্বারা হবে না—এখনি হচ্ছে না। আর এতে মানুষ তৈরী হচ্ছে না—কতকগুলো বাবু সাহেব, আর গোলাম তৈরী হচ্ছে মাত্র। দেশের জীবনমরণের সমস্যায় এ শিক্ষা কাজে লাগবে না। বিশ্ববিদ্যালয় যদি লিটারেরি এডুকেশনের ক্ষেত্রটা সঙ্কুচিত করে টেকনিক্যাল, মেকানিক্যাল, ভোকেশন্যাল এডুকেশনের ক্ষেত্রটা বাড়িয়ে দিত—যাতে দেহমন দুয়েরই সহযোগিতা আছে—তাহলে স্কুল-কলেজ ছাড়বার ডাকে আমি যোগ দিতাম না।"

আমি বললাম—"যাই হোক, আপনার সাহিত্য যে কাজ করেছে—আপনার শতবর্ষব্যাপী হাতে-কলমে দেশসেবা তা করতে পারত না। আপনার সাহিত্য এনেছে মুক্তির বাণী, এ মুক্তি শুধু রাষ্ট্রীয় শৃঙ্খল থেকে নয়, সর্ববিধ কুসংস্কার, শাস্ত্রীয় সংস্কার, লোকাচার ও দেশাচারের অত্যাচার, জমিদার, পুরোহিত মহাজন ইত্যাদির উপদ্রব, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের সর্বপ্রকার ভ্রান্ত ধারণা থেকে এ মুক্তি। আপনার রচনা বাঙালী জাতিকে প্রকৃত দেশভক্তি

শিখিয়েছে—দেশের প্রকৃত স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত করে তার মনকে করেছে মুক্তির অভিমুখী। তার চেয়ে বড় কাজ আপনি কি করেছেন রাজনীতি ক্ষেত্রে নেমে ?”

শরৎচন্দ্র বললেন—“না হে না, সাহিত্যের মধ্য দিয়ে যে দেশসেবা হয় না, তা নয়। তবে তার কাজ হয় বিলম্বিত এবং পথও বক্র ও জটিল। সকলের মনে তা সাড়া দেয় না। দেশসেবার প্রত্যক্ষ কর্মক্ষেত্রে কাজ সোজা পথে দ্রুত করা চলে। আমার রচনা দেশের মনকে কতটা আগিয়ে দিয়েছে জানি না—তবে দেশবন্ধুর কাজ যে দশ বছরে পঞ্চাশ বছরের কাজ করেছে—তা আমি স্বীকার করি। তাঁর সেই কাজে আমার কন্‌ট্রিবিউশান আছে। অগ্রগতির পথে সেটাকে চিহ্নিত ক'রে দেখানো যায় না—তা তাঁরই কাজের অঙ্গীভূত হয়ে তার স্বাতন্ত্র্যের দাবী লোপ করেছে। বহু বাধা বিঘ্ন জয় করে বহু ব্যর্থতার মধ্য দিয়ে দেশ এগিয়ে গেছে—দুর্গম পথটা অতিক্রান্ত হয়েছে—এখন পথ সোজা ও সুগম। পথের অত্যন্ত দুরূহ অংশে আমারও সাহায্য আছে—পাথেয়ের মধ্যে আমারও কিছু দান আছে—আর মহত্তর ব্যক্তির মহাব্রতে আমার আত্মনিবেদন আছে—একথা মনে করে আমি আনন্দই পাই, ক্ষুব্ধ হই না। দেশের স্বাধীনতা একদিন আসবেই, বোধহয় বিলম্বও নেই। দুঃখ এই যে আমি তা দেখে যেতে পারব না। শরীর ক্রমে জীর্ণ হয়ে আসছে—ওপারের ডাক চরম মুক্তির বাণী নিত্যই শোনাচ্ছে। তোমাদের জীবনে সে শুভদিন আসবে—সেদিন এই নগণ্য সেবকটিকে স্মরণ করো ভাই।”

নয়

সাহিত্যিকের আত্মমর্যাদাবোধ

শরৎচন্দ্রের সঙ্গে একদিন কথা হচ্ছিল—কোন পত্রিকার লেখকের নামের সঙ্গে উপাধি যোগ নিয়ে। তিনি বললেন—"দেখ এরা মনে করে লেখকের নামের সঙ্গে উপাধি যোগ না থাকলে লোকে লেখা পড়বে না। লেখার দাম এরা লেখকের নাম দিয়েই শুধু বিচার করতে চায় না—উপমা দিয়েও প্রচার করতে চায়। ভাগ্যে আমার কোন বাংলা বা ইংরেজী উপাধি বা ডিগ্রী নেই (বলা বাহুল্য তখনো তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টরেট পান নি)—তা না হলে আমার নামও অলঙ্কৃত হয়ে বেরুত।"

আমি বললাম—"আপনি ঠিকই বলেছেন—শুধু উপাধি যোগ নয়, লেখক যদি বড় চাকরি করেন তবে চাকরির নামও যোগ করা হয়। যদি কারো কোনো উপাধি না থাকে তবে সে একটা মনগড়া উপাধি বসিয়েও দেয়।"

শরৎচন্দ্র বললেন—"তোমার ও কবিশেখর লেজুড়টা রেখেছ কেন? নামের সঙ্গে ওটা যোগ কর কেন? বাংলাদেশের পক্ষে এখনো কালিদাস রায় নামটাই কি যথেষ্ট নয়?"

আমি বললাম—"দাদা, আমার ওপর অবিচার করছেন। আমি কোন লেখার তলে নাম সহিতে কবিশেখর কখনো লিখি না। আমার সাহিত্যের কোন বইএ কবিশেখর যোগ করা নেই—কারণ সাহিত্যের বইগুলো আমি নিজেই প্রকাশ করি। কবিশেখর উপাধিটা পত্রিকার সম্পাদকরাই যোগ করে দেন। দুই-এক স্থলে আপত্তিও করেছি—এক বসুমতী ছাড়া কেউ সে কথা শোনে নি। আমার কাছে লেখার প্রুফ এলে আমি উপাধিটা কেটে দিই।"

শরৎচন্দ্র বললেন—"সারা দেশের লোক এক ডাকে তোমাকে কবিশেখর বলেই জানে।"

আমি বললাম—"ওটা আমাকে রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষদ থেকে দিয়েছিল। যখন উপাধিটা দিয়েছিল—তখন আমার বয়স কম। তখন ওটার প্রতি একটা মোহ জন্মেছিল। তারপর ওটা আমার কাজে লাগল পাঠ্যপুস্তক লেখায়। আমার নামটা অত্যন্ত সাধারণ, এ নামে বহু লোক আছে। তাছাড়া প্রকাশকরা যার বই খুব চলে—তার নাম দিয়ে কাল্পনিক ব্যক্তি খাড়া করেও বই ছাপতে

আরম্ভ করে। আমার নাম যদি বীরবাহু, ত্রিবিক্রম কি ত্র্যম্বকেশ্বর এমনি একটা কিছু হত তাহলে উপাধিটার দরকার পড়ত না। কাজেই ঐ উপাধিটা আমাকে বাঁচিয়ে দিয়েছে। কোন-কোন পত্রিকায় কালিদাস রায় নামে কবিতা বেরুতে দেখেছি। এই কালিদাসবাবু কে, তা আবিষ্কারও করেছি—তিনিও একজন স্কুলমাষ্টার—তিনিও পাঠ্যপুস্তক লিখতে ধরেছেন এই ভয়ে আগে থেকেই প্রকাশকদের সুপরামর্শে পাঠ্যপুস্তকগুলোতে কবিশেখর আমি যোগ করি। তা থেকেই সাহিত্যক্ষেত্রেও ওটা চলে গেছে।"

শরৎচন্দ্র বললেন—"তোমার উপাধিটা নিয়ে সেদিন কেউ কেউ হাসাহাসি করছিল—তোমার পক্ষের যুক্তিটা জানা থাকলে আমি একটা জবাব দিতাম। তুমি বোধহয় জান, যেখানেই তোমার বিরুদ্ধে কেউ কিছু বলে সেখানেই আমি তোমার পক্ষ সমর্থন করি।"

আমি বললাম—"তা জানি দাদা। ঐ উপাধিটায় আর একটা সুবিধা আছে।"

শরৎচন্দ্র বললেন—"বোধ হয় বৌমা তো তোমার নাম করতে পারেন না, নামের বদলে উপাধিটা উচ্চারণ করে কাজ চালান।"

আমি হেসে বললাম—"না, বাড়ীতে উপাধিটা চলে নি। তবে সকল অনুজ-শ্রেণীর বা ছাত্রশ্রেণীর যুবকরা শ্রদ্ধাবশতঃ আমার নাম করতে চান না—তাঁরা ঐ উপাধির দ্বারা আমাকে সম্বোধন করেন, রায়মশায় বলার যুগও গিয়েছে, ছাত্রেরা অবশ্য স্যারই বলে।"

শরৎচন্দ্র বললেন—"ভালো কথা, অমুকবাবু প্রবীণ অধ্যাপক, হয়ত তুমিও তাঁর কাছে পড়েছ।"

আমি বললাম—"না, আমি নিজে Berhampur Krishnanath College আর Scottish Church-এ পড়েছিলাম—কাজেই তাঁর কাছে পড়ার সৌভাগ্য আমার হয় নি। তবে আমি ছাত্রকল্প বটে, বয়সেও তিনি ১০।১২ বছরের বড়—আমার অনেক সহপাঠী ও বন্ধু ওঁর ছাত্র।"

শরৎচন্দ্র বললেন—"তা হলে তোমাকে তিনি আপনি আপনি করেন কেন? আমার এটা ভাল লাগে না। এটা যেন হৃদ্যতার সম্পর্ক এড়িয়ে চলা।"

আমি বললাম—"আমাকে তুমি বলে আহ্বান করলে, যদি কোনদিন অমুক দাদা বলে ডেকে বসি, এই ভয়ে বোধহয়।"

শরৎচন্দ্র বললেন—"নাটোরের মহারাজ জগদিন্দ্রনাথ অনুজশ্রেণীর সাহিত্যিকদের তুই বলতেন। কেউ কি তাঁকে জগদিন্দ্র দাদা বলেছেন? আর

তাছাড়া দাদা বললেই বা। দাদা হওয়ার গৌরব কি স্যার হওয়ার গৌরব থেকে বেশী নয়? দাদা হওয়ার যোগ্যতা নেই বলেই বোধহয় এঁদের ভয়। দাদা হতে গেলে ভালবাসতে হয়—সবাই কি ভালবাসতে পারে? আমাকে তো সবাই শরৎদাদা বলে। আমি তাতে গৌরব বোধ করি, খুশী হই, প্রাণটাও তাকে আপনার করে নিতে চায়। কোন বয়ঃকনিষ্ঠ লোক শরৎবাবু বলে ডাকলে আমি চমকে উঠি—মনে হয় লোকটা আমার স্বজাতি বা সগোত্র নয়, সাহিত্যের সঙ্গে ওর কোন যোগ নেই।"

আমি বললাম—"দাদা হওয়ার সেই ভাগ্য আমারও হয়েছে। স্বল্প পরিচিত লোকেরাই কেবল কবিশেখর বা কালিদাসবাবু বলে।"

* * *

একদিন কথা হচ্ছিল কোন একজন সাহিত্যিকের দাম্ভিকতা নিয়ে।

শরৎচন্দ্র বললেন—"কই আমি তো তার দাম্ভিকতার লক্ষণ দেখি নি।"

আমি বললাম—"আপনার কাছে দম্ভপ্রকাশের শক্তি তার কি আছে? অন্য সকলের কাছে সে দাম্ভিক।"

শরৎচন্দ্র বললেন—"সাহিত্যিক হয়ে সাহিত্যিকের কাছে দম্ভ প্রকাশ না করাই উচিত। তবে আমি চাই তোমরা অন্য সকলের কাছে দাম্ভিক দুর্নামই লাভ কর। আমাদের সমাজের লোকে জানে না যে, সাহিত্যিকরা অন্য দেশে সমাজে কি উচ্চ মর্যাদা লাভ করে ধনী না হলেও, বেশী মাইনে না পেলেও, গাড়ী বাড়ী না থাকলেও। যারা সাহিত্যিকদের উপেক্ষা করে তাদের আচরণের উত্তর হওয়া উচিত উপেক্ষা। বড় অধ্যাপক, বড় ব্যারিস্টার, হাকিম, জমিদার-এর নাম করলেই আমাদের সমাজের লোক শ্রদ্ধায় গদগদ হয়। আর সাহিত্যিক, শিল্পী, সুগায়ক তারা যেন কৃপার পাত্র। আমি চাই তারা দাম্ভিকতা অভ্যাস করুক—এরা সবাই স্বজাতি, এই স্বজাতিকে বাদ দিয়ে বাকী যত গণ্যমান্য লোক এবং অন্য যত uncultured লোককে উপেক্ষা করুক। এদেশে অহঙ্কার না থাকলে কেউ কাউকে মানুষ বলেই গণ্য করে না।"

আমি বললাম—"দাদা, ওটা আপনারই শোভা পায়। রাজা, মহারাজা, জজ, ম্যাজিস্ট্রেট সভা সাজিয়ে বসে থাকলেন—আপনি সভাপতিত্ব স্বীকার করেও তাঁদের অগ্রাহ্য করেই যেন পালিয়ে বেড়ালেন। আমাদের তা কি চলে? আপনার অন্নদাতা দেশের রসজ্ঞ জনসাধারণ আর আমাদের অন্নদাতা সমাজের গণ্যমান্য ঐ সব লোকেরা।"

শরৎচন্দ্র বললেন—"তোমাদের অন্ন যোগায় সমাজের দু'চারজন গণ্যমান্য

লোক—তাদের কাছে না হয় বিনীত হয়ে চললে। তাই বলে কথনো একখানা বই কিনেও উপকার করে না এমন সব পদস্থ লোকের কাছে বিনীত হয়ে চলবার প্রয়োজন কি? তাদের সঙ্গে সমান তালে চলতে হবে, নমস্কার না করলে তাদের ডেকে নমস্কার জানাবে না। যারা শুধু প্রশ্ন করে, কিন্তু প্রশ্নের উত্তর শোনবার ধৈর্যও নেই, তাদের প্রশ্নের উত্তরই দেবে না। তাদের এড়িয়ে চলবে, নেহাৎ সামনা-সামনি দেখা হলে কথা কয়ত কইবে। তাদের পাশে চেয়ার খালি থাকলে বসতে ইতস্তত করবে না, সভায় প্যাণ্ডেলে সীট না দিলে সভা থেকে চলে আসবে, নিমন্ত্রণ করলে যাবে না, গেলেও বিশেষ আপ্যায়ন না করলে না খেয়ে চলে আসবে। এইটুকু শুধু মনে রাখবে—একজন সাহিত্যস্রষ্টা একজন বড় অধ্যাপক, ব্যারিস্টার, এটর্নী, জমিদার, ব্যবসাদার বা কনট্রাকটারের চেয়ে ঢের বড়। তারা না জানতে পারে, তুমি তো জান। তবে সাহিত্য-সরস্বতীর সম্মান কেন রাখবে না?"

আমি বললাম—"কখন কার দ্বারস্থ হতে হয় তার তো ঠিক নেই—তাই সবাইকে মেনে চলতে হয়। সংসারী মধ্যবিত্ত লোকের বড় বিপদ, দাদা।"

শরৎচন্দ্র বললেন—"এ তোমার কথা হল কি রকম জান? পীরের দরগা, গাঁয়ের ষষ্ঠীতলা, বটতলার সিঁদুর মাখানো পাথর, বৈরাগীর আখড়া সব জায়গাতেই ঢিপ ঢিপ করে প্রণাম। কে জানে কে কিসে কখন রাগ করবে। সব জায়গাতেই প্রণাম করাই ভালো। আমি তো rude হতে বলছি না, প্রকাশ্যে উপেক্ষা করতেও বলছি না—মনে মনে উপেক্ষা করতে বলছি—উদাসীন হতে বলছি—যতদুর সম্ভব এড়িয়ে চলতে বলছি। উদাসীন হয়ে চললেই তারা খাতির করবে।"

আমি বললাম—"অমুক অধ্যাপক বলেন যে, এদেশে বারবার চীৎকার করে কেউ যদি বলে—আমিই পণ্ডিত, আমিই বিশেষজ্ঞ, আমিই authority আর কেউ কিছু জানে না—সব মূর্খ—তাকেই লোকে খুব পণ্ডিত বলে মনে করে।"

শরৎচন্দ্র বললেন—"লোকটি বেশ বিচক্ষণ দেখছি—তিনি ঠিকই বলেছেন। লোকে কি ভাবে জান? সাধারণ লোকের তো কোন বিদ্যাবুদ্ধি, কালচার নেই, তারা তো পড়ে বা লেকচার শুনে কারো বিদ্যাবুদ্ধির পরিমাপ করে না, তারা ভাবে উনি নিশ্চয়ই খুব বড় পণ্ডিত—তা যদি না হবেন তবে এই একই কথা জোর গলায় বারবার বলবেন কেন? পণ্ডিত না হলে কি এত সাহস হয়?"

তারপর শরৎচন্দ্র বললেন—"তোমরা বই উৎসর্গ কর কেন বড় বড় লোকের নামে? তারা কি বইএর মর্যাদা বোঝে, তারা কি বই প্রকাশের খরচা দেয়?"

আমি বললাম—"আগে ধনী লোকদের নামে বই উৎসর্গ করলে বই ছাপার খরচ দিত, ইদানীং তা কেউ দেয় না। বইএর রস বা ভাব তারা উপলব্ধিও করে না। ওটা করা হয়—কোন সুবিধার প্রত্যাশায় কিংবা কোন অনুগ্রহের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশের উদ্দেশ্যে। পদস্থ সুশিক্ষিত লোকদের নামেই বই উৎসর্গ করা হয়।"

শরৎচন্দ্র বললেন—"ওটা তোমরা ভুল কর। বইএর মর্যাদা যে বোঝে না—বই উৎসর্গ করলে তারা সম্মানিত মনেও করে না—কৃতজ্ঞতার কোন বিশিষ্ট চিহ্ন বলেও মনে করে না। এ ব্যাপারটাকে এক অতি তুচ্ছ মামুলি ব্যাপার বলেই মনে করে। উৎসর্গ করতে কোন খরচ হয় না। যে জন্য লেখক টাকা খরচই করলে না—তার আবার দাম কি? এর চেয়ে তুমি পাঁচ সের ভীম নাগের সন্দেশ, দুটো বড় রুই মাছ, কি এক ঝুড়ি নেংড়া আম দিয়ে এলে মনে রাখবার মত হয়, একটা tangible কিছু পাওয়া গেল মনে করে। রসনা চিরদিনই মনে করিয়ে দেয় এবং বাড়ীসুদ্ধ লোক এত আনন্দ পায়, তারাই চিরদিন মনে পড়িয়ে দেবে। বই উৎসর্গ করলে একদিনও মনে থাকবে না—বাড়ীর লোকেরাও খুশী হবে না। একটা সুবিধা বাগাবার জন্য তুমি তোমার সবচেয়ে ভাল বইখানা উৎসর্গ ক'রে তার একটা কপি নিয়ে চল—আর আমি পাঁচ সের সন্দেশ আর দু' হাঁড়ী ভাল দই নিয়ে যাই; চল একজন ভাগ্য-বিধাতার কাছে দেখা যাক কে সুবিধাটা জোগাড় করতে পারে? তাছাড়া যার নামে সবাই বই উৎসর্গ করে—তার নামে বই উৎসর্গ করার মত নির্বুদ্ধিতা আর নেই। তার তো পাঁচ মিনিটও মনে থাকবে না।"

আমি বললাম—মনে পড়ে রবীন্দ্রনাথের অনাবশ্যক কবিতা—

"চেয়ে দেখি লক্ষ দীপের সনে দীপখানি তার জ্বলে অকারণে।"

শরৎচন্দ্র বললেন—"বই উৎসর্গ করতে হয়—তারই নামে করবে যে বই-এর মর্ম বোঝে, যে উৎসর্গের জন্য ধন্য হয়ে যাবে—যে মাথায় করে নিয়ে বই প্রচার করবে—তোমার পাঁচ সের সন্দেশ ও পাঁচ মণ রুই মাছ পায়ে ঠেলে তোমার বইখানাকে বুকে করে নেবে।"

দশ

সাহিত্যসৃষ্টির কলাবিধি

পড়াশুনা সম্বন্ধে শরৎচন্দ্রকে প্রশ্ন করে জানতে পেরেছিলাম তিনি এফ-এ পাঠ্য সংস্কৃতসাহিত্য ছাড়া সংস্কৃতসাহিত্যের আর বিশেষ কিছু পড়েননি। জিজ্ঞাসা করেছিলাম, "আপনার ভাষা এত বিশুদ্ধ হল কী করে ? ব্যাকরণ ভুল তো নেই বললেই চলে।"

তাতে তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, "আজ পর্যন্ত বাংলাসাহিত্যে যা কিছু বেরিয়েছে সবই পড়েছি। ভূদেব, বিদ্যাসাগর, অক্ষয় দত্ত ইত্যাদির তো কথাই নেই—তারাশঙ্কর তর্করত্নের কাদম্বরী পর্যন্ত পড়েছি। বঙ্কিমের সব লেখা চিবিয়ে খেয়েছি। এতেও যদি বাংলা ভাষাটা বিশুদ্ধভাবে আয়ত্ত না হয়, তা হলে কাব্যতীর্থ ব্যাকরণতীর্থ হলেই কি যা লিখছি তা লিখতে পারতাম ?"

আমি—এসব তো আপনি ভাগলপুরে থাকতেই পড়েছিলেন। ইংরেজী গল্প নভেল কী কী পড়েছিলেন ?

শরৎচন্দ্র—খুব বেশী নয়। ফরাসী ও ইংরেজী গল্প নভেল যা হাতের কাছে পেয়েছিলাম তা পড়েছিলাম। ইংরেজী সমাজতত্ত্বের বই-ই আমার খুব ভাল লাগত।

আমি—সমাজতত্ত্বের বই বোধ হয় বর্মায় গিয়ে পড়েছিলেন।

শরৎচন্দ্র—হ্যাঁ, ঐ সব বই পড়ে ভিন্ন ভিন্ন দেশের সমাজের কুসংস্কার, অনাচার ও নারীজাতির প্রতি আচরণের একটা ফিরিস্তি তৈরি করেছিলাম। সেগুলো নিয়ে কতকগুলো প্রবন্ধ লিখবার ইচ্ছা ছিল।

এই ইচ্ছার কথা তিনি ১৯১৩ সালে একখানা চিঠিতে লিখেছিলেন—"বয়েস হয়েছে, চিন্তাপূর্ণ কিছু লিখতে সাধ যায়। গল্প লেখা তেমন আসেও না, ভালও লাগে না। আমার গল্প লেখা অনেকটা জোর করে লেখা।"

আমি জিজ্ঞাসা করলাম—"আপনার সে ইচ্ছা কি কাজে পরিণত হয়েছিল ?"

শরৎচন্দ্র—'নারীর ইতিহাস' নামে একখানা চার পাঁচশ পৃষ্ঠার বই লিখেছিলাম। ১৯১২ সালে বর্মায় আমার কাঠের ঘরে আগুন লাগে, তাতেই তা ভস্মীভূত হয়ে যায়। তার অনেক কথা 'নারীর মূল্য' বইখানাতে আছে। দেশে দেশে নারীজাতির প্রতি কতভাবে অবিচার হয়, নারীর নারীত্বের মর্যাদা

অস্বীকার করে চিরকাল পুরুষ কিরূপ মনুষ্যত্বের অবমাননা করেছে, সে-কথা ঐ বইয়ের পাণ্ডুলিপিতে ছিল।

আমি—তারপর আর কিছু লেখেননি ঐ সব তথ্য বা বিষয় নিয়ে ?

শরৎচন্দ্র—অনিলা দেবীর নাম দিয়ে দেশবিদেশের নারীদের সম্বন্ধে আরও অনেক প্রবন্ধ লিখেছিলাম।

আমি—এ দেশের নারীজাতির প্রতি অবিচার ও তাদের দুর্দশা নিয়ে বিশেষ কিছু লেখেন নি ?

শরৎচন্দ্র—তা তো গল্প উপন্যাসগুলোর মধ্যেই রয়েছে। (অবশ্য উদ্দেশ্য-মূলকভাবে সেগুলির বিবৃতি করিনি।)—সেজন্য পৃথক প্রবন্ধ লিখবার প্রয়োজন হয়নি। 'নারীর মূল্য'র আদর হওয়ায় আরও চোদ্দটির মূল্য লিখবার মতলব ছিল।—যেমন সমাজধর্মের মূল্য, আত্মার মূল্য, সত্যের মূল্য, মিথ্যার মূল্য, নেশার মূল্য ইত্যাদি।

আমি—সে সব কি লেখা হয়েছিল ?

শরৎচন্দ্র—সমাজধর্মের মূল্যটা লেখা হয়েছিল—এতে ছিল অন্যান্য দেশের সামাজিক নিয়মকানুনের সঙ্গে আমাদের সমাজের তুলনামূলক আলোচনা। এর খানিকটা হরিদাসকে পাঠিয়েছিলাম। সে গল্প উপন্যাসের জন্যই তাগিদ দিত বেশী বেশী। তার ভাবটা ছিল এই—এসব লেখবার জন্য লোকের অভাব দেশে নেই। আমার মত গল্প উপন্যাসের লেখক দেশে কই ? তারপর গল্প উপন্যাসের স্রোতে ভাসলাম—আমার সমাজতত্ত্বও তাতেই ভেসে গেল। অর্থাৎ কতকটা পুড়ল, কতকটা ভাসল। সমাজতত্ত্বটাই ছিল আমার মমতার বস্তু। আর সমাজ সংস্কারটাই ছিল সাহিত্যসেবার প্রধান উদ্দেশ্য।

আমি—আপনার বিন্দুমাত্র লোকসান হয়নি দাদা। সমাজতত্ত্বের আলোচনা ও অধ্যয়ন আপনার মনোভূমি গঠন করেছে খুব সরস আর উর্বর করে। তাতেই এমন সামাজিক কথাসাহিত্যের সোনার ফসল ফলতে পেরেছে।

শরৎচন্দ্র—তা হয়ত হয়েছে। এক-একবার মনে হত হার্বার্ট স্পেনসারের সিনথেটিক ফিলসফির বাংলায় আলোচনা করে একখানা বই লিখি। তাতে তাঁর বিরুদ্ধ দলের দার্শনিকদের সমালোচনা করবারও ইচ্ছা ছিল। তা আর লেখা হল না।

আমি—না হয়েছে, ভালই হয়েছে। তাতে আপনার সৃষ্টিকর্মের ক্ষতিই হত। আপনার কাছে দেশের লোক ঐ শ্রেণীর বই প্রত্যাশা করে না। সে বই এদেশে চলতও না। এসব লিখবে কারা ? যারা কিছু সৃজন করতে পারে

না তারাই। দুর্লভ সৃজন প্রতিভা যিনি পেয়েছেন, তাঁর টীকাকার হবার কথা নয়। মল্লিনাথের গৌরবে কালিদাসের লোভ কেন? সোসিওলজি, বা ফিলসফির বই পড়েছেন—তাতে আপনার স্বাভাবিক সত্যদৃষ্টি হয়ত সাধিত হয়েছে—হয়ত সে অধ্যয়ন আপনার মনের চোখে জ্ঞানাঞ্জন শলাকার কাজও করেছে, হয়ত তা অসত্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবার আয়ুধও যুগিয়েছে। বর্মায় গিয়ে বিদেশী কথা ও সাহিত্যের বই কিছু পড়েছিলেন কি?

শরৎচন্দ্র—বিশেষ কিছু না। ইবসেন, ব্যালজাক, টলষ্টয়, মোপাসাঁ জোলা, হার্ডি ইত্যাদির সব বই-ই কিনেছি, পাশের ঘরে সে-সব রয়েছে দেখতে পাবে। ইবসেনের সব বইগুলোই পড়েছি—অন্যান্য লেখকদের মধ্যে গোর্কি, ডসটয়ভস্কি, চেখভ ইত্যাদির দুই-একখানা করে পড়েছি। ফরাসী লেখকদের কিছু কিছু বই আগেই পড়েছিলাম। এক সময় বিদেশী নভেল গল্প গোগ্রাসে গিলতাম—ক্রমে বয়স বাড়ার সঙ্গে ধৈর্য ধরে ক্লেশ স্বীকার করে ওসব পড়তে আর পারি নি। একখানা বই হাতে নিয়ে দুচার পাতা পড়েই মনে হয়েছে এসব পড়ার চেয়ে লেখাই ভাল। আমার বাংলাদেশের সমাজসংসারের সঙ্গে ওদের সমাজসংসারের কোন মিলই নেই। ওসব পড়ে আমার লাভ কি? এক সময় কাটানো ছাড়া? সময় যাদের কাটে না, যারা নিজেরা লিখতে পারে না, তাদের জন্য ওসব বই। ওসব বই পড়ে লেখার উপাদান-উপকরণ কিছুই পাই নি।

আমি—উপাদান না পেতে পারেন, উপকরণ তো পেতে পারতেন।

শরৎচন্দ্র—উপকরণ বলতে তুমি স্টাইল ভাবছ? স্টাইল তো আমি রবীন্দ্রনাথ থেকেই পেয়েছি। হয়ত ঐসব পড়েই রবীন্দ্রনাথ তাঁর স্টাইল গড়েছিলেন, আমি তাঁরই অনুকরণ করেছি। শিষ্যের হয়ে গুরুদেবই যা করবার তা করেছেন।

আমি—আর নতুন উপাদান কি কিছুই পেতেন না?

শরৎচন্দ্র—সেই ভয়েই তো বেশি পড়ি নি। বিদেশী বই-এর উপাদানকে দেশী ভাবে পরিবর্তিত করে নেবার লোভ হত। আর তোমরা বলতে এটা বালজ্যাক থেকে চুরি, ওটা আনাতোল ফ্রাঁস থেকে নেওয়া। আরে উপাদানের কি অভাব আমাদের দেশে? আমাদের দেশের নর-নারীও মানুষ, তাদেরও সুখ-দুঃখ আশা-আকাঙ্ক্ষা আছে, তাদের জীবনেও মিলন বিরহ, মান অভিমান, প্রণয় কলহ সবই আছে। তাদেরও ত্যাগ, তিতিক্ষা, দয়া ক্ষমা স্নেহ, ভালবাসা, বিরাগ, বিদ্বেষ আছে—জীবনে অশেষ বৈচিত্র্য আছে, কাজেই সাহিত্যসৃষ্টির উপাদানের অভাব কি?

আমি—উপকরণ বলতে আমি প্লটের কথা বলছি—

শরৎচন্দ্র—আরে ভাই, আমি তো সেই কথাই বলছি—প্লটই চুরি করবার জিনিস। আমার মনে বই লিখবার আগে কোন প্লট থাকে না—দু' একটা বিচিত্র প্রকৃতির চরিত্র নিয়ে লিখতে শুরু করি—তারপর তারা নিজেদের মধ্যে বোঝাপড়া করে নেয়, যেখানে থামে—আমার বইও সেখানেই শেষ হয়। আমি অন্যের প্লটের আদরা নিয়ে কী করব? পরের আঁকা আদরা রঙ দিয়ে ভরিয়ে আমি চিত্রশিল্পী হতে চাই না।

অনেক সময়ে একটা বিচিত্র পরিস্থিতি নিয়েও শুরু করা যায়। 'বামুনের মেয়ে' গল্পটার অসাধারণ পরিস্থিতি নিয়ে একখানা উপন্যাস লিখব এ অভিসন্ধি আমার মনে ছিল অনেক দিন থেকে। উদ্দেশ্য, আমাদের হিন্দুসমাজের শূন্য-গর্ভ জাত্যাভিমানের উঁচু মিনারটাকে একটা প্রচণ্ড আঘাত দেওয়া। এর প্রেরণা পাই বহুবিবাহ সম্বন্ধে বিদ্যাসাগরের রচনা থেকে। কিন্তু লিখতে ইতস্তত করেছিলাম। একে তো আমি সমাজদ্রোহী বলে কুখ্যাত, তারপর একটা সাংঘাতিক তথ্য নিয়ে বই লেখা! আমার বিরুদ্ধে সমগ্র হিন্দুসমাজ খড়্গহস্ত হয়ে উঠবে। তখন রবীন্দ্রনাথকে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, 'তুমি যদি লেখ, তা হলে তুমি অন্তরের দরদ দিয়ে এই অপ্রিয় সত্যের রূঢ়তাকে মোলায়েম করতে পারবে। তা ছাড়া, তুমি নিজে কুলীন বামুনের বংশধর হয়ে লিখলে সমাজে একটা আলোড়ন উঠবে না।' আমি তখন সাহস করে বইখানা লিখে ফেললাম। যতটা বিরুদ্ধ আন্দোলন হবে ভেবেছিলাম ততটা হয় নি, যা হয়েছিল, সে আন্দোলনও দুদিনের মাত্র।

আমি—কৌলীন্য প্রথা বিলুপ্ত হয়ে গেছে, ও তো অতীতের কথা! বর্তমানের হিন্দুসমাজ ওসব নিয়ে মাথা ঘামাতে চায় না।

শরৎচন্দ্র—না হে, বিষয়টা অতীত যুগেরই বটে, কিন্তু অতীত যুগের রক্তধারাই তো চলছে।

আমি—ঐতিহাসিকী ও বৈজ্ঞানিকী বুদ্ধি এখন আমাদের ঢের বেশী উদার করেছে।

শরৎচন্দ্র—উদার হচ্ছে, আরও উদার হবে, তখন আমার লেখাকেও সেকেলে বলে মনে করবে। পাঠকের মন সংস্কারমুক্ত হলে তখন আমার হিন্দু সংস্কারের সবলতা দেখানোকেই একটা অপরাধ বলে মনে করবে।

আমি—হিন্দু সংস্কারে আবিষ্ট মানুষ আর থাকবে না বটে। কিন্তু আপনি যে অন্ধ সংস্কারের সঙ্গে সংগ্রাম করেছেন, একথা সবাইকে স্বীকার করতে হবে। তা ছাড়া গিরীশ, যাদব, বিন্দু, নারায়ণী, হেমাঙ্গিনী হয়ত দেশে আর থাকবে

না, কিন্তু এদের চরিত্রের ও জীবনের সর্বজনীন আবেদন যাবে কোথা? তাছাড়া আপনার চরিত্রসৃষ্টি—

শরৎচন্দ্র—সৃষ্টি বল না, আবিষ্কার বল। সব চরিত্রই আমাদের সমাজে আছে। হ্যাঁ চরিত্রসৃষ্টি করতেন রবীন্দ্রনাথ।

আমি—আপনিও করেছেন, যেমন—কমল, কিরণময়ী, সুনন্দা, অন্নদাদিদি, বিপ্রদাস, জীবানন্দ, মহিম, শিবনাথ ইত্যাদি।

শরৎচন্দ্র—তোমরা যে চরিত্র নিজেরা দেখনি, তাদেরই মনে কর শিল্পীর সৃষ্টি। আমি কোন-কোন চরিত্র একটিই দেখেছি। তোমাদের চেয়ে আমার অভিজ্ঞতা ঢের বেশি। সেটা ভুলে যাও কেন?

আমি—হয়ত দু-তিনটি চরিত্র মিলিয়ে একটা চরিত্র গড়েছেন—নয়ত কোন একটা আবিষ্কৃত চরিত্রকে নিজের মনের রঙে রাঙিয়ে রঙের উপর রসান চড়িয়েছেন—তাও সৃষ্টি ছাড়া আর কি?

শরৎচন্দ্র—তা অবশ্য বলতে পার।

* * * *

শরৎচন্দ্র বলতেন—"দেখ অমুক প্লট-প্লট করে রবীন্দ্রনাথকে জ্বালাতন করে। সে মনে করে একটা প্লট পেলেই বুঝি একখানা উপন্যাস লেখা হয়ে গেল। সে প্লটের জন্যে বিচিত্র বিলিতি নভেলগুলো পড়েও অনেক সময় নষ্ট করে। আবার শুনেছি প্লটের জন্য প্রত্যেক সন্ধ্যায় বায়োস্কোপও দেখে। লিখতে জানলে প্লটের জন্য কি আটকায়? আমি তো কোন প্লট ভেবে লিখতে বসি না। নিজের চোখে দেখা কোন একটা সত্য ঘটনা অথবা একটা ঘর-সংসারের বাস্তব চিত্র নিয়ে শুরু করে দিই, তারপর কলম চলতে থাকে। কলম আমাকে যেদিকে নিয়ে যায়, সেদিকে চলে যাই। তাতে যাহোক একটা কাঠামো দাঁড়ায়। তারপর যা স্বাভাবিকভাবে আসবার কথা তাই আসে। কোন একটা বিচিত্র ব্যাপার বা ঘটনা জানি বলেই সেটাকে জোর করে গল্পে ঢুকোবার চেষ্টা করি না। এতে যদি কোন প্লট না দাঁড়ায় তাতেই বা কি আসে যায়? আর কিছু হোক না হোক—বাঙ্গালী জীবনের একটা চিত্র তো ফুটে ওঠে, তা হলেই সাহিত্য হ'ল। ঘটনা ছাড়া যে চরিত্র বা জীবন ফুটবে না এমন তো কথা নেই। যেখানে জোটে না—সেখানে মুখের কথায়, আচারে, ব্যবহারে, হাবভাবে, চাল-চলনে চরিত্র ফোটে;—জীবনও ফোটে। চরিত্রগুলো কাল্পনিক নয়, বাস্তব। তাই আমাদের মতই জীবন্ত। তাদের নিজস্ব মনন-শক্তি আছে, মস্তিষ্ক আছে, হৃদয় আছে। তাদের মনের ভিতরে ভিতরে কি মহামারী কাণ্ডই না হচ্ছে! সেখানে ভাবের

সঙ্গে ভাবের, আদর্শের সঙ্গে আদর্শের, সত্যের সঙ্গে স্বপ্নের, স্বাধীন চিন্তার সঙ্গে সংস্কারের কি কুরুক্ষেত্রই না হচ্ছে! মনের ভিতরকার সে ঘটনাগুলি বাইরের ঘটনার চেয়ে ঢের বেশী জ্বলন্ত। সেগুলোর কথা লিখলেই তো প্লটও হয়—সাহিত্যও হয়।"

আমি তার উত্তরে বলেছিলাম—"তাতে good novel হয়, great novel হয় না। great novel লিখতে হলে একটা সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা আগে থেকে মনে তৈরী থাকা চাই।"

শরৎচন্দ্র বলেছিলেন—"তোমাদের ঐ কলেজে পড়া কতকগুলো তোতাপাখীর বুলি আছে। আমার great novel-এ কাজ নেই, রবীন্দ্রনাথ তা লিখুন।"

শরৎচন্দ্রের চরিত্রগুলো ছিল রক্ত-মাংসে জীবন্ত। রবীন্দ্রনাথের উত্তর-জীবনের উপন্যাসের চরিত্রগুলোর মত ideas personified নয়। শরৎচন্দ্রের চরিত্রগুলোকে বরং persons idealised বলা যায়। যে মানুষকে শরৎচন্দ্র নিজের চোখে দেখেন নি—সে মানুষকে তিনি সাহিত্যে স্থান দিতে চাইতেন না। অন্ততঃ প্রথম জীবনের রচনায়।

শরৎসাহিত্য জীবন্ত মানুষেরই কল্পিত কাহিনী। তবে কি শরৎসাহিত্য Photograph? তা নয় বলেই তার চরিত্রগুলোকে বললাম Persons idealised. তিনি মানুষকে দেখিয়েছেন তাঁর মনের রঙে রঙীন করে। সেই নবকলেবরে তারা সাহিত্যে অবতীর্ণ হয়েছে। এজন্য তাঁকে অনেক ক্ষেত্রে যথেষ্ট রঙ চড়াতে হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে রঙের উপর রসান দিতেও হয়েছে। এরূপ Emphasis দিতে গিয়েই জীবন্ত চরিত্র idealised হয়েছে, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অস্বাভাবিক বা অসত্য হয়ে ওঠে নি।

তাঁর রচনায় একটা প্রধান টেকনিক হল—অরঞ্জিত বাস্তব চিত্র দিয়ে অর্থাৎ আলোক-চিত্র দিয়েই আরম্ভ করা। তার দ্বারাই তিনি পাঠকের বিশ্বাস ও সহানুভূতি আকর্ষণ করতেন। তারপর ধীরে ধীরে রঙ চড়াতে আরম্ভ করেন—ফলে সত্য কথাই রঞ্জিত হয়ে প্রকাশিত হতে থাকত। তখন তার সঙ্গে অনেক অবাস্তবতাও বেশ সহজ ও স্বাভাবিকভাবেই চলে যেত। যেখানে আলোক-চিত্র, সেখানে শরৎচন্দ্রের একটা সজ্ঞান সতর্কতা ছিল। তিনি যেখানে আলোক-চিত্র মাত্র দিয়েছেন, সেখানে কোন অপূর্ব বিচিত্র পরম সত্য ঘটনা বা বাস্তব দৃশ্যেরই অবতারণা করেছেন। শুধু কথা সত্য হলেই তো পাঠকের চিত্ত আকর্ষণ করে না। সত্য হওয়া চাই, সেই সঙ্গে অনন্যসাধারণ বা অপূর্ব হওয়া চাই। শরৎচন্দ্র তা ভাল করেই বুঝতেন। Landscape painting

তাঁর সাহিত্যে বড় একটা নেই। প্রকৃতির প্রতি তাঁর কোন বিশেষ মমতা ছিল না। মানুষই তাঁর চিত্ত জুড়ে ছিল। মানুষের বিচিত্র সুখ-দুঃখের লীলাই তাঁর সাহিত্যের প্রধান উপজীব্য। শ্রীকান্তের দুই-একটি চিত্র ছাড়া প্রকৃতি তাঁর রচনার পটভূমিকা, চালচিত্র ও আবেষ্টনীর কাজটুকু করেছে, কোথাও বিশেষ প্রাধান্য লাভ করে নি। কোথাও কোথাও প্রকৃতি ও মানবজীবন ওতঃপ্রোত-ভাবে জড়িয়ে গিয়েছে।

তিনি বলতেন, "প্রকৃতিকে প্রাধান্য দিলে কবিতা হয়, প্রকৃত কথাসাহিত্য হয় না—হলেও তা unreal হয়। প্রকৃতির প্রতি এই অস্বাভাবিক দরদ কবিকল্পনা মাত্র! যে সকল চরিত্র নিয়ে কথাসাহিত্য রচিত হয়, তাদের এক আধজন কবিপ্রকৃতির লোক থাকতে পারে, বাকী প্রায় সকলেই সাধারণ মানুষ। তাদের প্রকৃতির প্রতি গভীর সহানুভূতি থাকবার কথা নয়। তাদের যদি প্রকৃতির প্রতি অনুরাগ না থাকে, তবে প্রকৃতির প্রতি প্রাধান্য আসে কি করে? ঔপন্যাসিক নিজে কবি হলে তাঁর কল্পিত প্রত্যেক চরিত্রকে কবিভাবাপন্ন করে তোলেন। ফলে প্রকৃতি উপন্যাসে প্রাধান্য লাভ করে, তাতে কথাসাহিত্যের স্বধর্মচ্যুতি হয়।"

আমি বললাম—"শ্রীকান্তে বর্ষার গঙ্গার চিত্র, অন্ধকারের রূপ আর সমুদ্র-বক্ষে সাইক্লোনের দৃশ্য—এই তিনটা প্রাকৃতিক চিত্রের তুলনা নেই। তাছাড়া শ্রীকান্তের চতুর্থ পর্বের সেই কমললতার আখড়ার কাছাকাছি অঞ্চলের কথা সাহিত্যের স্বধর্মচ্যুতি ঘটিয়েছে বলতে হয়।"

শরৎচন্দ্র বললেন—"আরে শ্রীকান্ত যে ভ্রমণকাহিনী, ওতে সবই থাকবে। যে ভ্রমণ করতে বেরিয়েছে সে প্রকৃতিকে বাদ দেবে কি করে?"

এগার

সাহিত্যে তত্ত্ব ও শিল্প

শরৎদাকে একদিন জিজ্ঞাসা করেছিলাম, "আপনি, রবীন্দ্রনাথ-সমসাময়িক লেখা তো পড়েন না।"

তাতে তিনি উত্তর দিয়েছিলেন—"পড়ি বৈ কি! কেদারবাবুর বই দুই-তিন খানা, চারুর বই দুই-তিন খানা, প্রভাতবাবুর বই তিন-চার খানা পড়েছি। তাছাড়া সুধী ঠাকুরের গল্প, সুরেন, উপীন, গিরীন, সৌরীন ইত্যাদির বইও পড়েছি—মেয়েদের মধ্যে অনুরূপা, নিরুপমার বই পড়েছি।"

আমি—কিন্তু অনুজ কথাসাহিত্যিকদের বই পড়েছেন বলে মনে হয় না!

শরৎচন্দ্র—কিছু কিছু পড়েছি বৈকি। তবে তোমরা যেমন করে পড়েছ তেমন করে পড়ি নি। এরা লেখেও বড় বেশি। দিলীপের বইগুলো তো পড়েইছি। ব্যাপারটা কি জান—সবচেয়ে আমার অভিযোগ এই যে, আমাদের লেখকরা জানে না—লেখার বিদ্যেটার সঙ্গে না-লেখার বিদ্যেটাও শিখতে হয়। নিজেই সব কথা বলব—কিছুই ফাঁক রাখব না, এটা বড় আর্টিষ্টের লক্ষণ নয়। পাঠককে অবহেলা করলে চলবে কেন? তার বুদ্ধি বিদ্যা চিন্তা রুচি আছে—তাকে ফাঁকপূরণের অবসর দিতে হবে। তার বিদ্যে বুদ্ধিকে মর্যাদা না দিলে সে প্রসন্ন হবে কেন? এক একজন গাইয়ে আছে দেখেছ, একবার গান ধরলে আর থামতে চায় না। কোথায় থামলে শ্রোতা খুশী হয় তা তারা বোঝে না। এক একজন বক্তা আছে, বক্তৃতা করতে উঠলে এক কথা একশো বার বলবে, কিছুতেই থামবে না। যেন শ্রোতারা মহামূর্খ! তেমনি এমন লেখকও আমাদের মধ্যে সব আছে তারা কলম চালাতে জানে, কিন্তু থামতে জানে না। আমার মনে হয়, থামতে জানাই বড় লেখকের লক্ষণ। সাহিত্যের পক্ষে উচ্ছ্বাস বা অভিভাষণটা বড় নয়, সংযমটাই বড়। ইঙ্গিতব্যঞ্জনায় যেখানে কাজ চলে, সেখানে বাগ্‌বিস্তার কি বিরক্তিকর নয়? বরং কথিতের চেয়ে অকথিত বেশি থাকলেই ভালো হয়।

আমি—যেমন অক্ষয় বড়ালের কবিতা; এতে অকথিত ৭৫%, কথিত ২৫%, আর দেবেন সেনের কবিতা ঠিক উল্টো।

শরৎচন্দ্র—হ্যাঁ, শুধু কথাসাহিত্য কেন, সব সাহিত্যেই তো ভাই। কথা-

সাহিত্যেই হোক আর নাটকেই হোক Dialogue সব ছোট আর যত ইঙ্গিত ব্যঞ্জনায় পূর্ণ হবে ততই ভালো নয় কি আর্টের দিক থেকে—বড় বড় বক্তৃতা থাকলে কি ভালো আর্ট হয় ?

আমি—Shakespeare-এর নাটকে কিন্তু বড় বড় বক্তৃতা থাকত—

শরৎচন্দ্র—Shakespeare ছিলেন কবি-নাট্যকার। কবি-নাট্যকারদের লেখায় তা থাকে ; তাছাড়া সেকালে ইংলণ্ডের শ্রোতারা ঐরূপই ভালবাসত—তারা এক সঙ্গে কাব্যনাট্য দুইই উপভোগ করত। তারপর দুটো বেশ ভাগাভাগি হয়ে গেছে। আজকাল বিলাতের চলতি কোন নাটকে কি অত বড় বড় বক্তৃতা থাকে ?

আমি—কথাসাহিত্যে অতিকথনের নিন্দা রবীন্দ্রনাথও করেছেন রাজসিংহের সমালোচনায়।

শরৎচন্দ্র—অতিকথন আসে কেন জান ? কোন কোন লেখক-লেখিকা পরিশ্রম করে অনেক বইটই পড়ে সেই সব বইএ যা কিছু লিখেছে সব লেখার মধ্যে পূরে দিতে চায়। দেখাতে চায় দেখ আমি কত বড় পণ্ডিত। তারা ডবল প্রতিষ্ঠা নিতে চায়—একদিকে সাহিত্যের মর্যাদা আর একদিকে পাণ্ডিত্যের মর্যাদা। বরং পাণ্ডিত্যের মর্যাদা সে পেতে পারে। সাহিত্যিক মর্যাদা সে হারায়। এমনও দেখবে বিলাতফেরত লেখক, সে যে বিলাত গিয়েছে তা জানাবার বা প্রচার করবার জন্য বিলাতী অভিজ্ঞতা-সূত্র উপন্যাসের মধ্যে নির্বিচারে পূরে দেয়।

আমি—পাণ্ডিত্যের কি কোন স্থান নেই কথাসাহিত্যে ?

শরৎচন্দ্র—থাকবে না কেন ? এমন পণ্ডিতচরিত্র অঙ্কন করতে হবে যে চরিত্রের সঙ্গে প্লটের বেশ রসসঙ্গত মিল আছে—তার মুখে পাণ্ডিত্যের কথা শোভন হতে পারে, তবে বক্তা-পণ্ডিত হলেই শুধু চলবে না, শ্রোতা-পণ্ডিতের চরিত্রও চাই। এরূপ চরিত্র মুখ্য হলে চলবে না, গৌণ চরিত্র হতে পারে। লেখকের জবানী-পাণ্ডিত্য প্রকাশটা কথাসাহিত্যে একটা টিউমারের মত উঁচু হয়ে উঠে। বঙ্কিমবাবু পণ্ডিত কম ছিলেন না, কিন্তু বিষবৃক্ষ আর সীতারাম ছাড়া নিজের জবানী-পাণ্ডিত্য কোথাও প্রকাশ করেন নি। কথাসাহিত্য পাণ্ডিত্য প্রকাশের নয়, পাণ্ডিত্য গোপনের ক্ষেত্র। পাণ্ডিত্য যেন রসকে ছাড়িয়ে না যায়।

আমি—তবে কি কথাসাহিত্যে তত্ত্বেরও স্থান নেই ?

শরৎচন্দ্র—খুব আছে। তবে তত্ত্বটার বিশ্লেষণও নয়—তত্ত্বের প্রতিপাদনও

নয়। একটা তত্ত্বকে কঙ্কালস্বরূপ আশ্রয় করে রস রক্ত মেদ মজ্জা ও শেষে লাবণ্য দিয়ে এমন করে ঢাকতে হবে যে, ভিতরে কঙ্কালের কাঠামো আছে বোঝা যাবে না—যেমন দেবপ্রতিমাতে বোঝা যায় না। তত্ত্বের কঙ্কাল যে একটা আছে তা তোমরা সমালোচকরা অধ্যাপকরা খুঁজে বার করবে—সেই আবিষ্কারের আনন্দই তো সমালোচনার আনন্দ। একটা তত্ত্ব কঙ্কালস্বরূপ না থাকলে লেখাটা খাড়া থাকবে কিসে? একেবারে ভগীরথ হয়ে যাবে যে! শ্রেষ্ঠ কথাসাহিত্য মাত্রেরই অন্তরালে একটা তত্ত্বের কঙ্কাল আছে।

আমি—হাঁ, চিত্রাঙ্গদার মত কাব্যেও সেইরূপ একটা তত্ত্বের কঙ্কাল আছে। তাই কাব্যখানা খাড়া হয়ে চলছে। আচ্ছা, রচনাটি যদি চিত্রাত্মক হয়, তবে তার অন্তরালেও কি তত্ত্ব থাকবে?

শরৎচন্দ্র—মূর্তির অন্তরালেই তত্ত্বের কঙ্কাল চাই—চিত্রের আবার কাঠামো কি? চিত্রকে ত খাড়া হতে হয় না—চিত্র দেওয়ালের গায়ে আশ্রয় পায়। চিত্রের জন্য চাই পটভূমিকা। সে পটভূমিকা হবে এমন একটা সামাজিক পরিবেশ যার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে। আমার চিত্রাত্মক লেখার পরিবেশ তাই আমার আবাল্য পরিচিত হুগলী জেলার মধ্যবিত্ত ভদ্র পরিবার। চিত্রাত্মক রচনার নায়ক-নায়িকাকে সাধে আমি দেশছাড়া করে বর্মায় এনেছি। বর্মার সমাজ আমার সুপরিচিত।

আমি—এ বিষয়েও কি আমাদের তরুণ লেখকরা ভুল করেছে?

শরৎচন্দ্র—ভুল করছে বৈ কি কেউ কেউ। যে ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজকে রাজপথে লেখক দেখেছে তার বেশী জানে না—সেই ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজকে যারা পটভূমিকা করছে তারা ভুল করছে। সেজন্য দরকার নানা সমাজের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেশা—কারণ এক সমাজ থেকে পাত্র-পাত্রীকে অন্য সমাজে নিয়ে যেতে হয়। শুধু একটা সমাজের মধ্যে ঘোরালেই বৈচিত্র্য সৃষ্টি হয় না। নিম্নশ্রেণীর লোকেদের কথা লিখব, অথচ তাদের সঙ্গে মিশতে ঘৃণাবোধ করব। জীবনে কলঙ্কের দাগ বইব না, স্বচক্ষে কিছু দেখব না, পরের মুখে ঝাল খেয়ে, বই পড়ে, ভাষা জেনে নেব। আশ্রমে গিয়ে গুরুর সেবা করব, ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে চলব, তাতে কবিতা লেখা চললেও চলতে পারে, জীবন্ত চরিত্র নিয়ে কথাসাহিত্য রচনা চলে না। সাহিত্যিক শক্তি যোগবলে বা প্রাণায়াম করে পাওয়া যায় না। শুচি-বাগীশরা কথাসাহিত্য না লিখে গীতার ভাষ্য কিংবা যোগবশিষ্ঠের অনুবাদ করলেই পারে। আরে বাপু অশুচি কথাই যদি লিখতে হয় তাতেই বা কি? তোমার জবানী তো নয়, অশুচি নায়ক-নায়িকার মুখ দিয়ে তো সে সব বলা হচ্ছে। যার

মুখে যে কথা সাজে তাই বসানো হচ্ছে। একটা লম্পটের মুখে মোহমুদ্গর বা একটা সতীর মুখে পতিতার মত কথা না বললেই হ'ল। ভাষা যাই হোক, নিজের প্রাণের গভীর অনুভূতিই পাত্রপাত্রীর বুকে সঞ্চার করতে হবে।

আমি—আপনি তাই করেছেন বলেই তো অনেকে কোন কোন চরিত্রকে আপনার আত্মচরিত্র বলে মনে করে।

শরৎচন্দ্র—তা করুক। তা করলেও বুঝতে হবে চরিত্রগুলো জীবন্ত হয়েছে, কারণ আমি নিজে জীবন্ত। আর খুব মিথ্যেও তো নয়। এমন চরিত্র আমি খুব কমই আঁকি যার মধ্যে আমি সহজে প্রবেশ না করতে পারি। আমার জীবনে পাষণ্ড থেকে সাধু-সজ্জন পর্যন্ত সবই যে আছে। আমি বহু জীবনের মধ্য দিয়ে স্তরে স্তরে উঠেছি। বহু জীবনের অভিজ্ঞতা ও অনুভূতি আমার মধ্যে রয়ে গেছে।

আমি—আপনার মত তো কোন সাহিত্যিক বড় সাহিত্যিক হবার জন্যই নিজের সামাজিকজীবন ত্যাগ করে বহু জীবনের সঙ্গে নিজেকে identified করে বেড়াতে পারে না; সমাজের সবরকম স্তরে টিকিট কিনে আর্যাবর্ত ভ্রমণের মত ভ্রমণ করে জ্ঞান অর্জন করে আসতে পারে। স্বভাবতই আপনার জীবন দৈবের ঘাতপ্রতিঘাতে নানা দশা বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে, নানা দুঃখকষ্টের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়েছে।

শরৎচন্দ্র—হ্যাঁ, এটাকেই আমি বিধাতার করুণা মনে করি। তা না হলে চেষ্টা করে আমার দ্বারাও ভিন্ন স্তরের মধ্য দিয়ে ভ্রমণ করা সম্ভব হ'ত না, একথা আমি স্বীকার করছি। আজকাল একদল সাহিত্যিক ইচ্ছা করে লেখায় নোংরামির প্রশ্রয় দিচ্ছে। আরে বাপু—নোংরামির তোরা কি জানিস? তোদের বিদ্যে তো কলেজের কমনরুমে—নয়ত চায়ের আড্ডায়। কোথায়-কোথায় নোংরা যে আছে তার সন্ধানও তো জানিস না বাপু। সন্ধান জানলেও সবই কি সাহিত্যে দেবার কথা? কত যে তা থেকে বাদসাদ দিতে হয় তাও জানার দরকার—নোংরা জিনিসগুলো নিম্নশ্রেণীর লোকদের নিত্যসঙ্গী বলে তা দিতে গেলেই সাহিত্য হয় না—উচ্ছৃঙ্খলতাই হয়।

আমি—অনেকে প্রচলিত সমাজশাসনের বিদ্রোহকেই সাহিত্যে নূতনত্ব সৃষ্টি বলে মনে করছে।

শরৎচন্দ্র—আমাদের সমাজসংস্থানে অনেক গলদ আছে স্বীকার করি। তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহকে আমি অন্যায় মনে করি না। কিন্তু Young Bengal যা মনে করেছিল, হিন্দুর যা কিছু, মায় সিঁদুরপরা হিন্দুর সতীলক্ষ্মী মেয়েরা

পর্যন্ত, হিন্দুর ভাষা-ভূষা পর্যন্ত পরিত্যাজ্য, তেমনি হিন্দুর যা কিছু সবের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে কখনো সৎসাহিত্যের সৃষ্টি হয় না। সাহিত্যিকের উচিত ধ্বংস বুদ্ধির সঙ্গে নয়, সংস্কার বুদ্ধির সঙ্গে অগ্রসর হওয়া।

আমি—আপনিই 'শেষ প্রশ্নে' এইরূপ বিদ্রোহের কথা বলেছেন।

শরৎচন্দ্র—তুমি ছাই বুঝেছ 'শেষ প্রশ্ন'! আমি ধ্বংসমূলক বিদ্রোহের কথা বলিয়েছি কার মুখ দিয়ে? তার জন্ম কোথায়? তার শিক্ষাদীক্ষা কি? সে কার মেয়ে? হিন্দু সমাজের সঙ্গে তার সম্পর্ক কি? সে তো অমনি কথাই বলবে। কমলকে তো আর একটা মহীয়সী মহিলা করে তুলি নি যে সতী নারীরা তার রচনাগুলো বেদবাক্য বলে মেনে নেবে!

আমি—এরূপ চরিত্রসৃষ্টির সার্থকতা কি তবে?

শরৎচন্দ্র—একটা বিচিত্র চরিত্র সৃষ্টি করে গতানুগতিক সমাজে আলোড়ন আনা। উল্টো কথাগুলো বলিয়ে সবাইকে ভাবতে শিখানো।

আমি—অর্থাৎ বলতে চান Thesis-এর পাশে antithesis-এর অবতারণা করে Synthesis আনবার চেষ্টা।

শরৎচন্দ্র—তা হলেই দেখ—আমার চেষ্টাটা সম্পূর্ণ সংস্কারমূলক। দুটো বিপরীত দিকের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য সৃষ্টির প্রেরণা দেওয়া।

আমি—কিন্তু কমলে বড় বেশী Emphasis পড়ে গিয়েছে।

শরৎচন্দ্র—একটা চরম দিক দেখাতে গেলেই তো Emphasis দিতেই হবে। কিন্তু এই যে করুণকে অতি করুণ করা, বীভৎসকে অতি বীভৎস করা, লোভীকে অতি লোভী করা, দুর্দান্তকে অতি দুর্দান্ত করা, মহৎকে মহত্তম করে দেবতা বানানো।—ক্লেশকে দুর্বিসহ ক্লেশে পরিণত করায় Emphasis-এর সার্থকতা কি?

আমি—সার্থকতা এই—চোখে আঙুল দিয়ে না দেখালে আমাদের দেশের লোক তা দেখে না। অতিরিক্ত রঙ না চড়ালে পাঠকদের চোখে পড়ে না। যেমন পাঠক, সাহিত্যও তো তেমনি হবে।

শরৎচন্দ্র—কেন তা হবে? দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য অথবা অকারণে Emphasis দিয়েও আর্ট নষ্ট করা যায় না। পাঠকের রুচির অনুগত হয়ে চলবে কেন? পাঠকের রুচিই বদলে দেব। বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ তাই করেছেন। আর একটা কথা—Emphasis দিয়ে নয়, এমন স্টাইলে এমন টেকনিকে লিখতে হবে যেন পাঠকের উদাসীন মনকে টেনে নিয়ে যেতে পারে। সেজন্য গোড়ার দিকে যতদূর সম্ভব interesting picture দিতে হবে যাতে পাঠক খানিক দূর

পড়ে না থেমে আগ্রহের সঙ্গে আগায়। মাঝখানে uninteresting বাদানুবাদ তত্ত্ব-বিচার ইত্যাদিও চালানো যায়। গোড়ার দিকে কেবল যা সত্য তাই দিতে হবে—পরে অনেক মিথ্যাও চালানো যেতে পারবে। পাঠককে কথায় কথায় ভুলিয়ে নিয়ে যেতে পারলে Emphasis দেওয়ার প্রয়োজনই হয় না।

আমি—শ্রীকান্তের প্রথম পর্বে আপনি তাই করেছেন বটে, কিন্তু ইন্দ্রনাথে একটু Emphasis পড়ে গিয়েছে বোধ হয়।

শরৎচন্দ্র—কিছুমাত্র না। যা সত্য, তাই বলা হয়েছে। তবে এখানে facts are stronger than fiction. ইন্দ্রনাথকে দেখলে একথা বলতে না।

* * *

শরৎচন্দ্র একদিন বললেন—"ওহে এখন দেখছি শুধু গল্প উপন্যাস লিখতে জানলেই চলে না। কবিতা, নাটক, প্রবন্ধ ইত্যাদিও লিখতে পারলে ভাল হয়।"

আমি—একথা কেন বলছেন বুঝলাম না।

শরৎচন্দ্র—এই দেখ না, আমি আর ঠিক উপন্যাস লিখতে পারছি না, অথচ আমার অনেক কথা বলবার রয়েছে—সে সব উপন্যাসের পক্ষে খুব প্রযোজ্য নয়। প্রবন্ধ লেখার অভ্যাস থাকলে প্রবন্ধে বলতাম। কবিতা লেখার অভ্যাস থাকলে কবিতায় বলতাম। বক্তৃতা করবার ক্ষমতা থাকলে সভায় বক্তৃতা করে মনের ভার লঘু করতাম।

আমি—কেন উপন্যাসের মধ্য দিয়েও আপনি তো অনেক কথাই বলেছেন।

শরৎচন্দ্র—বলেছি। কথাগুলো বলাও হচ্ছে। কিন্তু উপন্যাস অর্থাৎ আর্ট কি ঠিক হচ্ছে?

আমি—ঠিক উপন্যাস হচ্ছে কি না তা আমি বলতে পারি না—তবে উপন্যাসের ভঙ্গীতে এক শ্রেণীর আর্ট হচ্ছে।

শরৎচন্দ্র—ছাই হচ্ছে। জিনিসটা বোঝ ভাল করে। আমি জীবনের সঙ্গে জীবনের, চরিত্রের সঙ্গে চরিত্রের দ্বন্দ্ব দেখিয়ে যা লিখতাম তাই হত আসল উপন্যাস। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে জীবনীশক্তি আসছে কমে—কাজেই যে চরিত্র-গুলির সৃষ্টি করছি—তাতে ঠিক জীবনসঞ্চার করতে পারছি না। হঠাৎ কাল শুয়ে শুয়ে তাই মনে হল।

আমি—তবে এখনকার লেখায় কি জীবনের যোগ নেই বলছেন? এগুলোতেও বেশ জীবনদ্বন্দ্ব রয়েছে।

শরৎচন্দ্র—দ্বন্দ্ব তো রয়েছেই; কিন্তু এ দ্বন্দ্ব জীবনের সঙ্গে জীবনের দ্বন্দ্ব নয়—

এ যেন মতের সঙ্গে মতের দ্বন্দ্ব। তার ফলে action কমে আসছে—বাক্যই বেড়ে যাচ্ছে। পাত্র-পাত্রীর মুখে বক্তৃতার আকার হচ্ছে দীর্ঘতর।

আমি—রবীন্দ্রনাথের শেষ বয়সের উপন্যাসগুলোও তাই; মতের সঙ্গে মতের দ্বন্দ্ব, আদর্শের সঙ্গে আদর্শের দ্বন্দ্ব। action কম, কথা কাটাকাটিই বেশী। তা বলে সেগুলো সৎসাহিত্য হচ্ছে না তা নয়।

শরৎচন্দ্র—যে সাহিত্যই হোক, আসল উপন্যাস হচ্ছে না। রবীন্দ্রনাথের নষ্টনীড়, চোখের বালি, নৌকাডুবি যদি আসল উপন্যাস হয়, তবে ঘরেবাইরে, যোগাযোগ, দুই বোন আসল উপন্যাস নয়। রবীন্দ্রনাথের অনেক কথা বলবার আছে—তিনি অনায়াসে প্রবন্ধে কবিতায় সে সব বলতে পারতেন—তাঁর তো প্রকাশের পন্থার অভাব নেই। আমার ন্যান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়। আমাকে এই বয়সেও উপন্যাসের রূপেই তাই আত্মপ্রকাশ করতে হচ্ছে।

আমার কি মনে হয় জান? পঞ্চাশের পর আর আমাদের জীবনীশক্তি বিশেষ থাকে না। তখন আর জীবন্ত চরিত্রের সৃষ্টি করতে পারি না—কবি বা আর্টিস্ট আর থাকি না, গুরুর গদি পেয়ে যাই। তখন যাই করি না কেন সবই গুরুগিরির রূপ ধরে। যে সব নিয়ে রস সৃষ্টি করতে পারি নি—সে সব কথার উপর মায়া কম থাকে না। সেগুলোকে একেবারে বিদায় দিতে পারি না—সেগুলো দিয়ে এমন কিছু গড়ি যা আনন্দ দেওয়ার জন্য ঠিক নয়, চিত্তোৎকর্ষ সাধনে সাহায্য করার জন্য।

আমি—বঙ্কিমের শেষজীবনেও তাই হয়েছিল। তিনি উপন্যাস আর লিখতে পারলেন না। অথচ তাঁর চিত্তে চিন্তা ছিল পুঞ্জীভূত হয়ে। সেগুলো দেশকে না দিয়ে তিনি তো মুক্তি পেতে পারেন না—তিনি তা প্রবন্ধের আকারে দিতে থাকলেন। তিনি ছিলেন আর্টিস্ট, হলেন তাত্ত্বিক। উপন্যাসের মধ্যেই শেষটা তত্ত্বপ্রচার আরম্ভ হয়েছিল। যিনি ছিলেন সুহৃদ, হলেন গুরু। পঞ্চাশোর্ধ সকল আর্টিস্টেরই বোধ হয় এই পরিণতি হয়!

শরৎচন্দ্র—আমাদের দেশে তাই, ইউরোপে তা নয়; এত শীঘ্র আর্টিস্টের সম্বল ফুরোয় না। দেখ আমার মনে হচ্ছে—আমার দেখা জানা মানুষগুলোর জীবনচিত্র দেওয়া ফুরিয়ে গেছে—এখন উপন্যাস লিখতে গেলে তাদের পুনরাবৃত্তি করতে হয়। পুনরাবৃত্তি এড়াবার জন্য আমাকে এখন কল্পনা ও চিন্তার সাহায্য নিতে হচ্ছে।

আমি—আপনার দেখা জানা নর-নারীর কথা ফুরিয়েছে হয়ত; কিন্তু আপনার দেখাও ফুরোয় নি, নর-নারীর মেলাও ফুরোয় নি। নূতন যুগের নর-

নারীদের দেখুন, তাদের জীবনচিত্র আঁকবেন। তাদের দিয়ে আসল উপন্যাস হয়ত হবে।

শরৎচন্দ্র—দেখা ফুরোয় নি; কিন্তু দৃষ্টিশক্তি হয়েছে ক্ষীণ। আর নূতন নূতন নর-নারীর অভাব নেই সত্য, কিন্তু এরা সব যেন অনাত্মীয়—এদের ভিতর পর্যন্ত যেন দেখতে পাই না। দেখাটও একটি শক্তির ক্রিয়া—চিত্রাঙ্কনেও আমাদের প্রয়োজন হয়—বয়সের সঙ্গে সঙ্গে একটা আলস্য আসে। এখনো কবিতা লিখছ ভাই—পঞ্চাশ পার হলেই তখন আর নূতন প্রেরণা পাবে না। আপনিই কবিতা লিখবার প্রবৃত্তি কমে আসবে। কলম অবশ্য থামবে না—তখন লিখবে প্রবন্ধ। অনেক ভেবেছ তো, কাজেই হয়ে পড়বে প্রবন্ধকার। রবীন্দ্রনাথের মত অফুরন্ত শক্তি আর কার আছে?

বার

শ্রীকান্তের কৈফিয়ত

শরৎচন্দ্রের বইগুলো সম্বন্ধে আমার মন্তব্য মাঝে মাঝে তাঁকে জানাতাম—বলা বাহুল্য, প্রতিকূল মন্তব্য কোনদিন জানাই নি। তিনি একদিন বললেন—

"তোমাকে আমার সম্বন্ধে লিখতে হবে। তবে জীবদ্দশায় নয়। আমার জীবদ্দশায় লিখলে স্বাধীন অপক্ষপাত ভাবে লিখতে পারবে না। ব্যস্ত হওয়ার দরকার নেই—আমার দিন তো ফুরিয়ে এলো।"

আমি বললাম—"না না, আপনার শরীরে কোন রোগ নেই। চুল পাকা ছাড়া বার্ধক্যের লক্ষণ নেই; কর্মক্ষমতা ও দৈহিক সামর্থ্য অটুট রয়েছে—আশি বছর পর্যন্ত বাঁচবেন। তাছাড়া কেউ কি বলতে পারে দাদা, কার দিন ফুরিয়ে এলো।"

তিনি বললেন—"তা ঠিক, তবে তোমার সঙ্গে আমার যে বয়সের তফাৎ তাতে প্রত্যাশা করি তুমি আমার কথা লিখে যেতে সময় পাবে। রোগ রোগ করা অভ্যাস নয়—তাই বুঝতে পার না। আমার শরীর ভিতরে ভিতরে ভেঙে গেছে। যাক।"

শরৎচন্দ্রের জীবদ্দশাতে তাঁর সম্বন্ধে লিখতে শুরু করিনি বটে, তবে তাঁর সঙ্গে আলাপ-আলোচনার নোট রাখতাম, একদিন তাঁর সম্বন্ধে লিখব এই ভরসায়। মুশকিল ছিল, কিছুতেই শরৎদাকে সাহিত্যের আলোচনায় নামাতে পারতাম না। যখনই কোন সাহিত্য-প্রসঙ্গ তুলেছি—তখনই বলেছেন, 'ওসব থাক—একটা গল্প শোনো।'

আমি বলতাম—"তা না হয় শুনছি। কিন্তু আমাকে যে আপনার কথা লিখতে হবে—আপনি আপনার সাহিত্যের প্রসঙ্গ উঠলেই থামিয়ে দেন, লিখব কি তবে?"

তিনি বলতেন—"আমার যা কিছু বলবার তার সবই আমার বই-এ আছে। আমার কাছে গল্প ছাড়া বাজে কথা কিছুই শোনবার নেই ভাই! আমার বই থেকে যদি আমার সব কথা উদ্ধার করতে না পারো, তাহলে তুমি লিখতে পারবে না। লেখকের জীবনকথার যা কিছু প্রকাশযোগ্য, তা কি তার লেখার

বাইরে বিশেষ কিছু থাকে? আর সাহিত্যালোচনা মানেই তর্ক, তর্ক করার ক্লেশটা আমি এড়াতেই চাই।"

রসচক্রের বৈঠকে তো সাহিত্য সম্বন্ধে প্রশ্নের কোন অবকাশ থাকত না, কাজেই সপ্তাহে দুই-তিন দিন অন্ততঃ তাঁর বাড়ীতে সকালবেলায় যেতাম। দেখতাম শরৎচন্দ্রকে চটিয়ে দিলে কিছু কথা বার করা যায়। চতুর্থ পর্ব বেরোনোর পর একদিন বললাম—শ্রীকান্ত নিয়ে নানা জন নানা কথা বলছে। 'ভারতবর্ষে' শ্রীকান্ত যখন বেরোতে শুরু করে তখন এর নাম ছিল শ্রীকান্তের ভ্রমণকাহিনী। একজন বলছিল—আপনার উদ্দেশ্য ছিল আপনার ভবঘুরে জীবনের ভ্রমণকাহিনীই আপনি লিখবেন। অবশ্য পুরাপুরি হল না, তবে অনেকটা ভ্রমণকাহিনীই হয়েছে, ঠিক নভেল হয়নি। পিয়ারী না এসে পড়লে পুরাপুরি ভ্রমণকাহিনীই হত।

শরৎচন্দ্র বললেন—"কেউ যদি তা বলে থাকে তবে অন্যায় কিছু বলেনি। 'শ্রীকান্ত' ভ্রমণকাহিনী ছাড়া আর কি? দেশে দেশে বেড়ানোও ভ্রমণ, ভিন্ন ভিন্ন মানুষের মনোরাজ্যে বেড়ানোও ভ্রমণ। শ্রীকান্ত নানা শ্রেণীর নর-নারীর মনোরাজ্যে ঘুরে বেড়িয়েছে। যা দেখেছে তাই লিখেছে। ভ্রমণকাহিনীই যদি হয়—তাতেই বা ক্ষতি কি?"

আমি বললাম—"একথাও তো বলতে পারেন—শ্রীকান্ত একজন মুসাফির, দূর জীবনপথে চলেছে। মাঝে মাঝে সরাইখানায় বা মুসাফিরখানায় বিশ্রাম করছে—নানাশ্রেণীর লোকের সঙ্গে মেলামেশা করছে। একটি নারী তার পিছু নিয়েছে মাঝে মাঝে তার সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হচ্ছে। পথে যেতে যেতে ব্যারাম পীড়া হলে সে কোথা থেকে একখানা পাখা আর একটা পাত্র জল নিয়ে এসে জুটছে। এমনি করে চলতে চলতে শেষে তারা ডেরা বাঁধল এক জায়গায় গিয়ে।"

শরৎচন্দ্র একটু হাসলেন। হেসে বললেন—"তুমি তো আমাকে সমর্থনই করলে। আর কে কি বলে?"

আমি—কেউ কেউ বলে শ্রীকান্ত আপনার স্মৃতিকথা—ঠিক নভেল নয়। আপনি নিজেই লিখেছেন—'এই জীবনের অপরাহ্ণ বেলায় একটি অধ্যায়ের কথা বলিতে গিয়া আমার কত কথাই মনে পড়িতেছে।'

শরৎচন্দ্র—এ কথা কে বলেছে? যখন শ্রীকান্ত প্রথম 'ভারতবর্ষে' বেরোয় তখন কি আমার জীবনের অপরাহ্ণ বেলা? জীবনের অপরাহ্ণ বেলা তো শ্রীকান্তের।

আমি—যাই হোক, সে একই কথা। শ্রীকান্তের মধ্যে আপনি তো অনেকটাই আছেন, তাই তারা একথা বলে।

শরৎচন্দ্র—তারাই বা অন্যায় কি বলছে? সকল উপন্যাসই তো লেখকের স্মৃতিকথা। ভিন্ন ভিন্ন কল্পিত চরিত্রের মুখে বসানো। যাদের ঘনিষ্ঠভাবে দেখেছে—পেয়েছে—তাদের কথাও থাকে। লেখক তাঁর অভিজ্ঞতার বাইরের কথা কি উপন্যাসে ঠাঁই দেন? ঠাঁই দিলে রূপকথা হয়, রোমান্স হয়, উপন্যাসের ছদ্মবেশে প্রবন্ধের বই হয়, উপন্যাস হয় না। আমি আমার স্মৃতিকথা শ্রীকান্তের মারফতে সবটা নয়, অনেকটা বলেছি। এজন্যই সাধারণ পদ্ধতি ত্যাগ করে First person singular number-এর জবানীতে গোটা বই লিখেছি। এতে মাঝে মাঝে মন্তব্য করার সুবিধে হয়েছে।

গোড়াটা তো আমার ভাগলপুরের কিশোর জীবনের স্মৃতিকথা বটেই। তোমরা নিশ্চয়ই জানো ভাগলপুরে ছোটবেলায় পিসীমার বাড়ীতে থাকতাম।

আমি—হ্যাঁ, তাতো জানি ইন্দ্রনাথ তো দুরন্ত, জলজ্যান্ত জলন্ত বালক ছিল। একটু Emphasis দেওয়া আছে হয়ত ঐ চরিত্রে।

শরৎচন্দ্র ঈষৎ কুপিত হয়ে বললেন—"একটুকুও emphasis দেওয়া নেই। তবে একাধিক রাত্রির গঙ্গাবক্ষের অভিযান হয়ত এক রাত্রিতে দেখানো হয়েছে। ইন্দ্রনাথ যে কত বড় মানুষ ছিল, তা তোমরা কল্পনা করতে পারবে না—আমি তাকে পুরাপুরি এঁকে দেখাতে পারি নি। আমি তার আভাস দিয়েছি মাত্র। তবে নতুনদাতে একটু emphasis দেওয়া হয়েছে। নতুনদাও একেবারে কল্পিত যুবক নয়।"

আমি—ইন্দ্রনাথের মাছ চুরিটা হয়েছে অন্নদাদিদির সঙ্গে connecting link. অন্নদাদিদির সমাগমের অনিবার্যহেতু ছিল কি?

শরৎচন্দ্র—নিশ্চয়ই ছিল। বাপ রে। স্মৃতিকথায় তাঁকে বাদ দিতে পারি? (এই বলে তিনি হাতজোড় করে নমস্কার করলেন।)

আমি—অন্নদাদিদি তবে Real character, এরূপ চরিত্র তো সচরাচর দেখা যায় না, দাদা!

শরৎচন্দ্র—আমিও ঐ একটিই দেখেছি। কোন অত্যুক্তি নেই। সাপের সম্বন্ধে আমার কৌতূহল আর অভিজ্ঞতা অসাধারণ, সাপুড়েদের সঙ্গে আমি খুব মিশেছি।

আমি—'বিলাসী' গল্পটাতেও আপনার সাপের সম্বন্ধে অসাধারণ অভিজ্ঞতা দেখা যায়। কি চমৎকার কি Pathetic গল্প।

শরৎচন্দ্র—সাপের সঙ্গে আমার কতবার যে দেখা তার ইয়ত্তা নেই, কতবার যে সাপের দাঁত থেকে বেঁচে গেছি তারও ইয়ত্তা নেই। তোমরা যে পুরানো লাঠিটাকে ফেলে দিতে বলো ঐ লাঠিটা দিয়ে আমি অনেক সাপ মেরেছি।

আমি—আচ্ছা অন্নদাদিদিকে কোথায় দেখেছিলেন, দেবানন্দপুরে, না ভাগলপুরে?

এই প্রশ্নে শরৎদাদা একটু চটে গেলেন। বললেন, "তোমার উদ্দেশ্য আমি বুঝেছি। তুমি কি মনে কর আমি ডায়েরি বা রিপোর্ট লিখছি যে, স্থান কাল পাত্র সম্বন্ধে কাঁটায় কাঁটায় ঘড়ি ধরে মিলিয়ে লিখব? স্মৃতিকথার সূত্র এক, রিপোর্টের সূত্র আর এক।

আমি—অমাবস্যার রাত্রিতে শ্মশানে রাত্রিযাপন—এও কি আপনার অভিজ্ঞতার বিষয়বস্তু?

শরৎচন্দ্র—নিশ্চয়ই! মনে রেখো শ্রীকান্ত ইন্দ্রনাথের বেপরোয়া চেলা। তার অসাধ্য কাজ নেই।

আমি—আমি ভেবেছিলাম যে, আপনার অসাধারণ সর্বশক্তিমতী কল্পনার সৃষ্টিই সত্য বলে প্রতিভাত হয়েছে। ভেবেছিলাম শ্মশানের অন্ধকার পটটা রাজলক্ষ্মীর হৃদয়াবেগের একটা পটভূমিকা।

শরৎচন্দ্র—সত্য না হলে গ্রন্থে ঐ চিত্রের ঠাঁই পাবার কোন দাবী ছিল না।

আমি—সন্ন্যাসী হয়ে যাওয়ার অভিজ্ঞতা আপনার আছে জানি। কিন্তু ভবঘুরে জীবনের ওখানেই কি শেষ?

শরৎচন্দ্র—ভবঘুরে জীবন আমার সন্ন্যাসেই শেষ হয়নি, অনেক দিনই নানা দশা বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে চলেছিল, শ্রীকান্ত বেচারাকে আর ঘুরাইনি। তৃতীয় পর্বে যে অগ্রদানী বাড়ীর আতিথ্যের কথা আছে—সেটা আমার জীবনে ভবঘুরে অবস্থাতেই ঘটেছিল। পোড়ামাটি গ্রামের ডোমের বাড়ীর ঘটনাটার সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল আমার গ্রামেই, ছোটবেলায়। গ্রাম্যজীবনের স্মৃতি সমস্ত বইএ ছড়ানো আছে—চতুর্থ পর্বেই বেশি। বেহারে বাঙালী বালিকাবধূর শোচনীয় দশা সন্ন্যাস অবস্থাতেই স্বচক্ষে দেখা, একটুও অতিরঞ্জিত নয়।

আমি জানতাম পিয়ারীবাই সম্পূর্ণ কল্পিতা রমণী। তাই রাজলক্ষ্মীর প্রসঙ্গ একবারে না তুলে সরাসরি সমুদ্রবক্ষে সাইক্লোনের দৃশ্যে চলে গেলাম।

আমি—সাইক্লোনের সঙ্কটে যে আপনি নিজে ভুক্তভোগী সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। ডাঙার কল্পনার পক্ষে সমুদ্রের ঐ দৃশ্য বর্ণনা অসাধ্য। ব্রহ্মদেশে তো আপনি ছিলেনই।

আমি অভয়ার কথাও না তুলে জিজ্ঞাসা করলাম ওদেশ সম্বন্ধে অনেক কথাই আপনার তিনখানা বইএ আছে। ব্রহ্মদেশে বাঙালীদের সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা কি ?

শরৎচন্দ্র—ব্রহ্মদেশ তখন ছিল বেকারদের চাকরি সন্ধানের রাজ্য। বাঙালী পদস্থ লোকেরা চাকরি জোগাড় করে দিত। বাঙালীদের গা ঢাকা দেওয়ার এমন জায়গা আর কোথাও ছিল না। বহু অপরাধীই ব্রহ্মদেশে পালাত। চরিত্র রক্ষা করা কঠিন হ'ত সেখানে, কেউ কেউ বর্মী, কেউ কেউ অন্য জাতের মেয়ে বিয়ে করত। বাংলা থেকে পরস্ত্রী সধবা বা বিধবা নিয়ে ঐ দেশে কেউ কেউ পালাত, পলাতক স্বামীর খোঁজে কুলবধূ ব্রহ্মদেশে যেত, বাঙালীদের অনেকে ওদেশে গিয়ে ওকালতি, ডাক্তারী ও চাকরি করে বড়লোক হ'ত। নিম্নশ্রেণীর লোকেদের মধ্যে বাঙালী কাঠমিস্ত্রীর সংখ্যা ছিল খুব বেশি। নিম্নশ্রেণীর মেয়েদের মধ্যে অনেকেই ছিল মুড়িওয়ালী। ওদেশে জাতবিচার ছিল না। ধর্মবিচার ছিল না।

আমি—আচ্ছা দাদা, শ্রীকান্তে সম্পূর্ণ কল্পিত চরিত্র কি একেবারে নেই ?

শরৎচন্দ্র—তা আবার নেই। তা না থাকলে অত বড় একখানা বই গড়ে ওঠে ? কোন্ চরিত্রগুলো সম্পূর্ণ কল্পিত—তা তুমি নিজেই বুঝতে পারবে।

আমার বিশ্বাস ছিল—সুনন্দা, কমল, গহর, বজ্রানন্দ এসবই কল্পিত। একটি মুসলমান চরিত্র (গহর) শরৎচন্দ্র ইচ্ছা করেই বইএ সন্নিবিষ্ট করেছিলেন।

আমি—যেমন গহর,—

শরৎচন্দ্র—গহর পুরো কল্পিত নয়; প্রত্যক্ষ চরিত্রের উপর রঙ চড়ানো। কমললতাও তাই। যাক, ও প্রসঙ্গ থাকুক। লোকে শ্রীকান্তকে নভেল বলে, না ?

আমি—সবাই একে পুরোপুরি নভেল বলে না।

শরৎচন্দ্র—কেন ?

আমি—বলে কতকগুলি চমৎকার চিত্র, কতকগুলি ঘটনা, কতকগুলি জলন্ত দৃশ্য। কতকগুলি জলন্ত চরিত্র শিথিলভাবে গাঁথা। এর ভিতর কোন সুনির্দিষ্ট প্লটের সংহতি নেই। চরিত্রের উন্মেষসাধন করা হয়নি। ইন্দ্রনাথ, রাজলক্ষ্মী, কমললতা, বজ্রানন্দ, গহর, সুনন্দা ইত্যাদি সবই Ready made character, উত্তম পুরুষীয় জবানীতে গোটা বইখানা লেখা, সাবপ্লটগুলি মূল আখ্যানের সঙ্গে শ্লথভাবে গ্রথিত। অতএব নভেলের যে সব লক্ষণ, সে সব এতে মেলে না। তারা বলে নভেল না হলেও অপূর্ব সৃষ্টি। তারা বলে নভেলের জন্য চতুর্থ পর্বের প্রয়োজন ছিল না।

শরৎচন্দ্র—তাদের বলো যে, খুব প্রয়োজন ছিল। যে বৈঁচিফলের বনে গল্পের

যাত্রাপথের সূত্রপাত—সেই বৈঁচিফলের বনে ফিরে না এলে তার সমাপ্তি হতে পারে না। তৃতীয় পর্ব বাইরে বাইরেই কেটেছে, যে অঞ্চলের মানুষের জীবন কথা সে অঞ্চলে তাকে ফিরিয়ে আনার দরকার ছিল। আখড়ার গোঁসাইয়ের আশীর্বাদী ফুলের দরকার ছিল। আমি তোমাদের nature-এর খুব ভক্ত নই, তবু বইখানাকে সম্পূর্ণাঙ্গ করবার জন্য ওতে তাকেও স্থান দেওয়ার প্রয়োজন ছিল, যদিও আমি কবি নই।

আমি—কবি নন? চতুর্থ পর্বে কি কবিত্বের ছড়াছড়ি! আমার তো মনে হয় আপনি কত বড় কবি তাই জানাবার জন্যই চতুর্থ পর্ব লিখেছেন। বৈষ্ণবের আখড়া তো একখানি অপূর্ব কাব্য। কমললতা তো রূপগোস্বামীর নাটকের চরিত্র। শুধু গদ্যে কবিতা লেখেন নি—একটি কবিকেও আমদানি করেছেন।

শরৎচন্দ্র—আমি তো সেজন্যই চতুর্থ পর্ব বেরুলে তোমাকে একখানা বই উপহার লিখে দিয়ে বলেছিলাম যে, অন্যের কেমন লাগবে জানি না—তোমার ভালো লাগবেই। যাক আর কে কি বলে বলো—

আমি—কেউ কেউ বলে যে, রাজলক্ষ্মীর সঙ্গে শিকারের শিবিরে শ্রীকান্তের সঙ্গে দেখা হওয়ার পর নভেল সুরু হয়েছে—বই-এর বাকিটা রীতিমত নভেল। আবার কেউ কেউ বলে যে, শ্রীকান্তই সকল দৃশ্য, সকল ঘটনা, সকল দৃশ্যের যোগসূত্র। উত্তম পুরুষীয় জবানীতে লেখা নভেল বিদেশে স্বদেশে আরো আছে। বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথও লিখেছেন। Dickens-এর David Copperfield—এই ভঙ্গীতে লেখা, আপনার স্বামীও তাই। এটাই হ'ল সর্বোৎকৃষ্ট ভঙ্গী। এই জবানীই বৈচিত্র্যের মধ্যে একে সংহতি, সঙ্গতি ও সামঞ্জস্য দান করেছে। এটা নতুন টেকনিকে লেখা নভেল। বিবিধ চিত্র ও উপকাহিনীগুলি এই নভেলের পরিবেশ ও আবেষ্টনীর সৃষ্টি করে একে সম্পূর্ণাঙ্গতা দান করেছে—Vitality বাড়িয়ে দিয়েছে। এতে জীবনদর্শনের গভীরতা আছে। চরিত্রের উন্মেষ একেবারে নেই তা-ও নয়—শিকার পার্টিতে প্রথম দেখা রাজলক্ষ্মী আর চতুর্থ পর্বের শেষের রাজলক্ষ্মীর মধ্যে ঢের তফাৎ। শ্রীকান্ত চরিত্রেরও কম বদল হয়নি। মেঘে মেঘে অনেকটা বেলা হয়ে গিয়েছে—

শরৎচন্দ্র—নভেল হোক, ভ্রমণকাহিনীই হোক, স্মৃতিকথাই হোক, কথা-সাহিত্য হয়েছে তো! একটা শ্রেণীতে না ফেললে পণ্ডিতদের ও মাষ্টারদের স্বস্তি নেই, রসজ্ঞ পাঠকদের তাতে কিছু যায় আসে না। কোন শ্রেণীতে না পড়ে ওটা নিজেই একটা শ্রেণী তৈরী করুক না কেন? কোন্ শ্রেণীতে পড়বে সে কথা না ভেবেই আমি লিখেছি।

তের

রসচক্রের চক্রধর

অধ্যাপক বিশ্বপতি চৌধুরী একদিন ছুটি প্রেসের ছুজন মালিককে সঙ্গে করে এনে আমাকে বললেন—এঁরা একখানা মাসিকপত্র বার করতে চান, আপনাকে ও আমাকে সম্পাদক করে। মাসিকপত্র চালানো যে কত শক্ত সে অভিজ্ঞতা আমার বা বিশুর ছিল না, প্রেসের ছুই মালিকেরও ছিল না। আমরা ভাবলাম, 'সাহিত্যিকরা তো আমাদের বন্ধু, লেখা পাওয়া শক্ত হবে না। তা ছাড়া, আমরা ছুজনেই যাহোক লিখতে পারি। ছু-ছুটো প্রেসের মালিক যখন ভার নিচ্ছেন, তখন আর ভাবনা কি?'

ওরা ভেবেছিলেন—লেখার জন্য আমাদের ভাবতে হচ্ছে না—ছাপার জন্য তো চিন্তাই নেই, নিজেদের ছাপাখানা রয়েছে। এক শুধু কাগজের দামটা লাগবে, ভালোমত বিজ্ঞাপন জোগাড় করতে পারলে লাভই হবে, সম্পাদক ছু'জনকে তো কিছু দিতে হচ্ছে না।

'বসুধারা' নাম দিয়ে মাসিক কাগজ বার করা হল ১৩৩৫ সালের আশ্বিনে। লেখার অভাব অবশ্য হয়নি। বড় বড় লেখকের লেখাই পেয়েছিলাম। রবীন্দ্রনাথের লেখাও পেয়েছিলাম। কিন্তু পাঁচ মাস পরে একজন প্রকাশক দেখলেন লাভের কোন আশা নেই। প্রতি মাসেই লোকসান, তিনি সরে পড়লেন। আর একজন আরও পাঁচ মাস ধার-ধোর করে চালালেন। বিজ্ঞাপন যা পাওয়া গেল, তার প্রাপ্য টাকা আদায় হল না। তিনশো গ্রাহক চেষ্টা করে করা গিয়েছিল। দশ মাসেই বসুধারার অকালমৃত্যু হল। জীবনে সেই আমার প্রথম ও শেষ সম্পাদকতা।

বসুধারাকে আশ্রয় করে বসুধারার লেখকদের নিয়ে কিন্তু একটি সাহিত্যিক গোষ্ঠী গড়ে উঠেছিল। এই সাহিত্যিক গোষ্ঠী প্রত্যেক রবিবারের বিকেলে আমার বাড়িতে আসতেন। আমার বাইরের ঘরটির একটি দেরাজে ছিল বসুধারার অফিস। বসুধারা তো উঠে গেল; কিন্তু সাহিত্যিকদের সাপ্তাহিক মিলনের ধারাটা টিকে গেল। এই সাপ্তাহিক সম্মেলনের নাম দেওয়া হ'ল 'রসচক্র'। যাঁদের নিয়ে রসচক্র নামক বন্ধুসম্মেলন গড়ে উঠল তাঁদের নাম—অধ্যাপক বিশ্বপতি চৌধুরী, কবিবর যতীন্দ্রমোহন বাগচি, কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত,

উকিল কবি প্রবোধনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, অসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়, জগদীশ গুপ্ত, শিক্ষক-লেখক প্রভবদেব মুখোপাধ্যায় ও বিজয়কৃষ্ণ গুপ্ত, কথাসাহিত্যিক উকিল মুটবিহারী মুখোপাধ্যায়, সুগায়ক অতুলানন্দ বক্সী, নন্দগোপাল সেনগুপ্ত, বসুমতীর সহকারী সম্পাদক সরোজনাথ ঘোষ, পুষ্পপাত্র পত্রিকার সম্পাদক জ্ঞান চক্রবর্তী, সম্মিলনী সম্পাদক কালীমোহন বসু, উদ্বোধনের লেখক কুমুদবন্ধু সেন, অধ্যাপক কুমুদচন্দ্র রায়চৌধুরী, আমার ছোট ভাই রাধেশচন্দ্র রায় প্রমুখ। সদস্যদের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ ছিল কবি ফটিকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। এই বৈঠকে গল্পগুজব ও কিছু কিছু সাহিত্যালোচনা চলত। এতে আমার চা ও পান ছাড়া আর কোন খরচ ছিল না। কোন চাঁদা ছিল না, বৈঠকের কোন কর্মসূচী ছিল না। আমি তখন যে বাড়ীতে থাকতাম, তার নাম ছিল সীতারাম কুটীর। বাড়িটির অবস্থান ছিল কালীঘাট পার্কের পাশে।

বিশ্বপতি খুবই আমুদে লোক, আর প্রবোধবাবু ছিলেন অত্যন্ত ব্যঙ্গরসিক। তাঁরাই ছিলেন রসচক্রের নেমিস্বরূপ। দুই যতীন্দ্র কবি যতক্ষণ না আসতেন, ততক্ষণ শুধু রঙ্গরসিকতাই চলত। তাঁরা দেরীতে আসতেন। তাঁরা 'সিরিয়াস্' প্রকৃতির লোক। যতি শব্দের অর্থই তো সংযমী। তাঁরা এলেই সাহিত্যালোচনা শুরু হত। তার অবশ্যম্ভাবী ফল বিতর্ক। বিতর্কে বিশ্বপতি ছিলেন ওঁদের প্রতিমল্ল। তারপর রসচক্র তর্কচক্রে পরিণত হত। নন্দগোপালও একজন বিতর্কবীর ছিলেন।

আমাকে ঘন ঘন বাড়ী বদলাতে হত। বাক্সপেঁটরা বই বিছানার সঙ্গে সঙ্গে রসচক্রও আমার সঙ্গে এক বাড়ি থেকে অন্য বাড়ি যেতে বাধ্য হত। দক্ষিণ কলিকাতায় কোন সাহিত্যিক আড্ডা ছিল না। রসচক্রই সাহিত্যিকদের একমাত্র আশ্রয় হয়ে উঠল।

ক্রমে আরও যাঁরা এসে রসচক্রে যোগ দিলেন, তাঁদের মধ্যে নাম করতে হয় গজেন্দ্রকুমার মিত্র, শুভেন্দ্র মিত্র, সুমথনাথ ঘোষ, মনোজ বসু, কবি জ্ঞানাঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, অধ্যাপক তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, কবি হরেন্দ্রনাথ সিংহ, অমরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রজনীমোহন চক্রবর্তী, শিল্পী সতীশচন্দ্র সিংহ, সাংবাদিক বিশ্বজিৎ সেনগুপ্ত, কবি চণ্ডীচরণ মিত্র ঔপন্যাসিক সরোজকুমার রায়চৌধুরী, কথা-সাহিত্যিক রাধিকারঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায়, রবিবারের লাঠির সম্পাদক কেশবচন্দ্র সেন, কবি নরেন্দ্র দেব, তার্কিক প্রবোধচন্দ্র ঘোষ, কবি কৃষ্ণদয়াল বসু, কবি সুরেশ বিশ্বাস, সর্বঘটস্থ জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ, গোপাল সান্যাল, অখিল নিয়োগী, সুনির্মল বসু, সুবোধ রায়, কিরণ রায়, আনন্দবাজারের যতীন্দ্র সেন প্রমুখ।

ক্রমে রসচক্র খুবই জমে উঠল। তখন প্রস্তাব হল একে ভ্রাম্যমাণ করে তোলা যাক। তখন এক-একজন এক-এক রবিবারে রসচক্রকে আহ্বান করতেন। এতে আয়োজনকারীকে কিছু জলযোগের আয়োজন করতে হত। বলা বাহুল্য, আহ্বানকারীর সংখ্যা ক্রমে কমে এলো। সকলের গৃহে ঠাঁই সঙ্কুলানও হত না। শেষে 'জঙ্গম' রসচক্র আবার আমার ১সি লেক রোডের বাসাবাড়িতে 'স্থাবর' হল।

এখন থেকে নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, কবি হেমচন্দ্র বাগচি, প্রেমেন্দ্র মিত্র, পবিত্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, অচিন্ত্যকুমার, শৈলজানন্দ, প্রবোধকুমার সান্যাল, শশাঙ্ক চৌধুরী, মুরলীধর বসু প্রমুখ কল্লোল কালিকলম গোষ্ঠীর তরুণ সাহিত্যিকরা মাঝে মাঝে আসতেন, নিয়মিতভাবে নয়। কবি কিরণধন শনিবারে ঢাকুরিয়ায় শ্বশুরবাড়িতে আসতেন—তিনি রবিবারে সেখান থেকে রসচক্রে যোগ দিতেন এবং নীরবে এক কোণে বসে পান চিবোতেন। বেশীদিন তাঁর সঙ্গ আমরা পাইনি, সহসা তাঁর মৃত্যু হ'ল।

আরও যাঁরা আসতেন তাঁদের মধ্যে একজনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি এখন বেলুড়মঠের পূর্ণানন্দ স্বামী। তাঁর গার্হস্থ্য জীবনের নাম ছিল অমূল্য রায়চৌধুরী। ইনি সুকবি ও উকিল ছিলেন। সন্ন্যাসগ্রহণের আগে তিনি প্রত্যেক বৈঠকেই আসতেন। কাজী নজরুল ইসলাম ও নলিনীকান্ত সরকার মাঝে মাঝে প্রায়ই আসতেন।

আমি যাঁদের নাম করলাম, তাঁদের ১৪।১৫ জন প্রতি বৈঠকেই উপস্থিত হতেন। বাকি সকলে মাঝে মাঝে আসতেন। সকলে একসঙ্গে উপস্থিত হলে আমার ঘরে জায়গা হত না। এক উদ্যান সম্মেলন ছাড়া সকলে মিলিত হত না। আগন্তুক সংখ্যা খুব বেশী হলে খোলা জায়গাতেও আমরা সতরঞ্চ পেতে বসতাম।

রসচক্রের বৈঠক চলত পাঁচ ঘণ্টা (৫টা—১০টা) ধরে। এর মধ্যে ঘণ্টাখানেক সাহিত্যচর্চা হত। এক ঘণ্টার বেশী সাহিত্য আলোচনা সদস্যেরা বরদাস্ত করতে পারতেন না। এই এক ঘণ্টার মধ্যে কিছু পাঠ হতে পারত, বিতর্ক হতে পারত, কিংবা কোন স্বর্গত সাহিত্যসেবকের উদ্দেশে স্মৃতি তর্পণ হতে পারত। কিংবা ঐ এক ঘণ্টার মধ্যে সদ্যঃস্বর্গত সাহিত্যিকের মৃত্যুতে শোকসভার কাজও সেরে ফেলা হত।

কালীঘাটে মিলনী নামে একটি সাহিত্যিক সমিতি গড়ে উঠেছিল—আমাকে ঐ সমিতির সদস্যেরা সম্পাদক করেছিলেন। এই মিলনীর কয়েকটি মাসিক

বৈঠক হয় কালীঘাটের নানা স্থলে। মিলনীর বৈঠকও রবিবারেই বসত। যে রবিবারে মিলনীর বৈঠক বসত, সে রবিবারে রসচক্র মিলনীর বৈঠকেই যোগ দিত। মিলনীর বৈঠকে আবৃত্তি, কবিতাপাঠ, প্রবন্ধপাঠ ও সাহিত্যিক আলোচনা হত। মনে আছে একটি বৈঠকে কেবল ভাগলপুরের সুরগুরু সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের কালোয়াতী সঙ্গীত হয়েছিল। একটি বৈঠকে বঙ্কিমসাহিত্য নিয়ে তর্ক শেষে হাতাহাতিতে পরিণত হওয়ার উপক্রম হয়েছিল।

একটি বৈঠকে শরৎচন্দ্রের 'শেষ প্রশ্ন' ছিল আলোচ্য বিষয়। ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত ও বিশ্বপতি চৌধুরী 'শেষ প্রশ্নের' বিরূপ সমালোচনা করেন এবং কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত তার প্রতিবাদ করেন। কয়েকটি বৈঠকের পর মিলনী উঠে গেল।

সাহিত্য সম্বন্ধে গভীরভাবে আলোচনা বা কবিতা পাঠ, প্রবন্ধ পাঠ, বক্তৃতা চললে কোন সমিতি বেশিদিন টেকে না; এই ভয়ে রসচক্র এসব যতদূর সম্ভব এড়িয়ে চলত। তবে রসচক্র আবৃত্তি, গান ও বিতর্ক এই তিনটিকে বাদ দেয়নি। কারো কারো লেখা নিয়ে ঠিক সমালোচনা না হোক, রঙ্গরসিকতা হ'ত। সাহিত্যালোচনা করবার জন্য কেউ কোমর বেঁধে আসতেন না—কোন প্রোগ্রামই ছিল না। কথাচ্ছলে যতটুকু সাহিত্যের কথা আসত, ততটুকুই চলত। তবে কবিবর যতীন্দ্রমোহন তাঁর অনেক কবিতা বৈঠকে প্রথম লিখে এনে শোনাতেন।

কাজী নজরুল ইসলাম কিংবা নলিনীকান্ত সরকার যেদিন আসতেন, সেদিন রসচক্র সঙ্গীতের মজলিসে পরিণত হত এবং সামনের রাস্তায় লোকের ভিড় জমত। ঘরে আর লোক ধরত না।

রসচক্রের বার্ষিক সম্মেলন হত উত্তর কলিকাতার উপকণ্ঠ অঞ্চলে কোন-না-কোন বাগানবাড়িতে। এই সম্মেলনের ভার নিত আমার ভাই রাধেশ। এর বেশির ভাগ খরচ সে-ই কতক পকেট থেকে দিত—কতক সংগ্রহ করত চাঁদা করে। এই সম্মেলনে রসচক্রের পরিচিত সকল সাহিত্যিকই যোগ দিতেন। এর জন্য পৃথক নিমন্ত্রণও করা হত। এই সম্মেলনে মনোজ বসু ও বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের খুব উৎসাহ দেখা যেত। তাঁরা বাগানময় ছুটোছুটি করে বেড়াতেন বালকের মতো।

দ্বিতীয় উদ্যান সম্মেলন হয় বেলঘরিয়ায়, এতে রসচক্রের সর্বজ্যেষ্ঠ কবি যতীন্দ্রমোহনকে সম্বর্ধনা দেওয়া হয়। এই সম্বর্ধনায় বেশ একটু গোলযোগ হয়। জলধর সেন সভাপতি হয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর আশীর্বাণী (কবিতায়)

প্রেরণ করেন। শরৎচন্দ্র নিজে আসতে পারেন নি। তিনি আমাকে সামতাবেড় থেকে একখানা চিঠি লিখেছিলেন। সেই চিঠিতে ছিল—"অনেকে উপস্থিত আছো এই সুযোগে একটা দুঃখের অনুযোগ জানাই। * * * এদিনের মতো সেদিনে আমরা এমন করে পরস্পরের ছিদ্র খুঁজে বেড়াতাম না। এক-আধটা ব্যতিক্রম হয়ত ঘটেছে, কিন্তু এখনকার সঙ্গে তার তুলনাই হয় না।

সাহিত্যসেবকদের মাঝে ভাবের আদানপ্রদান, একের কাছে অপরের দেওয়া এবং পাওয়া চিরদিনই চলে আসছে এবং চিরদিনই চলবে। কিন্তু তরুণ দলের মধ্যে আজকাল এ কি হতে চলল? নিন্দা করার একি উদ্দাম উৎসাহ, গ্লানিপ্রচারের একি নির্দয় অধ্যবসায়! কেবলি একজন আর একজনকে চোর প্রতিপন্ন করতে চায়। খবরের কাগজে কাগজে যত দেখি, ততই যেন মন লজ্জায় দুঃখে পরিপূর্ণ হয়ে আসে। ক্ষমা নেই, ধৈর্য নেই, বেদনাবোধ নেই, হানাহানির নিষ্ঠুরতার যেন শেষ হতেই চায় না। কোথায় কার সঙ্গে কার কতটুকু মিলেছে, কার লেখা থেকে কে কতখানি নকল করেছে রুক্ষ কণ্ঠে এই খবরটা বিশ্বের দরবারে ঘোষণা করে যে এরা কি সান্ত্বনা অনুভব করে, আমি ভেবেই পাইনে। ঘরে বাইরে কেবলি জানাতে চায় যে, বাঙলা দেশের সাহিত্যিকদের বিদেশের চুরি করা ছাড়া আর কোন সম্বলই নেই।"

এই সময়ে সাময়িকপত্রে তরুণদলের মধ্যে একটা দলাদলির পর্ব চলছিল। এই দলাদলির মধ্যে শৈলজানন্দকে সমর্থন করে আমি নিজে কোন একটি পত্রিকায় কোন কোন তরুণ লেখকের গালাগালি খেয়েছিলাম। গণ্ডস্যোপরি বিস্ফোটকঃ—মোহিতলালের পত্র। সম্বর্ধনা সভায় আসতে না পেরে মোহিতলালও আমাকে একখানা চিঠি দিয়েছিলেন। তাতে অনেক কটূকঠোর উক্তির মধ্যে ছিল—

"আমাদের দিন গিয়াছে এবং সম্ভবতঃ বাংলাসাহিত্যের কিছুকাল মোহাবস্থা চলিবে। * * * আজিকার এই তরুণোৎসবে তাড়ির পরিবর্তে সোমরসের প্রচলন কি নিতান্তই চক্রান্তসাপেক্ষ নয়? দুয়ার জানালা ভালো করিয়া বন্ধ করিতে হয় এবং অতিশয় মৃদুস্বরে সোমসাম গাহিবার কালে মাঝে মাঝে উচ্চস্বরে কিছু কিছু অথর্বমন্ত্রও তাহাতে যোজনা করিতে হয়। কাজেই রসচক্র সম্বন্ধে আমার আশা আশঙ্কামুক্ত নয়।"

সংবর্ধনার পূর্ববর্তী বৈঠকে শরৎচন্দ্র ও মোহিতলালের পত্র দু'খানি পাঠ করা হয়। তরুণ প্রবীণ বহু সাহিত্যিক সদস্যই উপস্থিত ছিলেন। তরুণরা চাননি পত্র দু'খানি সংবর্ধনা সভায় পঠিত হয়। যতীন্দ্রমোহন ও তাঁর মিতা যতীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন পত্র দুখানির কোন অংশ বাদ না দিয়ে পড়া হোক্। দুই যতীন্দ্রের

উপদেশই গ্রহণ করা হয়। আশঙ্কা ছিল সংবর্ধনা সভাতেই একটা গোলযোগ হবে। অবশ্য তা কিছু হয় নি। তবে তরুণ সাহিত্যিকদের কেউ কেউ যে ভাষণ পাঠ করলেন তাতে যতীন্দ্রমোহন রবীন্দ্রনাথের পরেই সর্বশ্রেষ্ঠ কবি, অন্য কারো সঙ্গে তাঁর তুলনা হয় না এরূপ উক্তি ছিল। তাঁর মিতা এবং তরুণ কবিদের নেতা যতীন্দ্রনাথ এতে দুঃখিত হননি, তিনি তরুণ সাহিত্যিকদের আসল মতামত জানতেন। আমার গায়ে আদৌ লাগেনি। যদিও আমাকে আঘাত করার অভিসন্ধি ছিল। যেখানে করুণানিধান মোহিতলাল যতীন্দ্রনাথ তলিয়ে গেলেন, সেখানে আমি কোন ছার! কাজী সভায় গান গেয়েছিলেন, যে কেউ সর্বশ্রেষ্ঠ হোকগে তাতে তাঁর কোন আপত্তি ছিল না। তিনি গ্রাহ্যও করেননি।

ভাষণ, অভিভাষণ, অভিনন্দনপত্র ও পত্রাবলী সবই উপাসনায় প্রকাশিত হ'ল। তার পর মাসের শনিবারের চিঠি একটি Bomb-Shell-এর মত এসে পড়ল রসচক্রে। তরুণ সাহিত্যিকদের ভাষণের অত্যুক্তিতে করুণানিধান ও মোহিতলাল দু'জনেই উপেক্ষিত হয়েছিলেন। তার উপর উপাসনা সম্পাদক সাবিত্রীপ্রসন্নের অনবধানতায় উপাসনার ঐ সংখ্যাতেই করুণানিধানের 'শতনরী'র বিরুদ্ধে সমালোচনা বেরিয়েছিল। করুণানিধান রবীন্দ্রশিষ্যদের মধ্যে বর্ষিষ্ঠ; তাঁকে উপেক্ষা করে যতীন্দ্রমোহনকে সংবর্ধনা দেওয়াই অসঙ্গত। তারপর তাঁকে আকাশে রবির কাছাকাছি তুলে দেওয়া হয়েছে—শুধু তাই নয়, ঐ সংবর্ধনা সংখ্যাতেই করুণানিধানের কাব্যের নিন্দাবাদ। সমস্ত মিলিয়ে একটা চক্রান্ত বলে মনে হওয়া অস্বাভাবিক নয়। তখনকার সাহিত্যিক আবহাওয়াটাও সদ্ভাবের অনুকূল ছিল না। Bomb-Shell-এর টুকরো আমাদের সকলের গায়েই লেগেছিল। যতীন্দ্রমোহনও বাদ যান নি।

প্রবোধকুমার সান্যাল লিখেছিলেন, "তাঁর সময়ের রাশীকৃত কবিদের যদি একবার চেলে নেওয়া যায়, তা হলে দেখা যাবে, ধুলো গুঁড়ো ঝরে গিয়ে যতীন্দ্রমোহন ছাড়া চালুনিতে আর কেউ নেই।" এটা আমাদের সকল কবিকেই আঘাত।

বিশ্বপতি ব্যাখ্যা করে যতীনদাকে বললে—"দেখুন চালুনির উপরে অসার বস্তুই থেকে যায়। লেখক আপনাকে সবচেয়ে অপকৃষ্ট কবিই বলেছে।"

এতে যতীনদার মুখ গম্ভীর হয়ে গেল। তিনি ভাষণগুলি খুব মন দিয়ে বারবার পড়লেন, পড়ে বললেন—"ওহে, মনে হচ্ছে এরা আমাকে যেন ব্যঙ্গই করেছে। সত্যিই কি এরা রবীন্দ্রনাথের পর আমাকে সবচেয়ে বড় কবি বলে

মনে করে? মিতা যতীন বললেন—"এদের পূর্ববর্তী আচরণ স্মরণ কর এবং পরবর্তী আচরণ লক্ষ্য করে যাও। তা হলেই উত্তর পাবে। অভিনন্দনের দিনের অত্যুক্তির কোন মূল্য নেই।"

রবীন্দ্রশিষ্যগণের মধ্যে যতীন্দ্রমোহন সর্বশ্রেষ্ঠ না হতে পারেন, কিন্তু তিনি যে একজন অসামান্য শক্তিসম্পন্ন কবি সে বিষয়ে আমাদের সন্দেহ নেই। বড়ই দুঃখের বিষয়, আজ তাঁর একখানি বইও বাজারে নেই। যাঁরা সেদিন তাঁকে অভিনন্দন দিয়েছিলেন, তাঁরা আজ সকলেই সাহিত্যক্ষেত্রে গণ্যমান্য। তাঁরা কি তাঁর অনবদ্য কবিতাগ্রন্থগুলির পুনর্মুদ্রণের চেষ্টা করতে পারেন না? বৎসরে একটা স্মৃতিসভা করেও তো তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে পারেন!

পরবর্তী উদ্যান সম্মেলনে আমরা কবিবর করুণানিধানকে ঘরোয়া ভাবে অভিনন্দন দিয়েছিলাম। পরে কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় জগত্তারিণী পদক লাভ করলে রসচক্রে আমন্ত্রণ করে এনে তাঁকে আমরা অভিনন্দিত করি। এ শ্রেণীর সংবর্ধনা মুখে মুখেই করা হত, কোন মানপত্র দেওয়া হত না।

পরের বছর রসচক্র যতীন্দ্রনাথের সাহচর্য হারালো—সেই সঙ্গে যতীন্দ্রমোহনেরও। যতীন্দ্রনাথের 'কাব্যপরিমিতি'র সবটাই তিনি রসচক্রে পড়ে শুনিয়েছিলেন। এই সময়ে উপাসনায় তাঁর 'বৈশাখী' নামে একটা কবিতা বেরোয়। 'শনিবারের চিঠি'তে এর কঠোর সমালোচনা প্রকাশিত হয়। যতীন এইরূপ অপ্রত্যাশিত ও বিরূপ সমালোচনার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি এতে খুব বিচলিত হয়ে পড়লেন। আমাদের গালাগালি খাওয়ার অভ্যাস ছিল, গা-সহা হয়ে গিয়েছিল। যতীনকে কখনো কঠোর ও কটু মন্তব্য শুনতে হয়নি। এটা তাঁর জীবনে প্রথম। তিনি উপাসনায় একটা পাল্টা জবাব দিলেন। আমাকে তিনি বললেন—"দেখ, আমি শনিবারের চিঠির লেখক ও সমর্থক, আমাকে গালাগালি দেওয়ার কথা নয়। সম্ভবতঃ রসচক্রের মধ্যে থাকার জন্যই আমাকে তীব্র কটূক্তি শুনতে হল। রসচক্র ওদের চক্ষুশূল। আমি রবিবার ছাড়া অন্য কোন বারে তোমার বাড়ি যাব। রসচক্রের সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক থাকবে না।"

এরপর যতীন আর রসচক্রে আসেননি।

দুই মিতে একসঙ্গেই আসতেন। যতীন আসা বন্ধ করায় যতীনদাও আসা বন্ধ করলেন।

শরৎচন্দ্র 'প্রবাসজ্যোতি' নামক একখানা পত্রিকায় একটা উপন্যাস লিখতে শুরু করেছিলেন। এক সংখ্যা লেখার পর আর তিনি আগালেন না। রসচক্রের

সদস্যেরা স্থির করলেন—ঐ কয় পাতাকে অবলম্বন করে তাঁরা একখানা সম্পূর্ণাঙ্গ বারোয়ারী উপন্যাস গড়ে তুলবেন। অধ্যাপক কুমুদবাবু সামতাবেড় গিয়ে শরৎ-চন্দ্রের অনুমতি নিয়ে এলেন। শৈলজানন্দ, তারাশঙ্কর, মনোজ, সরোজ ইত্যাদি কথাসাহিত্যিকরা এক এক পরিচ্ছেদ লিখে 'রসচক্র' নামে বারোয়ারী উপন্যাস তৈরী করে ফেললেন। উপসংহার নিয়ে গোলমাল বাধল। তখন ডাঃ নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তের শরণাপন্ন হওয়া গেল। তিনি গ্রন্থখানির উপসংহার করলেন। কুমুদবাবু এ বিষয়ে খুব বেশি উৎসাহী ছিলেন। 'রসচক্র' উপন্যাস রসচক্র থেকে গ্রন্থাকারে আমারই সম্পাদনায় প্রকাশিত হ'ল। শরৎচন্দ্র বইখানি পড়ে খুব খুশী হলেন। রসচক্র থেকে ক্রমে ক্রমে অনেকগুলি পুস্তক প্রকাশিত হয়—যতীন্দ্রনাথের কাব্যপরিমিতি, মনোজ বসুর নরবাঁধ, বিশ্বপতির বহুরূপী, ঘূর্ণী ও স্বপ্নশেষ, আমার হৈমন্তী, সরোজের শতাব্দীর অভিশাপ ও মনের গহনে, ডাঃ রাধাকমলের বাঙলা ও বাঙালী, অধ্যাপক কৃষ্ণবিহারী গুপ্তের গীতাঞ্জলির ভাবধারা, অসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়ের জমাখরচ, প্রিয়তমাসু ও যৎকিঞ্চিৎ, জগদীশ গুপ্তের স্তিনী, রতিবিরতি, নন্দগোপাল সেনগুপ্তের অদৃশ্য সঙ্কেত, প্রেম ও পাদুকা এবং কাঁটাতার, কুমুদবন্ধু সেনের গিরিশচন্দ্র ও নাট্যসাহিত্য, হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের দানীবাবু ও বঙ্গরঙ্গমঞ্চ, যামিনীমোহন করের মডার্ন শকুন্তলা, ছুটবিহারী মুখোপাধ্যায়ের মরুযাত্রী ও নন্দা, শিবেন্দ্রনাথ গুপ্তের বৈষ্ণব কাব্যের রস ইত্যাদি। আমার ভাই রাধেশচন্দ্র রায় ছিল এই বইগুলির প্রকাশক। রসচক্র ছিল তার ধ্যানজ্ঞান।

শরৎচন্দ্র বালিগঞ্জে বাড়ি তৈরি করে এসে বাস করতে লাগলেন। তিনি আসার পর সভাপতিহীন রসচক্রের সভাপতি হলেন তিনিই। তাঁর যাতায়াতের সুবিধার জন্য রসচক্রকে এক বৎসর পরে শিল্পী বন্ধু সতীশচন্দ্র সিংহের প্রশস্ত কক্ষে সুবিস্তৃত গালিচায় স্থানান্তরিত করা হ'ল। শরৎচন্দ্রের জন্য গড়গড়া এলো। আমরা বক্তা ছিলাম, ক্রমে নিবিষ্টচিত্তে শ্রোতা হয়ে পড়লাম তাঁর যত আজগুবি গল্পের। আমরা শরৎচন্দ্রের চারিপাশে ছোটবড় নক্ষত্রের মতো বিরাজ করতাম।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি ডি-লিট্ পেলেন। রসচক্রের বার্ষিক সম্মেলনে ও. সি. গাঙ্গুলীর উদ্যানে সমারোহ উৎসবে তাঁকে আমরা অভিনন্দন দিলাম—তাঁকে আগে থেকে কিছুই না জানিয়ে।

শরৎদা বললেন, "এ কি কাণ্ড! কই কিছু জানাওনি তো!"

আমি—এ তো ঘটা করে কিছু নয়—তা আর কি জানাব?

শরৎদা—তোমরা তো ঘরের লোক। তোমাদের কাছে আবার অভিনন্দন কি? আর আমার অভিনন্দন তো তোমরা প্রতিদিনই দিচ্ছ!

আমি—আপনার কাছে এ ডি-লিটের কীই বা মূল্য! সারা দেশই প্রতিদিনই আপনাকে অভিনন্দন জানাচ্ছে। ডি-লিট তার কাছে তুচ্ছ। তবু আমাদের চেয়ে এতে আর কারো বেশি আনন্দ হতে পারে, তা মনে করি না।

শরৎদা বললেন, "না হে—না। এর মূল্য ঢের বেশি।"

তারপরে বেশ গম্ভীর হয়ে বললেন, "গল্পের নেশায় যারা শুধু গল্প পড়ে—তারা আমাকে গল্পবাজ বলেই জানে, সাহিত্যের ধার তারা ধারে না। তাদের প্রশংসায় প্রাণের আকাঙ্ক্ষা কি সম্পূর্ণরূপে মেটে ভাই? দেশের বিদ্বৎসমাজ কোন সাহিত্যিকের শক্তি স্বীকার না করলে তার ক্ষোভ কি মেটাতে পারে?

কই তোমাদের বিশ্ববিদ্যালয় তো তা-ও দিলে না। এরা ভাবলে কোন গবেষণা করলে না, কোন জ্ঞানগর্ভ থিসিস লিখলে না—কতকগুলো গল্পের জন্য পণ্ডিতদের প্রাপ্য ডিগ্রী কি ওকে দেওয়া যায়? তবু ঢাকা তো দিলে। হিন্দুর বিশ্ববিদ্যালয় যা দিলে না মুসলমানের বিশ্ববিদ্যালয় তা দিলে। তবু তো মুসলমানদের নিয়ে আমি কিছু লিখিনি।"

আমি—আপনার বই নিয়ে আলোচনা করে ও গবেষণা করে কত ছাত্র ডি-লিট পাবে একদিন।

শরৎদা—তা আমিও জানি। তা তো আমি জীবিত থাকতে হবে না। যদি কোনদিন জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় হয় তো তোমরাও পাবে। এরা ভাবে গল্প কবিতা লিখে কবিরাজ হওয়া যায়, ডাক্তার হওয়া যায় না।

এই অভিনন্দন সভায় শরৎচন্দ্রকে কোন ছাপা মানপত্র দেওয়া হয়নি। এই সময়ে একটা বড় অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে। কবি যতীন্দ্রমোহন ইদানীং রসচক্রে আবার আসতেন। কারণ তাঁর দপ্তরে বহু কবিতা জমে গিয়েছিল। তিনি একটা বার্ষিক পত্রিকার সম্পাদনার ভার পেয়েছিলেন। তিনি সেই পত্রিকার জন্য শরৎচন্দ্রের একটা গল্প চান। শরৎচন্দ্র বলেছিলেন, "লিখতে পারি তো দেব, আজকাল গল্প মাথায় আসে না। অনেকে অগ্রিম টাকা দিয়ে রেখেছে তাদেরও দিতে পারিনি।" যতীনদা নাছোড়বান্দা লোক—তিনি তাগিদের উপর তাগিদ দিতে লাগলেন। তাতে শরৎদা বিরক্ত হয়ে বলেছিলেন—"পারলাম না ভাই, ক্ষমা কর।" অভিমানী যতীনদা তাতে খুব রাগ করেন। তিনি বাড়িতে এসে সাময়িক উত্তেজনাবশে একখানা খুব কড়া চিঠি লিখলেন শরৎচন্দ্রকে। সে চিঠির ভাষা অত্যন্ত কঠোর শ্লেষে পূর্ণ।

যতীনদা আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। আমার যেতে দেরী হয়েছিল। গেলে আমাকে চিঠিখানা পড়তে দিলেন—আমি তা পড়ে ছিঁড়ে তাঁর পিকদানীতে ফেলে দিলাম। যতীনদা বললেন—ওটা নকল—আসল চিঠি চলে গিয়েছে। তুমি দেরী করলে আসতে, আমি পাঠিয়ে দিয়েছি। সময়ে এলে পাঠানো হত না। বড় অন্যায় হয়ে গেছে, কি বলো ?

শরৎদা এই চিঠি পেয়ে খুবই দুঃখিত ও ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। তাঁর ক্ষোভ রসচক্রে সঞ্চারিত হল। ফলে যতীনদার সঙ্গে রসচক্রের সব সম্বন্ধ ছিন্ন হয়ে গেল। কিছুদিন পরে যতীনদার কন্যা লীলার মৃত্যু হল। শরৎচন্দ্রকে আমরা এ সংবাদ দিলাম। শরৎচন্দ্র তখনই আমাকে সঙ্গে করে যতীনদার বাড়ি গিয়ে স্নিগ্ধ কণ্ঠে 'যতীন' বলে ডাকলেন। শোকার্ত যতীনদা চমকে উঠে ছুটে এসে শরৎচন্দ্রের হাতদুটো ধরে হাউমাউ করে কাঁদতে লাগলেন। শরৎচন্দ্র যতীনদাকে বুকে চেপে ধরলেন। চোখের জলে মনোমালিন্য ধুয়ে গেল। আমিও স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে বাঁচলাম। দুজনের মধ্যে এরূপ মান-অভিমানের পালা চলত। দুজনেই হৃদয়বান। কাজেই অভিমান বেশীদিন স্থায়ী হত না।

অসমঞ্জবাবুর একখানা বই পড়ে রবীন্দ্রনাথ প্রশংসাপত্র দিয়েছিলেন—তারপর অসমঞ্জবাবু আর একখানা বই (বোধহয় মাটির স্বর্গ) পাঠিয়ে মতামত চেয়েছিলেন। ঠিক জানি না—অসমঞ্জবাবু এজন্য পীড়াপীড়ি করেছিলেন কিনা। রবীন্দ্রনাথ একটা প্রবন্ধ লিখে বইখানার অত্যন্ত বিরূপ সমালোচনা করে পত্রিকায় (বোধহয় প্রবাসীতে) ছাপেন। এতে অসমঞ্জবাবু বড় ব্যথা পান, আমরাও ব্যথিত হই।

শরৎচন্দ্র একদিন বললেন—"অসমঞ্জ বড় দুঃখিত ও অপ্রতিভ হয়ে রয়েছে। ওকে সপ্রতিভ করার প্রয়োজন। ওর প্রতি বড় অবিচার হয়েছে। তোমরা রসচক্র থেকে অভিনন্দন দাও—আমি নিজে হাতে করে, নিজে সহি করে ওর মানপত্র দেব।"

সে বৎসরের উদ্যান সম্মেলনে আমরা অসমঞ্জবাবুকে অভিনন্দিত করলাম যশোর রোডের এক বাগানবাড়িতে। শরৎচন্দ্র মোটা টাকা চাঁদা দিয়েছিলেন।

রসচক্রের শেষের দিকে ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত, ডঃ হেমেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, অধ্যাপক কবি ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্রলাল রায়, কালীচরণ ঘোষ, জসিমুদ্দিন, কাদের নওয়াজ, অধ্যাপক জিতেন চক্রবর্তী, অধ্যাপক সুধীর গুপ্ত ইত্যাদি নতুন নতুন সাহিত্যসেবী এসে যোগ দিয়েছিলেন।

মৃত্যুর আগের আড়াই বছর শরৎচন্দ্র ভগ্নস্বাস্থ্য ও রুগ্ন দেহ নিয়েই

বেঁচেছিলেন। বহুদিন থেকে তাঁর অর্শরোগ ছিল। এই সময়ে তা বেড়ে গিয়েছিল। সামতাবেড় থেকে তিনি একদিন রোদে স্টেশন পর্যন্ত হেঁটে এসে গাড়ির মধ্যে অবসন্ন হয়ে পড়েন। সেদিন থেকে তিনি একপ্রকার শিরঃপীড়ায় আক্রান্ত হন।

মৃত্যুর এক বৎসর আগে একদিন রসচক্রে কথায় কথায় বলেছিলেন, "দেখ যারা অনেক টাকাকড়ি খরচ করে নানাপ্রকার ধর্মাচরণ করে, তাদের বিশ্বাস পরলোক আছে—সেখানে গিয়ে পুরস্কার পাবে। আমার কোন ধর্মাচরণ নেই, স্বর্গও নেই, পরলোকও নেই, সেদিক থেকে কোন আশ্বাস বা সান্ত্বনা পাই না। আমার স্বর্গও নেই, নরক নেই—নরকভয়ই মৃত্যুভয়কে দুর্বিষহ করে তোলে, আমার নরকভয়ও নেই। আমার পরজন্মও নেই। পরজন্মের জন্য প্রস্তুত হওয়ার তাই তাগিদও নেই। রবীন্দ্রনাথ যুগযুগান্তর লোকান্তরের পথে মহাযাত্রার কথা কাব্যে খুব বলেছেন। জানিনে, সত্যই তিনি তা বিশ্বাস করেন কি না। মৃত্যুকে জীবদেহের অনিবার্য পরিণতি বলেই তাকে বরণ করে নিতে হবে। সেজন্য মনকে প্রস্তুত করার প্রয়োজন আছে। মৃত্যুকে ভুলে থাকলে মন্দ হয় না, কিন্তু ভোলবার তো উপায় নেই। প্রকৃতি ধাক্কা দিয়ে দিয়ে মনে পড়িয়ে দেয়। আমি ঐ অনিবার্য পরিণতির জন্য মনকে প্রস্তুত করছি।"

মৃত্যুর দেড় বছর আগেকার কথা। শরৎচন্দ্র একদিন রসচক্রে বললেন—"দেখ তোমরা কেবলই অনুযোগ কর, আর লিখছি না কেন? অনেক কিছুই লেখবার ইচ্ছে ছিল, মনে মনে কত যে প্লট তৈরী হয়ে আছে তা আর কি বলব। আজকালকার সাহিত্যিকদের মত তো আমার কলম দ্রুত চলে না যে, তিনদিনে একখানা উপন্যাস লিখে ফেলব। আমি বড় ঢিমে লেখক, প্রত্যেক লাইন ওজন করে করে কেটে কেটে লিখি। মনে প্রফুল্লতা না এলে, ইনস্পিরেশন না এলে কলম একেবারে এগোয় না। মনে ইচ্ছা থাকলে কি হবে, শরীর আর বয় না, সামর্থ্যে আর কুলোয় না, মনঃস্থির করতে পারি না। আর আমার দ্বারা কিছু হবে না হে। মৃত্যুর ডাক এসেছে, তার জন্যই প্রস্তুত হচ্ছি। যথেষ্ট লিখেছি, আর না পারলেও দেশ আমাকে ক্ষমা করবে।"

ঢাকা থেকে ফিরে এসে রসচক্রের সভ্যেরা জিজ্ঞাসা করল—"দাদা মুসলমান সমাজ নিয়ে উপন্যাস লিখবেন বলেছেন, সত্যিই লিখবেন নাকি? আপনি তো ওদের সমাজ সম্পর্কে বেশী কিছু জানেন না, আর সামান্য পরিচয়ের উপর নির্ভর করে আপনি তো কোন সমাজ নিয়ে কখনো লেখেন না।"

তার উত্তরে শরৎচন্দ্র বলেছিলেন—"দেখ বেঁচে থাকলে তো লিখব?

শরীরের যেরূপ অবস্থা তাতে ও প্রতিশ্রুতি আর পূরণ করতে হবে না হে, সেজন্য চিন্তা নেই।"

ক্রমে শরৎচন্দ্র শয্যাগত হয়ে পড়লেন, রসচক্রে আঁর আসতে পারতেন না।

রসচক্রে ভাঙন ধরতে আরম্ভ হল। আমরা তখন কেবল তাঁর ব্যারামেরই আলোচনা করতাম। তিনি নার্সিং হোমে গেলেন। চিরপ্রফুল্ল রসচক্রে নৈরাশ্যের ছায়াপাত হল। কদিন পরে তাঁর জীবনের অবসান ঘটল।

শরৎচন্দ্রের মৃত্যুর পর ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের সভাপতিত্বে আমরা শোকসভা করলাম। রসচক্রের প্রত্যেক সদস্য তাঁর সম্বন্ধে কিছু না কিছু লিখেছিল, আমিও লিখেছিলাম গদ্য প্রবন্ধ ও কবিতা। তাঁর শোকসভায় আমি এই কবিতাটি পড়েছিলাম।

এত কাছে ছিলে দরদী বন্ধু ছিলে এত আত্মীয়,
কত বড় তুমি দিনেকেরো তরে জানিতে পারিনি, প্রিয়।
মৃত্যু তোমারে চিনায়ে দিয়েছে আজ,
রাখালের সাজে আমাদের মাঝে ছিলে রাজ অধিরাজ।
তোমার সঙ্গে হেসেছি মিশেছি আপনার জন জেনে,
আপন মহিমা লুকাইয়া তুমি বক্ষে নিয়েছ টেনে।
করেছি প্রমাদ, কত অপরাধ, করিয়াছি কত হেলা,
আপন বিভূতি সংবরি নিতি করিয়াছ ছেলে-খেলা।
অবোধ জনের প্রেমে
কোন রসরাজ লীলারস সুখ ভুঞ্জিতে এলে নেমে।
তবু খনে খনে হইয়াছে মনে, নও তুমি সাধারণ,
তোমার মাঝারে ঐশ্বর্য্যের হেরিতাম আভাসন।
ভক্তি-তারকা যেমনি উঠেছে জেগে
ঢাকিয়া দিয়াছ তাড়াতাড়ি প্রীতিঘন মাধুরীর মেঘে।
মোহ-মাধুর্য্যে ঘিরিয়া রাখিলে টুটাইলে ব্যবধান;
প্রিয়জন জেনে তোমার উপরে করিয়াছি অভিমান।
পাছে কভু তোমা ধ'রে ফেলি তাই অবোধ সেজেছ নিজে।
আবেদন ভরা নয়ন তোমার কে জানে চাহিত কী যে।
জানিতে পাইনি কত যে তোমার আত্মার গভীরতা,
আমাদের মত হাসিতে কাঁদিতে কহিতে মনেরই কথা।

বিশ্বজিতের দাতা,
কি ধনের তরে কাঙালের ঘরে তব অঞ্জলি পাতা ?
আজি মনে হয় কত অপরাধই করিয়াছি আচরণে
মূঢ়তা হেরিয়া কতবারই তুমি হাসিয়াছ মনে মনে।
সাধ ক'রে ভুল ক'রে কতবার মানিয়াছ পরাজয়,
অমানীরে মান দিতে করিয়াছ বালকের অভিনয়।
ধুলার মতন ঝাড়িয়া ফেলেছ মোদের আঘাতগুলি,
স্বপ্ন-ভঙ্গ পাছে হয় বলি আঘাত করনি ভুলি।

পাছে পাই প্রাণে ব্যথা,
কোনদিন তাই বলনিক কটু কঠোর সত্য কথা।
মর্য্যাদা তব কখনো রাখিনি উৎসব-কোলাহলে,
কত কথা আজ মনে পড়ে আর আঁখি ভ'রে উঠে জলে।

সারা বঙ্গের হৃদয়ের তুমি ভূপ।
মৃত্যু আজিকে দেখালো বন্ধু তোমার বিশ্বরূপ।
আবিষ্কারের বিস্ময়ে লভে হৃদয় বিস্ফারণ।
শিরায় শোণিত স্তম্ভিত, ভীত বঞ্চিত নয়ন মন।
সেদিনও যাহার সাথে পরিহাস করেছি বন্ধু ব'লে,
সে সারা দেশের মনোরাজত্ব পায়ে ঠেলে গেলে চ'লে।

আঁখিজলে ভেসে ভাবি আজ বারবার
কেন দিলে নাক পূজা করিবার অবসর অধিকার।
চ'লে গেলে তুমি মহাসমারোহে জয় ভাস্বর রথে,
ব্রজ রাখালিয়া চোখে চেয়ে আছি তোমার বিদায় পথে।

তাঁর সান্নিধ্যলাভ করে আমরা শুধু গৌরবান্বিতই হইনি, বহু সন্ধ্যাই আমাদের পরমানন্দে কেটেছে তাঁর জীবনের বিভিন্ন অভিজ্ঞতার গল্প শুনে। তাঁরই আকর্ষণে রসচক্রে যে কত সুধী, কত রসিক, কত পণ্ডিতজনের সমাগম হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। তিনিও বলতেন—"অনেক বৈঠক মজলিসে গিয়েছি, তোমাদের মধ্যে এসে আমি যে আনন্দ পেয়েছি এমন আনন্দ কোথাও পাইনি।"

আমাদের ব্যক্তিগত দুঃখবেদনায় তাঁর অপরিসীম সহানুভূতি ছিল। দুঃখ-বেদনার কথা কখনো তিনি এড়িয়ে যেতেন না, মজলিসের রসভঙ্গ হবে বলে। শ্রীবৃদ্ধির দিনে নিজের হীনতা দীনতার কথা অনেকে বিস্মৃত হয়। তিনি সেই

কথাই বেশি বেশি বলতেন, বোধ হয় বাড়িয়েই বলতেন।' কোন কথা গোপন করতেন না—নিজের ভুলভ্রান্তির কথাও।

আমরা অনেকেই বই লিখেছিলাম—তাঁকে সে সব বই-এর জন্য মতামত জিজ্ঞাসা করে কখনো বিব্রত করিনি। আমরা জানতাম তাঁর ওসব বই পড়ার ধৈর্য ছিল না। নিজে থেকে কখনও কখনও মন্তব্য প্রকাশ করেছেন। তাই আমরা যথেষ্ট মনে করেছি। তিনি বলতেন—"বই না পড়লে অনেক লেখকের প্রতি শ্রদ্ধাটা অটুট থেকে যায়।"

রসচক্রকে মেদিনী গ্রাস করল। এখন কিছুদিন শরাহত কর্ণের মত চক্রটাকে ঠেলে তুলবার চেষ্টা হল।

শরৎচন্দ্রের শোকসভায় ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তকে রসচক্রের স্থায়ী সভাপতিত্ব করতে অনুরোধ করা হল। তারপর রসচক্র বসত; কিন্তু সে যেন পোস্ট গ্রাজুয়েট ক্লাস। শরৎচন্দ্রের মৃত্যুর পর রসচক্রের আর উদ্যান সম্মেলন হয়নি। উদ্যান সম্মেলনে উৎসাহটা তাঁর ছিল সবচেয়ে বেশি। তিনি বছরে ২।৩ বার সম্মেলনের পক্ষপাতী ছিলেন এবং বলতেন, "আমি একশো টাকা চাঁদা দিতে প্রস্তুত আছি।" এমন কি তিনি ভোজনের 'মেনু' পর্যন্ত তৈয়ারি করে দিতেন, নিজ হাতে পরিবেষণও করতেন।

তিনি বলতেন—"তোমরা প্রত্যেক উদ্যান সম্মেলনে এক একজনকে অভিনন্দন দাও। আমার অভিনন্দন পেতেও ভালো লাগে, দিতেও ভালো লাগে।"

ডঃ দাশগুপ্ত সব বৈঠকে আসতে পারতেন না এবং এসেও বেশিক্ষণ বসতেন না। ক্রমে তিনি আসা বন্ধ করলেন। তখন মাঝে মাঝে রসচক্রের বৈঠক স্মৃতিসভার রূপ ধরত। শরৎচন্দ্রের মৃত্যুর পর রসচক্র আমাদের বসন্ত রায় রোডের বাড়ীতেই বসত। মাসে অন্তত একটা বৈঠকে স্বর্গত সাহিত্যিকদের স্মৃতিসভা হত।

রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর তাঁর সম্বন্ধে শোকসভাই রসচক্রের শেষ বৈঠক। এই বৈঠকে আমরা প্রস্তাব করেছিলাম রবীন্দ্রনাথের জন্ম বৎসর থেকে রবীন্দ্রাব্দের প্রচলন করা হোক এবং তা আমাদের সাহিত্যসমাজে চালু করা হোক। আমাদের এই প্রস্তাব ঐ বৎসর আশ্বিনের প্রবাসী এবং ৩১শে আগষ্ট তারিখের আনন্দবাজার পত্রিকা সমর্থন করেছিল। কবির জন্ম বৈশাখ মাসে, বৈশাখ মাস থেকে অব্দ গণনার কোন অসুবিধা হত না। কিন্তু সাহিত্যসমাজ আমাদের মত নগণ্য লোকের প্রস্তাব গ্রহণ করেনি।

যুদ্ধের সময়ে আমরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়লাম—এদিকে ব্ল্যাকআউটও চলতে

লাগল। শহরের আবহাওয়া তখন উদ্বেগ, অশান্তি ও আশঙ্কায় পূর্ণ। এরূপ আবহাওয়ার বৈঠকে মজলিস অচল হয়ে পড়ল। রসচক্রও উঠে গেল।

রসচক্র ছিল সাহিত্যিক ও সাহিত্যানুরাগীদের মধ্যে মৈত্রী ও সদ্ভাব অনুশীলনের সম্মেলন। এর সম্বন্ধে অনেকের ভুল ধারণা ছিল। কেউ-কেউ একে দলাদলির একটা আড্ডা মনে করতেন—মোহিতলাল আবার একে পুরোপুরি সাহিত্যচর্চার বৈঠক মনে করে এর সম্বন্ধে অবজ্ঞা ও নৈরাশ্য প্রকাশ করতেন। রসচক্র প্রধানতঃ সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠান ছিল না। মৈত্রী মিলনই ছিল এর মুখ্য উদ্দেশ্য। সাহিত্যের কথা ছিল গৌণ। রসচক্রের সভ্যদের গৃহে প্রত্যেক সামাজিক অনুষ্ঠানে রসচক্র যোগ দিত। দৃষ্টান্তস্বরূপ ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্তের বিবাহের প্রীতিসম্মেলন রসচক্রেরই একটি উৎসবে পরিণত হয়েছিল। সদস্যদের মধ্যে প্রতিযোগিতা বা ঈর্ষাদ্বেষের ভাব ছিল না, তাঁদের মধ্যে যে সদ্ভাবের সৃষ্টি হয়েছিল—তা তাঁদের চিরজীবনে স্থায়িত্ব লাভ করেছে। সকল গোষ্ঠীর সাহিত্যিকরাই এখানে আসা যাওয়া করতেন—তাঁরাই আমার উক্তির যাথার্থ্য সম্বন্ধে সাক্ষ্য দেবেন। রসচক্রের উদ্যান সম্মেলনের স্মৃতি সকল সাহিত্যিক সদস্যের মনে উজ্জ্বল হয়ে আছে। নগরের বাইরে প্রকৃতির শ্যামল সুন্দর পরিবেশে ভূরিভোজনে তৃপ্ত হয়ে তাঁরা কি আনন্দেই দিনটি কাটাতেন, তারই গল্প করে আনন্দ পান, এমন বহু সাহিত্যিক এখনো বেঁচে আছেন।

অনেকে চিরবিদায় নিয়েছেন—এই কয় বছরে। তাঁদের কথা আজ স্মরণ করি—

সরস্বতীর সরোবরে ছিল রাজহংসের দল
জমায়ে তুলিত আনন্দ কোলাহল।
মৃণাল কন্দ পাথেয় লইয়া দূরে দূরে বহু দূরে,
মানসসরসী পানে গেল তারা উড়ে॥

রসচক্রের মেদিনী করেছে গ্রাস
অনেকেই গেছে ছিন্ন করিয়া আমাদের বাহুপাশ।
পায়ের চিহ্ন মুছে মুছে গেছে চলে
হৃদয়ের ছাপ চিরদিন তার মুছে যাবে তাই বলে?
পেয়েছি এদের গভীর নিবিড় প্রীতি
কবির ছন্দে বন্দী করিয়া রাখিনু এদের স্মৃতি॥

চোদ্দ

অমরলোকের পথে যাত্রা

মৃত্যুর আগের আড়াই বছর শরৎচন্দ্র ভগ্ন স্বাস্থ্য ও রুগ্ন দেহ নিয়েই বেঁচেছিলেন। বহুদিন থেকে তাঁর অর্শরোগ ছিল—এই সময়ে বেড়ে গিয়েছিল। সামতাবেড় থেকে একদিন রোদে স্টেশনে হেঁটে এসে তিনি গাড়ীর মধ্যেই অবসন্ন হয়ে পড়েন। সেদিন থেকে তিনি একপ্রকার শিরঃপীড়ায় আক্রান্ত হন। প্রায়ই মাথা ধরত—মাথা ধরার জন্য কিছুদিন ধরে খুব কষ্ট পান। কপালের নিম্নভাগটায় সব সময়েই বেদনা অনুভব করতেন। একদিন শ্যামবাজারের এক আমন্ত্রণ রক্ষা করতে গিয়ে তিনি হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে পড়েন। মাঝে মাঝে জ্বর হতো। ঢাকায় Convocation-এ ডিগ্রী আনতে গিয়ে সাহিত্যিক অধ্যাপক চারু বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ীতে জ্বরে বিশেষ কাতর হয়ে পড়েন। সেখান হতে ফেরার পথে মাঝে মাঝে জ্বরে পড়তেন—শেষে অবিচ্ছেদ জ্বরে কিছুকাল শয্যাগত থাকেন। তাঁর জ্বর বিকোলাই ইনফেকশানের ফল বলে স্থির হয়। তাঁকে ম্যালেরিয়ায়ও ধরেছিল। আমরা বলতাম "আপনার সাধের সামতাবেড় হতেই এ ম্যালেরিয়া পেয়েছেন।" তিনি রাগ করে বলতেন, "সামতাবেড়ে ম্যালেরিয়া নেই—ম্যালেরিয়া কিছুতেই হতে পারে না, ম্যালেরিয়া যদি হয়েই থাকে তবে তোমাদের বালিগঞ্জেই ধরেছে।" সামতাবেড়ের কোন নিন্দা তিনি সইতে পারতেন না। যাই হোক—ম্যালেরিয়ার চিকিৎসাতেই তাঁর মাথাধরা ও রগের বেদনা দূর হয়ে যায়। Change-এ যাওয়া তিনি পছন্দ করতেন না—তবু ডাক্তারের পীড়াপীড়িতে কিছুদিনের জন্য তিনি দেওঘরে গিয়েছিলেন। ঔষধপত্রে তাঁর বিশ্বাস ছিল না—তবু ডাক্তারের নির্দেশে ঔষধপত্র যথেষ্ট খেয়েছিলেন, কিছুদিন কবিরাজী চিকিৎসাও করেছিলেন। তিনি বলতেন এই দুই বছরে আমার শরীরের ভিতর একটা প্রকাণ্ড ডিসপেনসারি গড়ে উঠেছে। মাঝে মাঝে জেদ ধরে বসতেন 'আর ওষুধ কিছুতেই খাব না।' কেউ তাঁকে ওষুধ খাওয়াতে পারত না। তাঁর বন্ধু ডাক্তার কুমুদশঙ্কর রায়ের উপর তাঁর অগাধ বিশ্বাস ছিল—শিশুকে আত্মীয়স্বজনেরা যেমন করে ভোলায় তেমনি করে তিনি শরৎচন্দ্রকে ভুলিয়ে আবার ওষুধ খাওয়াতেন।

জ্বর সেরে গেল, মাথার অসুখ সেরে গেল, কিন্তু শরীরের সামর্থ্য, সে স্বাস্থ্য

মনের সে প্রফুল্লতা আর ফিরল না। তার পর আশ্বিন মাস হতে নূতন ব্যারামের সূত্রপাত হলো, তারই পরিণতির ফলেই তাঁর জীবনাবসান। দুই বৎসর ধরে তিনি মনে মনে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন। তাঁর কথাবার্তায় এরূপ আভাস পাওয়া যেত। একটা মৃত্যুভয় তাঁর জীবনের স্বাভাবিক প্রফুল্লতার উপর ছায়াপাত করেছিল। এই মৃত্যুভয় দমন করবার শক্তিও তাঁর ছিল অসাধারণ। কোন দিন কথাবার্তায় তিনি সে ভয় প্রকাশ করেন নি।

মৃত্যুর কয়েক বৎসর আগে একদিন কথায় কথায় বলেছিলেন, "দেখ যারা অনেক টাকাকড়ি খরচ করে নানা প্রকার ধর্মাচরণ করে, তাদের বিশ্বাস স্বর্গ আছে, স্বর্গে গিয়ে পুরস্কার পাবে। আমার কোনও ধর্মাচরণ নেই, স্বর্গ নেই, সেদিক হতে কোন আশ্বাস বা সান্ত্বনা পাই না। আমার নরকও নেই—নরক ভয়ই মৃত্যু ভয়কে ভীষণ করে তোলে, আমার নরক ভয় নেই। পরলোকের জন্য প্রস্তুত হওয়ার জন্য তাই তাগিদও নেই। রবীন্দ্রনাথ যুগ-যুগান্তর লোকান্তরের পথে মহাযাত্রার কথা কাব্যে খুব লিখেছেন, জানিনে সত্যই তিনি তা বিশ্বাস করেন কিনা, আমার মনে হয় ওটা মৃত্যুভয় জয় করবার সাধনায় কবির একটি আত্মসান্ত্বনা মাত্র। মৃত্যুকে জীবদেহের অনিবার্য পরিণতি বলেই তাকে বরণ করে নিতে হবে। সেজন্য মনকে প্রস্তুত করবার প্রয়োজন আছে। মৃত্যুকে ভুলে থাকলে মন্দ হয় না—কিন্তু ভোলার তো উপায় নেই। প্রকৃতি ধাক্কা দিয়ে দিয়ে মনে পড়িয়ে দেয়। আমি ঐ অনিবার্য পরিণতির জন্য মনকে প্রস্তুত করেছি।"

এর দেড় বৎসর আগেকার কথা, শরৎচন্দ্র একদিন বললেন, "দেখ তোমরা কেবলই অনুযোগ কর, আর লিখছি না কেন? অনেক কিছু লেখবারই ইচ্ছে ছিল। মনে মনে যে কত প্লট তৈরী হয়ে আছে তা আর কি বলব। আজকালকার সাহিত্যিকদের মত তো আমার কলম এত চলে না যে তিনদিনে এক একখানা উপন্যাস লিখে ফেলব। আমি বড় ঢিমে লেখক, প্রত্যেক লাইনটা ওজন করে করে কেটে কেটে লিখি, মনে প্রফুল্লতা না থাকলে inspiration-এ এলে কলম একেবারে এগোয় না। মনে ইচ্ছে থাকলে কি হবে, শরীর আর বয় না; সামর্থ্য আর কুলোয় না, মনঃস্থির করতে পারি না। আর আমার দ্বারা কিছু হবে না হে। মৃত্যুর ডাক এসেছে তার জন্যই প্রস্তুত হচ্ছি। যথেষ্ট লিখেছি, আর না পারলেও দেশ আমাকে ক্ষমা করবে।"

এক বৎসর আগে ৩১শে ভাদ্র সন্ধ্যার সময়ে শরৎচন্দ্র আমাদের মজলিশে এলেন। আমি বললাম, "দাদা, আজ আপনার জন্মতিথি, আপনার দীর্ঘায়ু

কামনার জন্য আমরা আপনার বাড়ীতে যাচ্ছিলাম—আপনি নিজেই এসে হাজির হলেন যে!"

শরৎচন্দ্র দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে বললেন—ভাই আর যা কর, দীর্ঘায়ু কামনা যেন করো না। বরং কামনা করো আমার জীবনে ভাদ্র যেন না ফেরে। জরাজীর্ণ রুগ্ন দেহ নিয়ে দীর্ঘায়ু যে কি দণ্ড তা তোমরা বুঝবে না। বহুদিন তো বাঁচলাম, আর বেঁচে লাভ নেই—দেশেরও লাভ নেই।"

এই বৎসরের গোড়ার দিকে কোন-একখানি পত্রিকা শরৎচন্দ্রকে অতি কুৎসিৎ ভাবে আক্রমণ করেছিল। সেটা পড়ে তিনি ক্ষুণ্ণ হয়ে বলেছিলেন, "তরুণ লেখকদের লেখার তীব্র বিরুদ্ধ সমালোচনা হলে কিছু ফল হতে পারে। তাদের আঘাত সইবার ক্ষমতা আছে। আমার মত মৃত্যুপথযাত্রীকেও এ আক্রমণ কেন? আক্রমণ করে দুদিন পরেই তো অনুতাপ করতে হবে। এরা মহাকালের বিচারের উপর নির্ভর করতে পারে না, এদের ত্বরও সয় না, এরা ভাবে আমরা তাড়াতাড়ি একটা বিচার করে দিই; সেই বিচারটা মহাকাল স্বীকার করে নিতে বাধ্য। আমার দিন ফুরিয়ে এসেছে, যাবার আগে কারোর সঙ্গে বিবাদ করতে চাই না। যে যা বলুক, তোমরাও কোন প্রতিবাদ করো না। জীবনে এত ভালবাসা চারদিক থেকে পেয়েছি যে তার তুলনায় এরূপ এক-আধটা অপ্রীতিকর কথা একেবারেই গায়ে লাগে না!"

শরৎচন্দ্রের শেষ জন্মবাসরের কথা। শরৎচন্দ্রকে নিয়ে রেডিও স্টেশনে অনুষ্ঠিত শরৎ জন্মোৎসবে গেলাম। পথে শরৎচন্দ্র বললেন—"তোমরা আজকের অনুষ্ঠানে যোগদান করে ভালই করেছ, হয়ত এটাই আমার শেষ জন্মোৎসব।"

আমি বললাম—"দাদা, ও কথা বলবেন না। আপনার শরীর মেদবহুল নয়, Heart-এর condition ভাল, আপনার Blood Pressure নেই, diabetes নেই, শরীরে সাংঘাতিক কোন রোগ নেই, আপনি নিশ্চিত এখনও বিশ বছর বাঁচবেন।"

দাদা বললেন—"স্পষ্ট কোন রোগ আজকাল নেই, কিন্তু সব রোগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ রোগ যে জরা তাই সদলবলে আক্রমণ করেছে, বাইরে অনেক দিনই আক্রমণ করেছিল, এখন ভিতরেও সে আক্রমণ করেছে। ভিতরে ভিতরে বুঝতে পারছি, আর বেশীদিন নয়। মৃত্যু তো আমাদের সঙ্গে পরামর্শ করে তার কাজ করবে না, ভাই। সে যখন আসবে তখন এ দেহে বিনা সমারোহেই আসবে। তার ডাক আমি পেয়েছি।"

তিনি আরও বললেন—“দেখ, সাহিত্যিক শরৎচন্দ্রের মৃত্যু হয়েছে, এখন মরলে কোন দুঃখ নেই।”

ঠিক এমনি কথাই তিনি আর একদিন বলেছিলেন। জন্মদিনে সবাই যখন তাঁর দীর্ঘায়ু কামনা করে শুভকামনা জানালো, তখন তার উত্তরে তিনি বলেছিলেন —“সাহিত্যিক শরৎচন্দ্রের মৃত্যু হ'লে মানুষ শরৎচন্দ্রের বাঁচবার আর প্রয়োজন নেই। যতদিন সাহিত্যসৃষ্টির ক্ষমতা থাকবে, যতদিন দেশের লোকের রসতৃষ্ণা নিবারণ করতে পারব—ততদিনই যেন বাঁচি। আর পাঁচজনের মত সুস্থ দেহে শুধু খাওয়া-দাওয়া ও ঘুমানোর জন্যে তো বাঁচতে চাই না। রুগ্নজীর্ণ দেহ নিয়ে শুধু-শুধুই খাওয়া ও শুয়ে থাকার জন্ম তো বাঁচতে চাই না।”

আর একদিন বলেছিলেন—“দেখ, যারা পুত্রকন্যা-পৌত্র-দৌহিত্র আর অন্যান্য প্রিয়জন পরিবৃত, তাদের ইহলোক ছেড়ে যাওয়া বড়ই কষ্টকর। যারা প্রচুর ধন-সম্পদ অর্জন করে, ঐশ্বর্যের ক্রোড়ে নিশ্চিন্ত জীবন ভোগ করছে তাদেরও এ জগৎ নিশ্চয়ই ছেড়ে যেতে খুব কষ্ট হয়। আমার সে বালাই নেই—সে মমতাও নেই। তবে এই বাংলাদেশটাকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসতাম। এদেশটা ছেড়ে স্বর্গ যদিও থাকত তাহলেও স্বর্গে যেতেও ইচ্ছা হয় না। এই বাংলার মমতা মনটাকে মাঝে মাঝে বড় দুর্বল করে দেয়।”

ক্রমে শরৎচন্দ্র শয্যাগত হয়ে পড়লেন। আমরা প্রায় প্রত্যহই তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যেতাম। মৃত্যু যে আসন্ন তা তিনি বুঝতেও পেরেছিলেন। মাতুল সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় স্তোকবাক্যে আশ্বস্ত করতেন—“অপারেশন করলেই সেরে যাবে।”

শরৎচন্দ্র বলতেন—“ওকথা ওপরে গিয়ে বলো। আমাকে ভুলোবার চেষ্টা করো না।”

আমাদের বলতেন—“জীবের যা অনিবার্য পরিণতি তাই ঘটবে। তার জন্ম আক্ষেপ নেই। তবে এরা আমাকে আরও কিছুকাল যন্ত্রণা না দিয়ে মরতে তো দেবে না।”

শরৎচন্দ্রের তিরোধানে

রস-রক্তহীন জীর্ণ রোগ-শুষ্ক পঞ্জর তোমার
দহিয়াছে বৈশ্বানর। ও জীবনে যাহা কিছু সার
যাহা কিছু বিধাতার অপার্থিব সুদুর্লভ দান
লভিয়াছে বিশ্বনর। সুধাটুকু করিয়াছে পান
আকণ্ঠ নিঃশেষে তারা। তীব্র বিষ-জ্বালায় জর্জর
শূন্য রিক্ত মৌন মূক চঞ্চুক্ষত-লাঞ্ছিত পিঞ্জর
ভ্রান্তিভরা দেহখানি সঁপিয়াছে চিতাহুতাশনে
মধুরিক্ত হৃতগন্ধ শুষ্কদল পুষ্পরাশি সনে।
বাহ্য সত্তা দগ্ধ তব নিত্য সত্তা দাহ্য কভু নয়,
চিত্তাকাশে পূর্ণচন্দ্ররূপে তাহা রহিল অক্ষয়
শোকের তমিস্র হরি'। নাই বন্ধ নাই কোন ক্ষোভ,
তব বিষ-জীর্ণ দেহে এ দেশের নাই আর লোভ॥

সান্ত্বনা পায় না মন এ কথায়। ছিল প্রিয়তম,
তোমার ও তনুখানি ধ্বস্ত জীর্ণ বোধিক্ষেত্র সম
ভক্তির পাবনধাম। প্রীতিঘন তব আচরণ
মধুর চাহনি তব, মধুময় তোমার বচন,
তব সঙ্গ, তব রঙ্গ, স্নেহভরা তব আশীর্বাদ
তব উপদেশামৃত, তব হাস্য, তোমার প্রসাদ
সবই যে চলিয়া গেল। তা যে কত মহামূল্য ধন
আজিকে ভাবিতে তাই মুহুর্মুহুঃ তিতিছে নয়ন॥

এই তব মাতৃভূমি। এর সারা অঙ্গটি ব্যাপিয়া
ছিলে তুমি এতদিন। মনঃপ্রাণ নিঃশেষে সঁপিয়া
ইহারে বাসিলে ভাল। প্রীতিভরা এর প্রতিদান
এর প্রতি লতা তরু, এর প্রতি পাখীটির গান।
এর প্রতি ধূলিকণা, বারি বিন্দু, প্রতি তৃণাঙ্কুর
লাগিল তোমার কাছে অপরূপ। চন্দন-মধুর
এর প্রতি স্পর্শখানি তব তপ্ত হৃদয় জুড়ালো,
প্রতি প্রাণীটিরে এর প্রাণ দিয়ে বেসেছিলে ভালো॥

প্রতিদানে অবিরল প্রীতিধারা যা পেয়েছ তুমি
কোথায় মিলিবে তাহা ? দিয়াছে যা তোমা মাতৃভূমি
পাবে না পাবে না, বন্ধু, কোন স্বর্গে কোন পরলোকে।
তারে ছেড়ে যেতে অশ্রু হে দরদী ঝরেনি কি চোখে ?
হৃদয়ে হৃদয়ে বাঁধা শত পাকে, সহস্র বন্ধনে
নিসর্গে, সংসারে, ভক্ত বন্ধু-সঙ্ঘে, জাতীয় জীবনে
ছিলে তুমি, একে একে সে বাঁধন ছেদিবারে, আহা
কি যে ব্যথা পেলে তুমি, ভিষকেরা জানিল কি তাহা ?
দেহ নিয়ে ব্যস্ত তারা, রাখে না তো মর্ম্মের সন্ধান।
তব মর্ম বুঝি মোরা,—তাই আজি কেঁদে উঠে প্রাণ ॥

ধরারে বাসেনি ভাল পায়নি ধরার ভালবাসা
তোমার মতন যেবা, তার কিবা আসক্তি বা আশা
ধরার ধূলার প্রতি ? এ ধরণী তব বৃন্দাবন,
মাথুর-যাত্রায় তব তাই মোরা আতুর এমন ॥

এই তব কীর্তিভূমি। মহাব্রত করি' উদ্‌যাপন
হেথায় লভিলে তুমি চিত্তরাজ্যে হেম-সিংহাসন
গৌরব-প্রতিষ্ঠা পূজা মান যশ রাজশ্রী সম্পদ,
যাহা কিছু কাম্য বিশ্বে। সুরেন্দ্রও ত্যজি' ইন্দ্রপদ
চাহিবে এ কীর্তি-স্বর্গ। লক্ষ বন্দী গাহিছে বন্দনা,
আলোড়িত করে ব্যোম তব জয়ধ্বনির মূর্চ্ছনা
উড়ে কীর্তি বৈজয়ন্তী সাফল্যের চূড়ান্ত সীমায়,
ফেলি' সর্ব সমারোহ অকস্মাৎ লইলে বিদায়।
সবই স্বপ্ন। সব মায়া! অনিবার্য এই অবসান।
তবু আজি তাই ভাবি' বার বার কেঁদে উঠে প্রাণ ॥

আজি মনে হয়, বন্ধু, কি বেদনা পেলে নাহি জানি
স্বর্গাদপি গরীয়সী মাতৃভূমি কীর্তিভূমিখানি
ছাড়িয়া বিদায় নিতে। দিন দিন লক্ষ লক্ষ লোক
চলে যায় মহাপথে, তাহাদের তরে বৃথা শোক!
তা'দের এ বিশ্বলোকে কি সম্পদ আছে হারাবার
অখ্যাত জীবনে, বন্ধু ? পরিপূর্ণ সৌভাগ্য-ভাণ্ডার

ফেলিয়া কোথায় গেলে? বিশ্বপানে সতৃষ্ণ নয়নে
চাহিতে চাহিতে তুমি চ'লে গেলে নিঃশব্দে কেমনে
সংবরি' অগাধ ব্যথা? তার কাছে মৃত্যুর যন্ত্রণা
হয়ত নগণ্য তুচ্ছ। জানি নাকো হায় কি সান্ত্বনা
দিলে তুমি আপনারে। ধীরে ধীরে বরিলে মরণ
সমরে বীরের মত? বিধাতার চরণে শরণ
অথবা লভিলে তুমি? মরণের পরপার থেকে
পেলে কি আশ্বাস-বাণী? স্নেহভরে কেহ তোমা ডেকে
বলিল কি "তুচ্ছ, অই ধরিত্রীর সকল বৈভব,
এখানে মিলিবে, বৎস, দিব্যানন্দ দেবতা-দুর্লভ
অক্ষয় অমৃত ধন? যোগী নহ, করনি সাধনা
সে ধনের লাগি তুমি। তাই ভাবি হায় কি বেদনা
পেলে তুমি তেয়াগিতে মাতৃ-অঙ্ক এই কীর্তিলোক,
আজি তাই ভাবি শুধু বার বার জলে ভরে চোখ॥

বৃথা ব্যথা পাই মোরা, হয়ত বা স্মরিয়া তোমার
শিরীষ-পেলব চিত্ত। হয়ত বা হ'য়ে বজ্রসার
মৃত্যুরে বরিলে তুমি অনিবার্য পরিণতি বুঝি'
ভৌতিক এ দেহটার। শাস্ত্রতন্ত্র গ্রন্থরাজি খুঁজি'
পাই নাক যে আত্মিক সাধনার কোনই উদ্দেশ
তোমার বাণীর মাঝে নাই যা'র ইঙ্গিতের লেশ,
হয়ত তাহাই ছিল প্রচ্ছন্ন তোমার মর্ম তলে
হয়ত নিভৃতে তাই পালিয়াছ তুমি পলে পলে
তিলে তিলে। জানি মোরা একজন আছিল উদাসী
তোমার হৃদয়-কুঞ্জে হাসিত সে উপেক্ষার হাসি—
গাহিত বাউল গান বাজাইয়া গোপীযন্ত্রখানি
সহজিয়া রাগভরে। সব মায়া-মরীচিকা জানি'
মৃত্যুরে করিয়া ব্যঙ্গ জীবনেরে করি' পরিহাস
হে বাউল গেলে চলি'। বৃথা মোরা করি হা-হুতাশ
বেদনার কথা তুলি'। দিয়ে গেলে যে শোক বেদনা
তার শতগুণ তুমি রেখে গেছ অমৃত সান্ত্বনা॥

জীবন ও চরিত্র

শরৎচন্দ্রের সঙ্গে কথাবার্তায় তাঁর জীবনের কথা যা জানতে পেরেছি তা সংক্ষেপে বিবৃত করি। ইং ১৮৭৬ সালে ১৫ই সেপ্টেম্বর (বাংলা ১২৮৩ সালের ৩১শে ভাদ্র) শরৎচন্দ্রের জন্ম হয়। হুগলী জেলার দেবানন্দপুর গ্রামে তাঁর পিতৃভূমি ও জন্মস্থান। এই সেই দেবানন্দপুর, যেখানে একদিন কিশোর ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর পনেরো বৎসর বয়সে সত্যনারায়ণের পাঁচালী রচনা করে গ্রামবাসীদের শুনিয়েছিলেন। এখন দেবানন্দপুর যেমন আধা শহর হয়েছে—শরৎচন্দ্রের বাল্যকালে তা ছিল না—গ্রামটা অজ পাড়াগাঁই ছিল। শরৎচন্দ্রের পিতার নাম মতিলাল চট্টোপাধ্যায়। মতিলাল মহাকুলীন ছিলেন। কৌলীন্য ছাড়া তাঁর বোধহয় আর কিছুই সম্বল ছিল না। 'বামুনের মেয়ে'র লেখক শরৎচন্দ্র কৌলীন্যের গর্ব করতেন না—বরং কৌলীন্য প্রথাটিকে বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ্য-সমাজের কলঙ্ক বলেই মনে করতেন। মতিলালের সাতটি সন্তানের মধ্যে পাঁচটি জীবিত ছিল—তিন পুত্র ও দুই কন্যা। শরৎচন্দ্রই জ্যেষ্ঠ।

শরৎচন্দ্র পল্লীর পাঠশালাতেই বিদ্যাশিক্ষা শুরু করেন। পাঠশালাতে পড়বার সময় থেকেই তিনি অস্থির চঞ্চল ও অনাবিষ্ট ছিলেন—আদৌ নিয়মনিষ্ঠ বা শাসন-বাধ্য ছিলেন না। 'রামের সুমতি'র রামের সঙ্গে তাঁর চরিত্রের যেন আংশিক মিলও ছিল। দেবানন্দপুরে বাল্যে দেবদাসের মত তিনি প্রকৃতির দুলালই ছিলেন। সে সময়ের সঙ্গী-সঙ্গিনীদের দু-একজনকে তাঁর রচনায় নিশ্চিত পাওয়া যায়। তিনি বলতেন—"আমি দেবানন্দপুরে শুধু বাল্যকালেই ছিলাম। তখন আমাদের সামাজিক জীবন সক্রিয় ভাবে চিনবার বুঝবার বয়স নয়। আমার মনটা ছিল আয়নার মত। তাতে আপনা থেকেই সে সব চিত্র প্রতিবিম্বিত হয়েছিল। আশ্চর্যের বিষয় আমার সরল মনে সেই প্রতিবিম্বগুলো চিরস্থায়ী হয়ে গিয়েছিল, পরের জীবনে সেইগুলোই তো আমার উপন্যাস লেখার প্রধান সম্বল হয়েছে। আমি আমার সাহিত্যজীবনের জন্যও দেবানন্দপুরের কাছেই সবচেয়ে ঋণী।"

সত্যই দেবানন্দপুর অঞ্চলের আবহাওয়া ও মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত ভদ্র জাতির সামাজিক জীবনই তো শরৎচন্দ্রের সাহিত্যের প্রধান উপাদান। বালক মনের ইমেজারিগুলিকেই আমরা বহু সরস চিত্ররূপে তাঁর পুস্তকে দেখতে পাই।

বাল্যবয়সে মনে হয় সবচেয়ে চোখে পড়ে নারীদের আচার-আচরণ। বাঙ্গালী পল্লীবাসিনীদের যে চিত্র ও চরিত্র তিনি দেবানন্দপুরে দেখেছিলেন, তাই তাঁর রচনায় বাণীরূপ লাভ করেছে।

দেবানন্দপুর থেকে শরৎচন্দ্র গেলেন ভাগলপুরে উচ্চতর শিক্ষার জন্য। ভাগলপুরে ছিল শরৎচন্দ্রের মামার বাড়ী ও পিসীর বাড়ী। সেখানকার বিখ্যাত গাঙ্গুলী বংশই শরৎচন্দ্রের মাতুল বংশ। বিখ্যাত সাহিত্যিক উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, গিরীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় শরৎচন্দ্রের বয়ঃকনিষ্ঠ মাতুল (মায়ের খুড়তুতো ভাই)। এখানে এসে শরৎচন্দ্র হাইস্কুলে ভর্তি হন। মধ্যে এক বৎসর তিনি হুগলী ব্রাঞ্চ স্কুলে পড়েছিলেন। ভাগলপুরে এসে শরৎচন্দ্রের বালক সুলভ উচ্ছৃঙ্খল ভাব কমবার কথা! কিন্তু না কমে, তা বেড়েই গেল। এখানে শরৎচন্দ্র পেলেন বিরাট গঙ্গানদী। এই গঙ্গার উপর ছোট ডিঙ্গিতে তাঁর অনেক সময় কাটত—'শ্রীকান্তে' প্রমাণ আছে। এখানে তিনি যাঁর শিষ্যত্ব লাভ করেছিলেন তিনি (রাজেন্দ্র) শ্রীকান্তে ইন্দ্রনাথের রূপে অমরতা লাভ করেছেন। বর্ষার ভরা গঙ্গায় ডিঙ্গিতে শরৎচন্দ্র হতেন এই ইন্দ্রনাথেরই সঙ্গী।

রাজেন্দ্র এখানে নিম্নশ্রেণীর লোকেদেরও রোগের শুশ্রূষা করতেন। প্রয়োজন হলে তাদের মৃতদেহের সৎকারও করতেন। খাওয়াদাওয়ার তাঁর কোন আচার-নিয়ম ছিল না। বাঁশী বাজানো, গান গাওয়া, বন বাগানে ঘুরে বেড়ানো পড়াশোনার চেয়ে তাঁর বেশী ভাল লাগত।

ছাত্র হিসাবে শরৎচন্দ্র ছিলেন দুরন্ত ও পাঠে অনাবিষ্ট। আত্মীয়স্বজন এতে বিরক্ত ও কুপিত হতেন। কিন্তু গুরুজনের ভ্রূকুটির অগোচরে বাংলা সাহিত্যের পরমৈশ্বর্য এতে তাঁর জীবনে আস্তে আস্তে সঞ্চিত হচ্ছিল।

যাই হোক, হেলায়-শ্রদ্ধায় দ্বিতীয় বিভাগে এনট্রান্স পাশ করে তিনি এফ-এ পড়তে আরম্ভ করলেন। তখন নতুন উপসর্গ জুটল। শরৎচন্দ্র থিয়েটার নিয়ে মাতলেন ও সাহিত্যচর্চা শুরু করলেন। তাঁর এখনকার সাহিত্যচর্চা হাতে লেখা 'ছায়া' নামে মাসিকপত্রে। এতে তাঁর মাতুলরাও যোগ দিয়েছিলেন। বহরমপুরের নফর ভট্ট তখন এখানে সরকারী কর্মচারী ছিলেন—তাঁর পুত্র সাহিত্যিক বিভূতি ভট্ট (পুঁটু বাবু) ও কন্যা প্রসিদ্ধ-সাহিত্যসেবিকা নিরুপমা দেবীরও এতে যোগ ছিল। যোগেশ মজুমদার, সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ও এতে যোগ দিয়েছিলেন। শরৎচন্দ্র সকলের নেতা ছিলেন। ছাত্রজীবনেই তিনি একটি সাহিত্যিক-গোষ্ঠী রচনা করেছিলেন। পরবর্তী জীবনে রচনায় প্রেরণাদানের জন্য তাঁদের সকলকে শরৎচন্দ্র একটা ক'রে ফাউন্টেন পেন উপহার দিয়েছিলেন।

শরৎচন্দ্র যদি শুধু এই নিয়েই থাকতেন—তা হলে গোল হ'ত না। কিন্তু তিনি ইন্দ্রনাথের দীক্ষামন্ত্র ভোলেন নি। তথাকথিত সদব্রাহ্মণ্য সমাজবিরুদ্ধ অনেক কাজেই তাঁর যোগ ছিল। চিরদিনই তিনি বিদ্রোহী। ব্রাহ্মণ্যসমাজের চেয়ে তিনি মানবসমাজকে বড় মনে করতেন। এর ফলে শোনা যায় তিনি আত্মীয়দের বড়ই অপ্রিয় হয়ে উঠলেন। সমাজের লোকও তাঁকে অপাংক্তেয় বলে মনে করতেন। শরৎচন্দ্র কিন্তু কোনদিন তাঁর আত্মীয়দের নিন্দা করেন নি।

তিনি বলতেন—"আমি মাতুলবংশে নাতিদের মধ্যে সকলের বড় ছিলাম। কাজেই আমার আদর যথেষ্টই ছিল। কিন্তু আমি তাঁদের আদরের মর্যাদা রাখিনি। তাঁদের আমি সর্বদাই বিব্রত করে তুলতাম। তাঁদের ধৈর্যেরও একটা সীমা আছে। তা আমি কোনদিন ভেবে দেখিনি। তাঁদের দোষ নেই, দোষ আমার ছন্নছাড়া স্বভাবের।"

এই ছাত্রদশাতেই শরৎচন্দ্রের অনুপমার প্রেম, অভিমান, কাশীনাথ, দেবদাস, বড়দিদি ইত্যাদি গ্রন্থ রচিত। এ সবের পাণ্ডুলিপি যে বেপরোয়া শরৎচন্দ্র রক্ষা করেছিলেন—সেটাও একটা বিস্ময়ের ব্যাপার। সম্ভবতঃ মাতুলরাই এগুলো যত্ন করে রেখেছিলেন।

ক্রমে এফ-এ পরীক্ষা আসন্ন হল। এজন্য শরৎচন্দ্র রীতিমত প্রস্তুত হন নি। পরীক্ষার পূর্বে একদিন সহসা তিনি ভাগলপুর ত্যাগ করে চলে গেলেন। কুড়ি টাকা ফিয়ের অভাবে তাঁর পরীক্ষা দেওয়া হয়নি ব'লে জনশ্রুতি আছে। তবে একথা বিশ্বাস করতে প্রবৃত্তি হয় না। পরীক্ষা না দেওয়ার অন্য কারণও নিশ্চয়ই ছিল।

এই সময়ে তাঁর মাতৃবিয়োগ হয়। মাতার মৃত্যুতে ভাগলপুরের সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধও শিথিল হয়ে পড়ে। দারিদ্র্যের তাড়নায় তাঁকে অর্থার্জনের চেষ্টা তখনই করতে হয়েছিল।

রাজবাসলী এস্টেটে শিবশঙ্কর সাহুর অধীনে তিনি প্রথমে একটা কাজ পান। এখানে থাকতে থাকতেই তাঁর নতুন শখ জন্মে। এ সখ শিকারের সখ। শ্রীকান্তে এর ইঙ্গিত আছে। এখানেও তিনি বেশি দিন থাকতে পারলেন না। এবার তিনি সন্ন্যাসী হয়ে দেশভ্রমণে বার হলেন। বোহিমিয়ান শরৎচন্দ্র ঘুরতে ঘুরতে এলেন মজঃফরপুরে। এখানে তিনি নাম ভাঁড়িয়ে বাস করেছিলেন। সন্ন্যাসী হ'লেও তাঁর গান-বাজনার দক্ষতার জন্য তিনি সেখানকার বাঙালী-সমাজে সুপরিচিত হন। ক্রমে তাঁর আসল পরিচয় প্রকাশ পায়। অনুরূপা দেবীর স্বামী শেখরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এখানকার সুপ্রসিদ্ধ উকিল ছিলেন। শরৎচন্দ্র

তাঁর বিশেষরূপ প্রীতির পাত্র হন। অনুরূপা দেবীর কথায় জানা যায় যে, তাঁদের বাড়ীতেই তিনি কিছুদিন আশ্রয় পেয়েছিলেন।

এখানে থাকতে মহাদেব সাহু নামে একজন সৌখীন জমিদারের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা হয়। সাহুর গানবাজনার শখ ছিল খুব। এখানে শরৎচন্দ্র যে ভাবে জমে গিয়েছিলেন—তাতে তাঁর অন্যত্র চলে যাবার সম্ভাবনা ছিল বলে কারো মনে হয় নি। এই সাহুমশায়কেই আমরা পাই শ্রীকান্তের কুমারসাহেবের ভূমিকায়। এখানে থাকতেই শুনলেন তাঁর পিতৃবিয়োগ ঘটেছে। একথা শুনে তিনি বিচলিত হয়ে পড়লেন—তাঁর যেন সহসা স্বপ্নভঙ্গ হ'ল। তিনি এখান থেকে হঠাৎ একদিন চলে গেলেন কলকাতায়।

কলকাতায় মাতুল লালমোহন গঙ্গোপাধ্যায়ের বাড়িতে এসে চাকরির খোঁজ করতে লাগলেন—কিন্তু চাকরি মিলল না। তিনি এখানে এসেও শখের থিয়েটারে যোগ দিয়েছিলেন। তারপর একদিন হঠাৎ তিনি এখান থেকে চলে গেলেন বর্মায়।

রেঙ্গুনে নেমে তিনি কোয়ারিণ্টিনে কয় দিন থেকে, অনেক খোঁজ করে অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়ের বাড়িতে গিয়ে উঠলেন। অঘোরবাবু ছিলেন রেঙ্গুনের একজন এ্যাডভোকেট। তিনি ছিলেন শরৎচন্দ্রের সম্পর্কে মেশোমশায়। এটা ১৯০২ সাল।

অঘোরবাবু বর্মা রেলওয়ে আপিসে তিরিশ টাকা মাইনের একটা কাজ শরৎচন্দ্রের জন্যে যোগাড় করে দিলেন। শরৎচন্দ্র তাঁর বাড়ীতেই থেকে দেড় বছর এই কাজ করেছিলেন। এখানে থেকে তিনি আইন পাশ করবার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু বর্মী ভাষায় পাশ করতে পারলেন না বলে তাঁর উকিল হওয়া চলল না।

এরপর তিনি একটা চালের আড়তে কিছুদিন কাজ করেন—অবশ্য 'মেজদিদি'র কেষ্টোর মত নয়, কেরাণী হিসাবে। একাজ তাঁর ভালো লাগল না। একাজ ছেড়ে তিনি চলে গেলেন পেগুতে। এখানে এসে গানবাজনা আমোদ-প্রমোদে বাঙ্গালীদের তিনি মাতিয়ে তুললেন। কাজেই একটা কাজ পেতে দেরী হল না। এখানে এন. কে. মিত্রের বাড়ীতে থাকতেন। তাঁর অনুরোধে তাঁর ভ্রাতা এম. কে. মিত্র (Deputy Examiner, Public Works Accounts) তাঁকে তাঁর আফিসে একটা অস্থায়ী কাজ ক'রে দিলেন। শরৎচন্দ্র রেঙ্গুনে ফিরে এলেন। এ চাকরির মাইনে হল তিরিশ টাকা। তাঁর মাসীর বাড়ীতে আর তাঁর স্থান ছিল না। এখানে কিছুদিন থাকার পর পেগুর Executive Engineer-এর অফিসে ১৯০৫ সালে পঞ্চাশ টাকা মাইনের একটা চাকরি পেলেন। আড়াই বছর তিনি এ চাকরিতে ছিলেন। এ চাকরিও তাঁর যায়, কারণ এও ছিল অস্থায়ী।

এরপর তিনি কিছুদিন বেকার বসে ছিলেন। তারপর ১৯০৬ সালে Examiner Public Account Office-এ পঞ্চাশ টাকা বেতনের চাকরি পান। ঐ বছরই তাঁর বেতন হয় পঁয়ষট্টি টাকা। এক বছর পরে আশি টাকা, ১৯০৯ সালে হয় নব্বুই টাকা। এটাই শেষ সীমা। ১৯১৬ সালে যখন তিনি বর্মা ত্যাগ করেন তখনও তাঁর এই বেতন ছিল। বরাবর তিনি অস্থায়ী ভাবেই কাজ করেছেন—পাকা চাকরীর জন্য তিনি আবেদনও করেছিলেন। কিন্তু তাঁর বয়স ত্রিশ উত্তীর্ণ হয়ে যাওয়ার জন্য তা পান নি। চাকরিতে তাঁর মন বসেনি; কেবল দিন গুজরানের জন্য চাকরী করতেন। Public Works Accounts-এর Examiner-এর অফিস ১৯১১ সালে Accountant General-এর অফিসের অঙ্গীভূত হয়ে যায়। Accountship পরীক্ষায় পাশ করতে পারলে তাঁর উন্নতি হত। কিন্তু তিনি সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারলেন না। তখন অবশ্য তিনি পুরাদস্তুর সাহিত্যিক। সাহিত্যসেবায় এমনই যশগুণ যে চাকরির উন্নতির কথা তিনি ভাবতেই পারতেন না।

তাছাড়া বর্মায় তাঁর শরীর একেবারেই ভালো থাকত না। প্রধান অসুখ বদহজম। এর জন্য বর্মার জলবায়ুই শুধু দায়ী নয়; তিনি শরীরের যত্ন করতেন না, খাওয়া-শোওয়ার নিয়ম মেনে চলতেন না, নিয়মিত ও মিতাচারী হয়ে চলার অভ্যাস তাঁর জীবনে কোনদিনই ছিল না। মাঝে মাঝে ছুটি নিয়ে কলকাতায় আসতেন চিকিৎসার জন্য। বর্মায় তিনি পদ্মপত্রের জলের মতই ছিলেন। বর্মায় থাকতে কোনদিনই তাঁর দারিদ্র্যও ঘোচেনি। গোড়ার দিকে পরের বাড়ীতে থাকতেন—শেষটা স্বাধীনভাবেই থাকতেন। কিন্তু ঠিক বাসা বাঁধেননি—হোটেল থেকে ভাত আনিয়ে খেতেন। আফিম খেতেন আর বারবার চা খেতেন। বর্মায় তিনি যা রোজগার করতেন তাতে একজনের স্বচ্ছন্দে চলে যেত, কিন্তু ঐ সামান্য সম্বল থেকে তিনি পরের জন্য যথেষ্ট ব্যয় করতেন। তাঁর হৃদয় ছিল বরাবরই দয়ার্দ্র। কারো দুঃখকষ্ট দেখলে নিঃসম্বল হয়ে সব বিলিয়ে ফেলতেন। তিনি ছিলেন চির মুসাফির, চির বাউল।

বর্মায় থাকতেও তিনি অবসরকালে গান-বাজনা ও শখের থিয়েটার নিয়ে কাটাতেন। বাঙ্গালী সমাজে তিনি নবজীবন সঞ্চার করেছিলেন। বর্মায় মাঝে মাঝে প্লেগ হ'ত, তিনি প্লেগের রোগীর সেবা করতেন। যে কেউ বিপন্ন হলেই তিনি আগে গিয়ে পাশে দাঁড়াতেন। শব-সৎকারের প্রয়োজন হলে তিনি হতেন অগ্রণী। সব সময়েই যে তিনি ভদ্র-সমাজের সঙ্গে মিশতেন তা নয়, নিম্নশ্রেণীর বাঙ্গালী, বিশেষতঃ মিস্ত্রীদের সঙ্গেও তিনি যোগাযোগ রাখতেন।

তাদের পরিবারিক জীবনের চিত্রও তাই আমরা তাঁর বইয়ে পেয়েছি। শ্রীকান্তে যে মিস্ত্রীপল্লীর বর্ণনা আছে, সেই মিস্ত্রীপল্লীতেও তিনি কিছুকাল ছিলেন। এখানে তিনি দাঠাকুর বলে সম্মানিত হতেন। কারখানার লোকদের দরখাস্ত চিঠিপত্র ইত্যাদি তিনি লিখে দিতেন। তাদের নৈতিক চরিত্র খুব শিথিল—সে শিথিলতার চিত্রও শ্রীকান্তে বর্ণিত হয়েছে। এখানে গরীবদের তিনি হোমিওপ্যাথিক ঔষধ বিতরণ করতেন। ভাগলপুরে শরৎচন্দ্রের নাম ছিল ন্যাড়া, এখানে পাগলা শরৎ। রেঙ্গুনে থাকার সময়ে তিনি এক বর্মী চিত্রকরের কাছে ছবি আঁকাও শিখেছিলেন। নিজের ঘরটি নিজের আঁকা ছবিতে সাজিয়ে রাখতেন।

জীবজন্তুর প্রতি শরৎচন্দ্রের প্রীতি ছিল অসাধারণ। ইতর জীবের দুঃখ তিনি সইতে পারতেন না। মানুষের চেয়েও ইতর জীবের প্রতি দরদ ছিল তাঁর বেশি। তিনি বলতেন—"দেখ, মানুষের বুদ্ধি আছে—সে কথা বলতে পারে। বেদনার কথা জানাতে পারে। অবোলা জীবদের সে সুবিধা নেই। তাই তাদের প্রতি আর শিশুদের প্রতি আমার মমতা বেশি।"

এখানে থাকতে তিনি একটা পাখী পুষেছিলেন, তাকে পুত্রস্নেহে পালন করতেন। তার মৃত্যু হলে তিনি পুত্রবিয়োগের ব্যথা পেয়েছিলেন এবং তার শ্রাদ্ধ পর্যন্ত করেছিলেন। পরে তিনি আর একটা কুকুর পোষেন, এই কুকুরটিই ছিল তাঁর পুত্রস্থানীয়।

বর্মায় থাকতে তিনি অনেক পড়াশুনো করেছিলেন। শরৎচন্দ্র ইউরোপীয় সাহিত্যের বই বেশি পড়েন নি। তিনি বলতেন—তিনি philosophy আর sociology-এর বই পড়তেন খুব বেশি। Herbert Spencer তাঁর প্রিয় ছিল। 'হিন্দু-সমাজের মূল্য' লিখবার জন্য মনুসংহিতা যত্নের সঙ্গে তিনি অধ্যয়ন করেছিলেন। Sociology-এর বই পড়ার প্রত্যক্ষ ফল 'নারীর মূল্য' (বেনামীতে ছাপা) ও 'সমাজের মূল্য'। সমাজের মূল্য প্রবন্ধাকারেই থেকে গিয়েছে, বই-এর আকারে বেরোয় নি। Sexual Psychologyর অনেক বইও তিনি এখানে থাকতে পড়েছিলেন।

বর্মায় থাকার সময়ে তাঁর লেখা 'বড়দিদি' বেনামীতে 'ভারতী'তে প্রকাশিত হয়। তা পড়ে লোকে বুঝতে পারল যে, একজন অসাধারণ সাহিত্যিকের আবির্ভাব ঘটেছে। শোনা যায় রবীন্দ্রনাথ এ লেখার খুব তারিফ করেছিলেন। অথচ এই বই তাঁর ছাত্র-জীবনের লেখা। ফণীন্দ্রনাথ পাল ছিলেন 'যমুনা'র সম্পাদক। তিনি যমুনার জন্য অনবরত লেখার তাগিদা দিতেন। তার ফলে, গোড়ার দিকে তাঁর বহু লেখা যমুনায় প্রকাশিত হয়। যমুনায় শরৎচন্দ্র নিজের নামেই লেখা দিতেন—

তখন তাঁর সঙ্কোচ কেটে গিয়েছে। যমুনায় তাঁর লেখা প্রকাশের পর থেকে তাঁর নাম-যশ দেশময় ছড়িয়ে পড়ে। তাতে তাঁর আর্থিক সুবিধা কিছু হয় নি।

এরপরই তাঁর 'ভারতবর্ষে'র সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন হ'ল। 'যমুনা'য় বোঝা, রামের সুমতি, বিন্দুর ছেলে, পথনির্দেশ প্রকাশিত হয়। পরে নারীর মূল্য (বেঁনামীতে) ও চরিত্রহীন প্রকাশিত হয়। ভারতবর্ষে প্রথম প্রকাশিত 'বিরাজ বৌ'। ভারতবর্ষের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপিত হওয়ার পর তিনি বুঝলেন যে, লেখার উপর জোর দিলে উদরান্নেরও সংস্থান হতে পারে এবং বর্মা ত্যাগ করার সুবিধা হ'তে পারে।

কিন্তু তখনও তাঁর লেখার আর্থিক মূল্য খুব বেশী বলে স্বীকৃত হয় নি। তাঁর দারিদ্র্যের জন্য এবং নিজের শক্তির উপর পূর্ণ বিশ্বাস না থাকায় তিনি কোন-কোন পুস্তকের স্বত্ব পর্যন্ত স্বল্প মূল্যে বিক্রয় করে ফেলেন। তখন পর্যন্ত দেশে সৎসাহিত্যের আর্থিক মূল্য ছিল যৎসামান্য। বর্মায় থেকে তিনি বুঝতেও পারতেন না যে, ক্রমে সৎসাহিত্যের মূল্য বাড়ছে এবং তাঁর লেখার কত আদর হচ্ছে দেশে। তিনি যশের জন্য ব্যস্ত ছিলেন না—দারিদ্র্যমোচনের জন্য, বিশেষতঃ বর্মা পরিত্যাগের সঙ্গতির জন্যই তখন ব্যস্ত ছিলেন।

এই সময়ে তিনি প্রকাশককে যে চিঠিগুলি লিখতেন, সেগুলি প্রকাশিত হয়েছে। সে চিঠিগুলিতে কত দৈন্য, কত সঙ্কোচ, কত কাতরতা ও কত কৃতজ্ঞতাই না প্রকাশ পেয়েছে! আজ সেগুলো পড়ে যেমন বেদনা বোধ হয়, তেমনি হাসিও পায়। তখনকার প্রকাশকরা আবার গর্বও ক'রে থাকেন—"আমরাই শরৎচন্দ্রকে প্রতিষ্ঠিত করেছি।"

বহু দিন পরে একদিন আমি সে প্রসঙ্গ তুলে বলেছিলাম—"দাদা, আপনার গোড়ার দিকের প্রকাশিত বইগুলোই তো সহস্র সহস্র বিক্রী হচ্ছে।"

তাতে তিনি উত্তর দিয়েছিলেন—"আরে আমি যে প্রত্যেক চিঠিতে হরিদাসকে সহস্র সহস্র আশীর্বাদ করেছিলাম। ব্রাহ্মণের আশীর্বাদ যাবে কোথায়?"

এর মধ্যে গভীর শ্লিষ্ট কারুণ্য নিহিত আছে।

বর্মায় থাকবার সময়ে মাইনেতে কুলোয় না বলে তিনি একখানা চায়ের দোকানও খুলেছিলেন। হিসাব রাখার বেশ একটা ফন্দী তিনি বার করেছিলেন। এক টিন দুধে কয় পেয়ালা চা হয় তার হিসাব করে খালি টিন দেখে তাঁর ভারপ্রাপ্ত লোকের কাছে দৈনিক হিসাব নিতেন।

আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম—"কবি নবীন সেন বর্মায় ছিলেন—তাঁর সঙ্গে আপনার নিশ্চয় পরিচয় হয়েছিল?"

শরৎদা বললেন—"সে এক মজার ব্যাপার। রেঙ্গুনের 'বেঙ্গলী ক্লাবে' একটা সভায় গান গাইবার জন্য সবাই ধরল। আমি কিছুতেই রাজী হই না। শেষে অনেক পীড়াপীড়িতে রাজী হলাম। কথা থাকল—আমি যেখানে গাইব, সেখানটা পর্দা ঘিরে দিতে হবে। সেই ব্যবস্থাই হল। সভায় নবীনচন্দ্র এসেছিলেন। আমি গান করলাম পর্দার আড়ালে বসে। গান শেষ হলে নবীনচন্দ্র আমাকে ডেকে পাঠালেন—আমি কিন্তু গান শেষ করেই পাশের দরজা দিয়ে চম্পট দিলাম। অত বড় কবির কাছে আমি দাঁড়াব কি করে? বিশেষতঃ তিনি একজন উচ্চপদস্থ গণ্যমান্য ব্যক্তি। তারপর নবীনচন্দ্র দুখানা চিঠি লিখে দেখা করতে বলেছিলেন। আমি তাতেও সাড়া দিই নি। শেষে একদিন তিনি আমার কুটীরে হাজির হলেন। আমি বিব্রত হয়ে পড়লাম। তারপর তাঁর সঙ্গে মেলামেশা সহজ হয়ে উঠেছিল।"

শরৎচন্দ্রের অফিসের কর্তা এক নতুন সাহেব এসেছিল। এই সাহেবটির অত্যাচারে শরৎচন্দ্র চাকরি ছাড়বার জন্য ব্যস্ত হয়েছিলেন—এটা ১৯১৩ সালের ব্যাপার। পকেটে Resignation letter লিখে নিয়ে তিনি অফিস করতেন। এই সময়ে তিনি বাংলাদেশে ৪০।৫০ টাকা বেতনেরও চাকরি পেলে নিতে প্রস্তুত ছিলেন। শরৎচন্দ্রের উপজীবিকা শেষ পর্যন্ত বই বিক্রীই হয়েছিল বটে, কিন্তু বর্মায় থাকতে তিনি অন্নবস্ত্রের সংস্থান বই বেচে করতে চান নি। তিনি বাংলাদেশে চাকরিই চেয়েছিলেন, বই বিক্রীর উপর নির্ভর করতে কোনদিনই চান নি। তিনি একখানা চিঠিতে লিখেছিলেন—"সাহিত্য বেচে খেতে চাই না। যদি কিছু পাই তো তা দিয়ে বই কিনব।"

ভারতবর্ষের স্বত্বাধিকারীর ভরসা পেয়ে শরৎচন্দ্র এক বছরের ছুটি নিয়ে কলকাতা এলেন ১৯১৬ সালের এপ্রিল মাসে। তখনও সাহিত্যের উপর তিনি ভরসা করতে পারেন নি। সেজন্য চাকরীতে ইস্তফা না দিয়ে ছুটিই নিয়েছিলেন। হরিদাসবাবু ৩০০ টাকা পাঠিয়ে দিলেন—তাতে সেখানকার দেনা শোধ করে জাহাজের টিকিট কিনলেন। কলকাতায় এসে তিনি তাঁর দিদি অনিলাদেবীর বাসার কাছে বাজেশিবপুরে নীলকমল কুণ্ডুর লেনে বাসা করলেন। দেবানন্দপুরের বাড়ী ও ভিটে দেনার দায়ে বিক্রী হয়ে গিয়েছিল। দেশে এসে তার উদ্ধারের চেষ্টা করেছিলেন, চেষ্টা সফল হয় নি।

বাজেশিবপুরে বাসা বাঁধলে তাঁর ছোট ভাই প্রকাশচন্দ্র তাঁর কাছে বাস করতে এলেন। আর একজন এলেন—তাঁর কথা আমরা আগে শুনি নি, আত্মীয়রাও বোধহয় শোনেন নি। তিনি শরৎচন্দ্রের স্ত্রী। শরৎচন্দ্র যে বিবাহ

করেছিলেন, তা আমরা জানতাম না। শুনেছি ভবঘুরে অবস্থায় ঘুরতে ঘুরতে একস্থানে তিনি বিবাহ করেন। কিন্তু তখন তাঁর চালচুলো কিছুই ছিল না। কাজেই তাঁর সঙ্গে এতদিন সংসার করা হয় নি। রেঙ্গুনেও তাঁর চালচুলো হয় নি। সেখানে হোটেলে খেতেন ও একটি ঘর ভাড়া করে দরিদ্রভাবে দিন যাপন করতেন। শরৎচন্দ্রের বর্মাপ্রবাসের সঙ্গী সতীশচন্দ্র দাস লিখেছেন—

"যে দিন শরৎচন্দ্র মায়ের গঙ্গাজলের চিঠি পাইয়া তাঁহার বাড়িতে উপস্থিত হইয়া জানিতে পারিলেন—মাসীমা কন্যাদায়গ্রস্ত হইয়া আহার-নিদ্রা ত্যাগ করিয়াছেন, সেদিন মাসীমার ক্রন্দনে শরৎদা অনন্যোপায় হইয়া কি ভাবে মাসীমাকে কন্যাদায় হইতে মুক্ত করিয়াছিলেন, শরৎচন্দ্রের গ্রন্থাবলীর পাঠক-পাঠিকাগণ তাহা বুঝিতে পারিয়াছেন।"

সতীশবাবুর কথা বেশ স্পষ্ট নয়। তবে অবিশ্বাস্য হওয়ারও কারণ নেই। আমাদের কোনদিন এ বিষয়ে প্রশ্ন করবার সাহস হয় নি। শরৎ দাদা 'আমার স্ত্রী' না বলে তোমার 'বৌদিদি' কথাটাই ব্যবহার করতেন। আমরা বৌদিদি বলেই জানতাম।

প্রমথনাথ ভট্টাচার্যের লেখা 'শনিবারের চিঠি'তে প্রকাশিত নিম্নলিখিত পত্রাংশ থেকে জানা যায় যে, শরৎচন্দ্র যখন ব্রহ্মদেশে ছিলেন—তখনই শরৎচন্দ্রের স্ত্রী তাঁর কাছে শেষের দিকে ছিলেন।

"চাকরটার অসুখ, আমাকে নিজেই বাজার যেতে হয়, না গেলে যিনি আছেন তিনি বলেন—খেতে পাবে না। ইনি তো দিন-রাত পূজো আচ্চা নিয়েই থাকেন। একটু-একটু লেখাপড়া জানেন বটে, কিন্তু কাজে আসে না। একদিন বলেছিলাম, আমি শুয়ে শুয়ে বলে যাই তুমি লিখে যাও—স্বীকারও করেছিলেন। কিন্তু সুবিধা হল না। 'বরং' লিখতে গিয়ে জিজ্ঞাসা করেন অনুস্বারের ঐ টানটা ফোঁটার ভিতর দিয়ে যাবে, না বাইরে দিয়ে দেব? কাজেই আমাকে সমস্তই নিজে লিখতে হয়।"

আর একখানা পত্র থেকে জানা যায় যে, তিনি প্রমথবাবুকে চোরবাগানে তাঁর স্ত্রীকে টাকা দেওয়ার জন্য লিখেছেন। সেই সঙ্গে প্রমথবাবুকে অনুরোধ করা হয়েছে—একটি ভদ্র পরিবারের সঙ্গে তাঁকে যেন রেঙ্গুনে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। শরৎচন্দ্র লিখেছেন—"এঁরা না এলে লিখতে পারছি না।"

এতদিনে শিবপুরে তিনি বাসা বেঁধে দিদির অনুরোধে তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে এলেন। এখন শরৎচন্দ্র পুরাদস্তুর সংসারী। ভাই-এরও বিবাহ হল। এতদিন বাদে শরৎচন্দ্র নারীহস্তের সেবাযত্ন পেয়ে শুধু গৃহস্থ নয়, প্রকৃতিস্থ হলেন।

তিনি শিবপুরে স্থায়ীভাবে বাসা করলে আমরা তাঁর বাড়ী যাতায়াত করতাম—তিনিও তাঁর পুত্রোপম ভেলি কুকুরকে সঙ্গে নিয়ে যমুনা অফিসে আসতেন। সেখানেও আমরা দেখা-সাক্ষাৎ করতাম। ভেলির এত আদর ছিল যে, যমুনা অফিসে বসে এক টাকার চপ-কাটলেট কিনে আনিয়ে ভেলিকে তিনি খাওয়াতেন।

শিবপুরে থাকবার সময়ে তিনি কংগ্রেসের কাজে যোগ দিলেন। ক্রমে সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর খুবই ঘনিষ্ঠতা হল। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের কাজে তিনি প্রধান সহায় হয়ে উঠলেন। তিনি অনেক দিন ধরে হাওড়া কংগ্রেস কমিটির প্রেসিডেন্টও ছিলেন।

শরৎচন্দ্র চরকা কাটতেন নিয়মমত এবং কংগ্রেস কর্মীদের নানা সংঘ সমিতিতে নেতৃত্ব করতে লাগলেন। তিনি হাওড়া C. S. P. C. A.-এর Chairman'ও ছিলেন।

কিছুদিন পরে তাঁর চব্বিশ ঘণ্টার সঙ্গী আদরের ভেলুর মৃত্যু হল। ভেলুর মৃত্যুর পর তিনি চারু বন্দ্যোপাধ্যায়কে যে পত্র লিখেছিলেন তাতে একটা তথ্যের কথা আছে। "একটা জিনিস টের পেলাম চারু, পৃথিবীতে objectiveটা কিছু নয়, subjective-টাই সব, নইলে একটা কুকুর বৈ ত নয়। রাজা ভরতের উপাখ্যান কিছুতেই মিথ্যা নয়।"

রাজনীতিক্ষেত্রে তিনি দেশবন্ধুর শিষ্য হলেন সুভাষের সহযোগী-রূপে। কিছু তাঁর নিজেরও স্বাধীন মত ছিল। তিনি অহিংসামন্ত্রে দীক্ষিত হতে পারেন নি। তার ফলে বিপ্লবী দেশ-সেবকদের তিনি ত্যাগ করতেও পারেন নি। শুধু তাই নয়। ক্রমে যত তাঁর আয় বৃদ্ধি হতে লাগল ততই তিনি কংগ্রেসের কাজে, বিশেষ করে সর্বহারা বিপ্লবী যুবকদের জন্য ব্যয় করতে লাগলেন। মহাত্মা গান্ধীর চেয়ে দেশবন্ধুর প্রতি তাঁর ভক্তি ছিল ঢের বেশী। এ নিয়ে আমাদের রসচক্রে তাঁর সঙ্গে অনেক বাদানুবাদও হয়ে গিয়েছে। তাতে শরৎচন্দ্রের ধৈর্যচ্যুতি হতেও দেখেছি।

দেশবন্ধু প্রবর্তিত কংগ্রেসের মুখপত্র 'বাংলার কথা'য় শরৎচন্দ্র 'শিক্ষার বিরোধ' নামে প্রবন্ধ লেখেন। রবীন্দ্রনাথের অভিমতের বিরুদ্ধে এতেই শরৎচন্দ্র সর্বপ্রথম নিজের অভিমত প্রচার করেন।

গয়া কংগ্রেসে মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে কাউনসিল প্রবেশ নিয়ে মতভেদ হলে শরৎচন্দ্র দেশবন্ধুকে সমর্থন করেন। বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির আলোচনা-সভায় এবিষয় নিয়ে সভাপতি শ্যামসুন্দর চক্রবর্তীর সঙ্গে মতভেদ হওয়ায় তিনি বলেছিলেন—"এত ঠিক সভা হচ্ছে না,—এ হচ্ছে তামাসা।"

এতে সভাপতি খুব রাগ করেন। দেশবন্ধু তামাসা কথাটা প্রত্যাহার করতে

বলেন। শরৎবাবু তা না করে সভা ছেড়ে চলে আসেন। গোলমালে সভা ভেঙে যায়। অবশ্য দিল্লী কংগ্রেসের অধিবেশনে শরৎবাবুর দলেরই জয় হয়। শরৎচন্দ্র এই সময়ে সক্রিয়ভাবে কংগ্রেসের কাজ করতেন। দেশবন্ধুর কাজে পরম সহায়রূপে তিনি কংগ্রেসে ছিলেন।

হাওড়ার বরদাপ্রসন্ন পাইন ও অন্যান্য কংগ্রেস কর্মীদের সঙ্গে মতভেদ হওয়ায় এবং এই মতভেদের মীমাংসা মনোমত না হওয়ায় শরৎচন্দ্র ক্ষুব্ধ হন এবং দেশবন্ধুর প্রতি তাঁর অভিমান হয়।

তারপর দেশবন্ধু মহাপ্রস্থান করলেন। 'মাসিক বসুমতী'তে শরৎচন্দ্র দেশবন্ধুর স্মৃতিতে অর্ঘ্য প্রদান করেন—তাতে তাঁর একটা অনুতাপের সুর সমস্ত রচনাটিকে অপূর্ব সাহিত্যে পরিণত করেছিল। গল্প উপন্যাসের কথা বাদ দিলে এমন চমৎকার সাহিত্য তাঁর অল্পই আছে।

দেশবন্ধুর তিরোধানের পর সুভাষচন্দ্র ও যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের দুটি স্বতন্ত্র দল হয়। শরৎচন্দ্র সুভাষের দলের সমর্থক ছিলেন। ক্রমে তিনি রাজনীতিক্ষেত্র থেকে আস্তে আস্তে সরে এসে একনিষ্ঠভাবে সাহিত্যসেবা করতে লাগলেন। দেশবন্ধুর 'নারায়ণ' পত্রিকায় তাঁর 'স্বামী' প্রকাশিত হয়।

আমরা মাঝে মাঝে শরৎদাকে বলতাম, "দাদা আপনি হলেন একজন আর্টিস্ট, রবীন্দ্রনাথের পরই আপনি। আপনার দেশসেবা তো কলম দিয়ে। আপনি কি নেতাদের চেয়ে দেশের কাজ কম করছেন! বরং তাঁরা কেউ যা পারেন না আপনি তাই তো করছেন। আপনার লেখায় যে দেশভক্তির প্রচার হচ্ছে তা ওঁদের হাজারটা বক্তৃতাতেও হবে না। আপনি তো জাতকে গড়ে তুলছেন। আপনার এক কলমে যা হচ্ছে, দশ হাজার চরকায় কি তা হবে?"

তাতে তিনি বলতেন—"না হে না—শুধু কলমে হয় না, শুধু বাক্যে হয় না। 'কায়েন মনসা বাচা' দেশের সেবা করতে হবে। কাজ কার ছিল না, সে সবও তো একহিসেবে দেশেরই কাজ। সবাই তো কাজ ছেড়ে নেমে পড়েছে। আমার কাজ লেখা—লেখা ছেড়েও আমাকে নামতে হবে। মুখে বচন ঝাড়ব—আর দেশের কাজের বেলায় পিছিয়ে যাব, এ কপটতা আমার দ্বারা চলবে না।"

আমরা বলতাম—"জেলে যেতে হবে, দেখবেন। আপনার ঐ শরীর নিয়ে জেলে যেতে পারবেন?"

শরৎদা বলতেন—"জেলে যেতে ভয় করি না। কেবল একটা ভয় কি জান? ওরা যদি আফিম না দেয় তাহলে কি হবে? আফিম ছাড়লে তো বাঁচব না। আচ্ছা, জুতোর মধ্যে ভরি দশেক আফিম নিয়ে গেলে কি হয়?"

যাই হোক, জেলে তাঁকে যেতে হয়নি। একটা প্রতিষ্ঠা অন্য সব প্রতিষ্ঠাকে কবলিত করে—শরৎচন্দ্রের সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠা তাঁর দেশসেবকের প্রতিষ্ঠাকে গ্রাস করেছে। তাই কংগ্রেসকর্মী দেশসেবক সেবাব্রতীদের প্রতিপালক শরৎচন্দ্রকে সবাই জানে না।

শরৎচন্দ্রের খ্যাতি ১৯২০ সালের পর অবিসংবাদিত রূপে দেশময় ছড়িয়ে পড়ল। রবীন্দ্রনাথের শিষ্য তিনি, রবীন্দ্রনাথের পরই দেশের মনে সাহিত্যিক রূপে তিনি স্থান পেলেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আর তাঁকে উপেক্ষা করতে পারলেন না। তাঁকে জগত্তারিণী পদক দিয়ে সম্মানিত করলেন ১৯১৩ সালে। ১৯২৫ সালে মুন্সীগঞ্জে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনে তিনি সাহিত্য শাখার সভাপতি হন। সভা সম্বন্ধে তাঁর চিরদিন ঔদাসীন্য ছিল। মুন্সীগঞ্জে সভাপতিত্ব করতে গেলেন, একটা অভিভাষণও লিখে নিয়ে গেলেন না। সভার দিনের আগের রাত্রে একটা কিছু লিখলেন। সভায় যখন অভিভাষণ পড়তে গেলেন—তখন আবিষ্কার করলেন দুটো শীট কাগজ মাঝখানে নেই। কোনপ্রকারে সভা সেরে ফিরে এসে দেখেন খাটের তলায় সে দুটো শীট পড়ে রয়েছে। তিনি যখন বাইরে গিয়েছিলেন লিখতে লিখতে তখন কাগজ দুখানা উড়ে গিয়েছিল—সে দিকে খেয়াল ছিল না। এই হ'ল আসল শরৎচন্দ্র।

এই বছর তিনি রূপনারায়ণের ধারে সামতাবেড়ে (পাণিত্রাস) গ্রামে মস্ত বড় একটা বাড়ী তৈরী করে বাস করতে গেলেন। হাওড়ার শহুরে আবহাওয়া তাঁর ভাল লাগল না। এই গ্রামে গিয়ে শরৎচন্দ্র হাঁপ ছেড়ে যেন বাঁচলেন। তিনি এই গ্রামের আপামর সাধারণ সকলকে আত্মীয় করে তুলেছিলেন। বিপদে আপদে অসুখে বিসুখে তিনি সকলের সহায় ছিলেন। গ্রামবাসীদের জন্য লড়তে গিয়ে তিনি মামলাতেও জড়িয়ে পড়েছিলেন। আমাদের সাহিত্যরথী সেদিন গাঁয়ের দাঠাকুর। এ গাঁয়ে বড় সাপের উৎপাত ছিল। যে লাঠিগাছটায় তিনি অনেক সাপ মেরেছিলেন সে লাঠিটা ছিল অত্যন্ত সাধারণ। কিন্তু সেটাকে তিনি কিছুতেই ছাড়েন নি। সেই লাঠিই ছিল তাঁর গ্রামের পথে চিরসঙ্গী। সে লাঠি বালিগঞ্জেও সঙ্গে এসেছিল।

সামতাবেড় বাংলাসাহিত্যের পরমতীর্থ হয়ে উঠল। কলকাতা থেকে দলে দলে লোকে সেখানে তাঁর চরণ দর্শন করতে যেত। তাঁরও আতিথ্য ধর্মপালনের প্রয়োজন হ'ত।

এখানে এই সময়ে একটি শোচনীয় ঘটনা ঘটে। শরৎচন্দ্রের মধ্যম ভ্রাতা প্রভাস সন্ন্যাসী হয়ে বেলুড় মঠে থাকতেন। অসুস্থ হয়ে প্রভাস (বেদানন্দ স্বামী)

দাদার কাছে এলেন এবং দাদার কোলে মাথা রেখে দেহত্যাগ করলেন। ভাই চিরকাল কাছছাড়াই ছিল—তার কথা ভাববারও সময় ছিল না শরৎচন্দ্রের। আজ শুধু মরবার জন্য সে এলো তাঁর কাছে। এতে শরৎচন্দ্র দারুণ শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়লেন। শরৎচন্দ্র শ্মশানে একটি মন্দির গড়ে তাঁর স্মৃতিরক্ষা করলেন। শরৎচন্দ্রের এতদিনকার সুপ্তস্নেহ বহুগুণে উদ্দীপিত হতে লাগল। ছোট ভাই প্রকাশের উপর তাঁর স্নেহের অতিবৃষ্টি হতে লাগল। নিঃসন্তান শরৎচন্দ্র প্রকাশের ছেলেকেই নিজের বংশধর বলে বুকে জড়িয়ে ধরেছিলেন।

তিনি বলতেন—"কালিদাস, এই আমার একমাত্র বংশধর, এর education যাতে ভালো হয় তা তোমাকে দেখতে হবে।" আমি তাকে নিজের স্কুলে ভর্তি করে নিতে চেয়েছিলাম—শরৎদাদার মৃত্যুর পর। কিন্তু সে চেষ্টা সফল হয়নি।

১৯৩৪ সালে শরৎদা বালিগঞ্জে গৃহ নির্মাণ করলেন। আমরা বললাম—"দাদা আপনার পল্লীপ্রীতি শেষ হ'ল তো। পল্লীগ্রাম ২।৪ দিনই ভালো। সেখানে গ্রামবাসীদের সঙ্গে মিশে আপনার মত এত বড় একটা সাহিত্যিকের দিন কি কাটে? আমাদের সঙ্গ না পেলে আপনি বাঁচবেন কি করে?"

শরৎদা বলেছিলেন—"না হে ভায়া ভুল বুঝেছ। আমি কি সামতাবেড় ছাড়তে পারি! কলকাতায় একটা আস্তানা করলাম। কলকাতায় প্রায়ই তো আসতে হয়। পেটের ভাত যে কলকাতায়! পরের বাড়ীতে উঠতে ইচ্ছে করে না। তা ছাড়া, আমার অবর্তমানে আমার বাড়ীর সবাই তো আর সেখান থেকে রূপনারায়ণের ঢেউ গুণবে না। তাদের আশ্রয় তো চাই। তা ছাড়া, রূপনারায়ণও দেখছি বর্ষাকালে এতবড় সাহিত্যিকের মর্যাদা রাখতে চায় না। বুড়ো হয়েছি কবে আছি কবে নেই। আমি যাতায়াত করবো কখনো এখানে, কখনো ওখানে। তোমাদের সঙ্গও চাই—গাঁয়ের আপন লোকদেরও সঙ্গ চাই।"

বেশীদিন যাতায়াত সম্ভব হয়নি। কারণ, গ্রামে গেলে প্রায়ই জ্বরে পড়তেন।

বালিগঞ্জ আসার পর শরৎচন্দ্র অনেকগুলো ক্ষোভ মিটিয়ে নিলেন। চিরদিন খাওয়ার কষ্ট পেয়েছিলেন, এখানে আসার পর তিনি রাজভোগে থাকতেন—প্রত্যহ পোলাও খাওয়ারও অভ্যাস করেছিলেন।

বড় সাধ ছিল তাঁর রবীন্দ্রনাথকে নিজের বাড়ীতে একবার আনবার। এখানে এসে তাঁর সে সাধ মিটেছিল। রবিবাসরের একটি বৈঠক তাঁর বাড়ীতে হয়েছিল, তাতে রবীন্দ্রনাথ এসেছিলেন। আর একটা কথা তিনি বলেছিলেন—'দেখ বাংলার একজন নিঃসম্বল দরিদ্রসন্তান নিছক সরস্বতীর সেবা করে অর্থাৎ

সাহিত্যরচনা করে লক্ষ্মীর কৃপালাভ করতে পারে তা আমাকে দেখাতে হবে। লোকে সাহিত্যিকদের বড় অবহেলা করে হে!"

১৯৩৬ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শরৎদাকে ডি. লিট. দিলেন—এতে শরৎদাকে বলেছিলাম—"দাদা, আমার কথা তো ঠিক হল—ডি. লিট. পেলেন তো?" শরৎদা বলেছিলেন—"তোমার কথা ঠিক হয়নি ভাই—তুমি বলেছিলে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ডি. লিট. একদিন দেবে। এ ত কলকাতা নয়, ঢাকা।

আমি বললাম—"যাক যে বিশ্ববিদ্যালয়ই দিক না কেন পেলেন তো? লোকে বড় বড় ডিগ্রী পায় পরের লেখা মুখস্থ ক'রে—নয়ত অন্যের লেখার উপর Thesis লিখে—আপনি পেলেন সাহিত্য সৃষ্টি ক'রে। এই সৃষ্টিকে আশ্রয় ক'রে কতজনা Ph. D., D. Phil., D. litt. হবে দেখবেন। ডিগ্রী ছিল না আপনার একেবারে, চরম ডিগ্রী বিধাতা আপনাকে দিয়ে চিরদিনকার ক্ষোভ মিটিয়ে দিলেন।"

এই ডিগ্রী পেয়ে শরৎচন্দ্র যতটা আনন্দ লাভ করেছিলেন—হাজার টাকা পেয়েও ততটা করেননি কোনদিন।

সামতাবেড়ে থাকবার সময়ে তিনি বঙ্গবাণীতে 'পথের দাবী' লেখেন। এই বই প্রকাশ করতে কেউ সাহস করেনি। উমাপ্রসাদ সাহস ক'রে প্রকাশ করেছিল। এতে লেখক ও প্রকাশক দুই-এরই যথেষ্ট নির্ভীকতা প্রকাশ পেয়েছিল। দু'জনেই রাজরোষে পড়েন। পথের দাবী Proscribed হয়। পথের দাবীকে মুক্ত করার জন্য রবীন্দ্রনাথের সাহায্য চান শরৎচন্দ্র। পথের দাবী পড়ে রবীন্দ্রনাথ তুষ্ট হতে পারেন নি—অযথা ইংরেজ-বিদ্বেষ প্রচার ব'লে মনে করেছিলেন। এ জন্য তিনি শরৎচন্দ্রকে মৃদু তিরস্কারও করেছিলেন। শরৎচন্দ্রের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সাময়িক মনোমালিন্যের এই একটা কারণ। তাছাড়া নাটকের জন্য রবীন্দ্রনাথের গান চেয়ে শরৎচন্দ্র নিরাশ হয়েছিলেন।

ছড়া কিংবা কাব্য কভু লিখবে পরের ফরমাসে—
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জেনো নয়কো তেমন শর্মা সে॥

শরৎচন্দ্রের সে কথা জানা উচিত ছিল। এর উত্তরে শরৎচন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে যে চিঠি দিয়েছিলেন তাতে লিখেছিলেন—"সত্যেন্দ্রনাথ জীবিত থাকলে আপনাকে অনুরোধ করতাম না। সত্যেন্দ্রকে অনুরোধ আদেশের মতই হতো।" এখানে শরৎচন্দ্রের ভুল হয়েছিল। সত্যেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথেরই শিষ্য। কারো ফরমাসে কিছু লিখবেন, সত্যেন্দ্রনাথও সে শর্মা ছিলেন না। তা ছাড়া, সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর সে ঘনিষ্ঠতাও ছিল না। বরং কাজী নজরুলকে বললে

সানন্দে সে তাঁর আদেশ পালন করত। শরৎচন্দ্রের মতে রবীন্দ্রনাথের পরই কাজী নজরুল দেশের সবচেয়ে বড় কবি ছিলেন। সত্যেন্দ্রনাথের নামোল্লেখ করে শরৎচন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে আঘাতই দিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ যেন সত্যেন্দ্রনাথের অনুকরণ।

তারপর 'সাহিত্যের যাত্রা', 'সাহিত্যের আদর্শ' ইত্যাদি নিয়ে একটা দ্বন্দ্ব হয়, এতে শরৎচন্দ্রও যোগ দেন। সেই দ্বন্দ্বে রবীন্দ্রনাথ তীব্রভাবে বর্তমান সাহিত্যের গতিপ্রগতির নিন্দা করেন। নরেশবাবুর পক্ষ নিয়ে শরৎচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের প্রতিবাদ ক'রে শ্লিষ্টবাক্যে তাঁকে আঘাত দেন। আমরা যারা দুজনেরই ভক্ত, তারা বড় মুশকিলে পড়ে গিয়েছিলাম। কাজেই আমরা নীরব ছিলাম। এতে মনোমালিন্য বেড়ে যায়। এর অবসান হয় কয়েক বৎসর পরে।

এখানে থাকবার সময়ে শরৎচন্দ্রের সঙ্গে দিলীপকুমারের যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা হয়। দিলীপকুমার শরৎচন্দ্রের 'নিষ্কৃতি'র ইংরেজিতে অনুবাদ করেন এবং শ্রীকান্তের অনুবাদ আরম্ভ করেন। এজন্য শরৎচন্দ্র দিলীপের নিকট খুব কৃতজ্ঞ ছিলেন।

শিবপুর ও সামতাবেড়ে থাকবার সময়ে শরৎচন্দ্রের নিম্নলিখিত বইগুলি বার হয়—শ্রীকান্ত ১ম পর্ব, দেবদাস, নিষ্কৃতি, কাশীনাথ, চরিত্রহীন, স্বামী, দত্তা, শ্রীকান্ত ২য় পর্ব, ছবি, গৃহদাহ, বামুনের মেয়ে, দেনাপাওনা, নারীর মূল্য, নববিধান, হরিলক্ষ্মী, পথের দাবী, শ্রীকান্ত ৩য় পর্ব, ষোড়শী। এই সময়ে বিরাজ বৌ, ষোড়শী ইত্যাদি রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়।

এখানে থাকতে তিনি কেবল মুন্সীগঞ্জ সাহিত্য সম্মেলনে নয়, কানপুর প্রবাসী সাহিত্য সম্মেলনেরও সভাপতিত্ব করেন।

একটা জন্মতিথিতে খুব ঘটা ক'রে তাঁর অভিনন্দনের ব্যবস্থা হয়। সেই সময়ে মহাত্মা গান্ধী উপবাস করেছিলেন এবং দিনটা 'হিজলি দিবস' ছিল ব'লে আমরা অভিনন্দন স্থগিত রাখবার জন্য খবরের কাগজে চিঠি ছেপেছিলাম, সেজন্য শরৎচন্দ্র বড়ই অভিমান করেছিলেন। পর বৎসর রেডিওতে তাঁর অভিনন্দন দিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করতে গিয়েছিলাম। সেই উপলক্ষে রায়বাহাদুর অঘোরনাথ অধিকারী কয়টি কথা বলেন—এখনো তা মনে আছে—"ভোলা সন্ধ্যার পরও বাড়ী না ফিরলে তার বিধবা মা প্রদীপ হাতে ক'রে গাছে গাছে তাকে খুঁজে বেড়াত। অন্য সাহিত্যিকরা অনুগ্রহ পাওয়ার জন্য সরস্বতীর পিছু পিছু ছোটে, আর শরৎচন্দ্রকে ভোলার মার মত মা খুঁজে বেড়িয়েছেন প্রদীপ হাতে করে গাছে গাছে এবং ধরে এনেছেন ঘরে। শরৎচন্দ্র চিরদিন মা সরস্বতীর পলাতক সন্তান, কিন্তু মায়ের একমাত্র অবলম্বন।"

বর্মায় থাকতে থাকতে তিনি রামের সুমতি, বিন্দুর ছেলে, পথনির্দেশ, পরিণীতা, পল্লীসমাজ, বিরাজবৌ, বড়দিদি, মেজদিদি, চন্দ্রনাথ, পণ্ডিতমশাই ইত্যাদি বই প্রকাশিত হতে দেখেছিলেন।

'চরিত্রহীন' যমুনায় প্রকাশিত হয়। অনেক পরে এম. সি. সরকার এণ্ড সন্স কর্তৃক পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। চরিত্রহীন নীতিবিরুদ্ধ বলে দেশে খুব আন্দোলন হয়। এই আন্দোলন তার কানে পৌঁছুলে তিনি একখানা চিঠিতে লেখেন, "আমি জিজ্ঞাসা করি কি আছে ওতে? একজন ভদ্রঘরের মেয়ে যে কোন কারণেই হোক বাসার ঝি বৃত্তি করিতেছে (character unquestionable নয়) আর একজন ভদ্র-যুবা তারই প্রেমে পড়িতেছে—অথচ এমন কোথাও আশ্রয় পাইতেছে না। অথচ রবিবাবুর চোখের বালির ভদ্রঘরের বিধবা নিজের ঘরের মধ্যেই নিজের আত্মীয়-কুটুম্বের মধ্যেই নষ্ট হইতেছে—কেহ কথাটি বলে নাই। (কৃষ্ণকান্তের উইলের রোহিণীকে মনে পড়ে?) মানসীতে প্রভাতবাবু এক ভদ্রযুবার মুখে আর এক ভদ্রবিধবার সতীত্ব-হরণের মতলব আঁটিতেছেন! ...আর আমার চরিত্রহীন যত অপরাধে অপরাধী। যাহারা ইংরাজি, ফরাসী কিংবা জার্মানী নভেল পড়িয়াছে তাহারা অবশ্য বুঝিবে—ইহা সত্যই Immoral কিনা।"

এই অংশ পড়লে মনে হয়, তাঁর আত্মসঙ্কোচ অনেকটা কেটে গেছে। তারপর আরো লিখেছেন—

"যাহাই হোক আমি এখনো স্বীকার করি না এবং বুঝি না বলিয়াই করি না যে চরিত্রহীনে একবর্ণ Immorality আছে।"

কুরুচি থাকতে পারে। যাহা পাঁচজনে বলিতেছে তাহা নাই। তবুও নাম দিয়াছি চরিত্রহীন। ইহার মধ্যে কুল-কুণ্ডলিনী জাগাইয়া তুলিব অবশ্য এ আশা করিতেই পারি না। যাহার নামটা দেখিয়া ভয় হইবে সে পড়িবে না।"

এই উপন্যাসখানিকে তখন পর্যন্ত তিনি তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ দান বলে মনে করতেন। একে তিনি বলেছেন Scientific Ethical Novel. তিনি আর একখানা পত্রে লিখেছেন "টলষ্টয়ের Resurrection তাহারা একবার যদি পড়ে তাহা হইলে চরিত্রহীন সম্বন্ধে কিছুই বলিবার থাকিবে না। Psychological হিসাবে বড় বই, তাহাতে দুশ্চরিত্রের অবতারণা থাকিবেই থাকিবে।"

শরৎচন্দ্র নিজের সব লেখাই উৎকৃষ্ট হয়েছে তাহা মনে করতেন না। কোন বই সত্যই Immoral হয়েছে সে বিষয়েও তিনি সচেতন ছিলেন। একটা চিঠিতে চন্দ্রনাথ সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন—

"চন্দ্রনাথ তোমার ভালো লাগবে। তাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কিছু নেই। ওটা আমার ভালো লাগে নি। একে তো ছেলেবেলার লেখায় স্বভাবতই অপূর্ণতা বেশি, তাতে মাঝে মাঝে উচ্ছ্বাস রয়ে গেছে। এই উচ্ছ্বাস বস্তুতে আমার ভীষণ ভয়।"

দেবদাস সম্বন্ধে এক চিঠিতে লিখেছেন—

"দেবদাস নিয়ো না, নেবার চেষ্টাও কোরো না। শুধু ওটা যে আমার মাতাল হয়ে লেখা তাই নয়, ওটার জন্যে আমি নিজেও লজ্জিত। ওটা Immoral, বেশ্যা চরিত্র তো আছেই, তা' ছাড়া আরো কি কি আছে ব'লে মনে হয় যেন।"

চন্দ্রনাথ ও দেবদাসের পাণ্ডুলিপি শরৎচন্দ্রের কাছে ছিল না।

শরৎচন্দ্র যেমন বৈধ ও অবৈধ প্রেমের কাহিনী লিখেছিলেন, তেমনি প্রেমবর্জিত যৌনসম্পর্কহীন গল্পও লিখছিলেন। রামের সুমতি, বিন্দুর ছেলে, মেজদিদি এই শ্রেণীর লেখা। এই শ্রেণীর আরো বই লিখবার ইচ্ছা ছিল তাঁর। তিনি এক পত্রে লিখেছিলেন—

"রামের সুমতির মত প্রেমবর্জিত আমাদের বাঙ্গালী ঘরের কথা (যাহাতে মানুষের শিক্ষাও হয়)। Series of stories লিখব মনে করিতেছি। বাঙ্গালীর Ideal অন্তপুরটা যে কি, ইহাই প্রতিপাদ্য বিষয়।"

শরৎচন্দ্র তাঁর কাঁচা বয়সের লেখাগুলো ছাপাতে চান নি। তাঁর মনে হ'ত, ওতে তাঁর নাম খারাপ হবে। তাঁর লেখা কাঁচা বয়সের হলেও তাঁর অনুরক্ত বন্ধুদের সে লেখা একটুও খারাপ মনে হত না। তাই তাঁরা জোর করে ছেপে দিতেন। উপেন্দ্র গাঙ্গুলীকে একখানা পত্রে তিনি লিখেছিলেন—

"তুমি 'কাশীনাথ' সমাজপতিকে দিয়ে ভাল কর নি। ওটা 'বোঝার' জুড়ী। ছেলেবেলাকার হাত পাকানোর গল্প। ছাপানো তো দূরের কথা, লোককে দেখানোও উচিত নয়। আমার সম্পূর্ণ অনিচ্ছা যেন না ছাপা হয়। আর আমার নামটা মাটি কোরো না, একা 'বোঝা'ই (যমুনাতে প্রকাশিত গল্প) যথেষ্ট হয়েছে।"

দুঃখের বিষয় (!) সমাজপতি ঐ লেখা পড়ে এত মুগ্ধ হয়েছিলেন যে, নিষেধ সত্বেও তিনি সাহিত্যে ছেপেছিলেন। ছোটবেলাকার লেখা চন্দ্রনাথ অসংশোধিত ভাবে যাতে ছাপা না হয়—সেজন্য তিনি বার বার অনুরোধ করে পত্র দিয়েছিলেন। ওতে ভাবোচ্ছ্বাসের আতিশয্য ছিল। পাণ্ডুলিপি ফেরৎ পেয়ে তিনি অনেকটা বাড়িয়ে মার্জিত ও সংযত করে দেন, রেঙ্গুনে থাকতেই।

পথনির্দেশকে শরৎচন্দ্র বিন্দুর ছেলে, রামের সুমতির চেয়ে ঢের ভালো গল্প

মনে করতেন। একথা তিনি একটা চিঠিতে লিখেছিলেন। বিন্দুর ছেলে সম্বন্ধে তাঁর দ্বিধা ছিল—তিনি এক পত্রে এটা প্রকাশযোগ্য হবে কিনা বলে সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন।

নারীর মূল্য সম্বন্ধে লিখেছিলেন—"নারীর মূল্যের বহু সুখ্যাতি হইয়াছে। আমি মনে করিয়াছি ১৪টা. মূল্য ঐ রকমের লিখিব। এবারে হয় প্রেমের মূল্য, না হয় ভগবানের মূল্য লিখিব। তারপর ক্রমশঃ ধর্মের মূল্য, সমাজের মূল্য, আত্মার মূল্য, সত্যের মূল্য, মিথ্যার মূল্য, নেশার মূল্য ও বেদান্তের মূল্য লিখিব।"

বলা বাহুল্য, নারীর মূল্য ও সমাজের মূল্যের কিয়দংশ ছাড়া আর কিছু লেখা হয় নি। শরৎচন্দ্র বর্মায় বহু পড়াশুনা ক'রে যে সব তথ্য পেয়েছিলেন তা তাঁর নিজস্ব চিন্তা ও বুদ্ধির কষ্টি পাথরে কষে মন্তব্য প্রকাশের জন্য একটা আকুলতা অনুভব করতেন।

শ্রীকান্তের ভ্রমণকাহিনী সম্বন্ধেও তাঁর দ্বিধা ছিল। কেবল কোন দ্বিধা ছিল না চরিত্রহীন সম্বন্ধে। হরিদাসবাবুকে লিখেছিলেন—

"শ্রীকান্তের ভ্রমণকাহিনী যে সত্যই ভারতবর্ষে ছাপিবার যোগ্য, আমি তা মনে করি নাই—এখনও করি না। তবে যদি কেহ কোথাও ছাপে এই মনে করিয়াছিলাম।…যদি বলেন ত আরো লিখি—আরো অনেক কথা বলিবার আছে।"

'পল্লীসমাজ' সম্বন্ধেও শরৎচন্দ্রের দ্বিধা ছিল। তাঁর বিশ্বাস ছিল যে কথাগুলো প্রবন্ধে বলবার কথা সেগুলো নিয়ে গল্প বানানো হয়েছে। এ বই আদৃত হবে ব'লে মনে করেন নি। বর্মায় বসে তাঁর জন্মভূমির আশেপাশের দুর্গত দুঃস্থ-পল্লীগুলির সম্বন্ধে চিন্তা করতেন এবং প্রতিকারের কথাও ভাবতেন। তার ফলেই পল্লীসমাজের জন্ম হয়। তিনি একখানা চিঠিতে পল্লীর দুর্গতির প্রতিকার সম্বন্ধে লিখেছেন "তারপরে প্রতিকারের উপায়? প্রতিকার আছে শুধু জ্ঞান-বিস্তারে। যাহারা প্রতিকার করিতে চায় তাহাদের মানুষ হইতে হইবে গ্রাম ছাড়িয়া দূরে গিয়া বিদেশে বাহির হইয়া। কিন্তু কাজ করিতে হইবে গ্রামে বসিয়া এবং গ্রামের ভালমন্দ সকল প্রকার লোকের সঙ্গে ভাল করিয়া মিল করিয়া লইব—তবে।"

এই কথাই পল্লীসমাজ ও পণ্ডিতমশাই-এ গল্পের আকারে বলেছেন।

পল্লীসমাজে একটা উদ্দেশ্য অন্তর্লিখিত থাকলেও তা গল্পের আর্টকে ক্ষুন্ন করেনি, এই আমাদের বিশ্বাস।

শরৎচন্দ্র কালি কলমের মুরলীধর বসুকে লিখেছিলেন—"পল্লীসমাজ তাঁর

শারীরিক অসুস্থতার জন্য আশানুরূপে হয় নি।" ঐ চিঠিতেই আছে পল্লীসমাজের বুঝি কোথাও কোথাও নিন্দা হয়েছিল। পল্লীসমাজের মত বইয়েরও নিন্দা হয়েছিল শুনে আমরা অবাক হই।

চরিত্রহীন যখন প্রকাশের পথে সে সময়ে শরৎচন্দ্রের পরিপূর্ণ আত্মপ্রত্যয় জাগরিত হয়েছে। তখন তিনি যে সকল চিঠিপত্র লিখেছেন—তা হতে বুঝা যায়—তিনি কোন সম্পাদকের কাছে লেখা যাচাই-এর অপমান সহ্য করতে নারাজ। অনুগত বন্ধু ফণীন্দ্র পালের ছোট কাগজে সব লেখা দিতে রাজী, তবু বড় বড় কাগজের সম্পাদকের বিচারের অধীন হতে চান না। নিজেকে তিনি সমঝদার হিসাবে সকলের চেয়ে বড় মনে করতেন, কেবল রবীন্দ্রনাথের কাছে মাথা নোয়াতে রাজী। শরৎচন্দ্র সুরেশ সমাজপতির মতামতকেও খুব শ্রদ্ধা করতেন। তিনি যে গল্প-উপন্যাসের মত সারগর্ভ প্রবন্ধ লিখতে পারেন এবং চাইলে গল্পের বদলে প্রবন্ধ দিতে পারেন—তা ফণীন্দ্র পালকে প্রায়ই জানাতেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি তাঁর ছিল না, কিন্তু Private Study করে তিনি যে তার ক্ষতিপূরণ করেছেন এবং কোন কোন বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হয়েছেন—তাও চিঠিতে জানাতেন। বই লিখে জানাবার আগ্রহও তাঁর কম ছিল না।

কোন ভাল মাসিকপত্রের সম্পাদকের উৎসাহ পেলে তিনি Herbert Spencer ও ইউরোপের অন্যান্য দার্শনিকদের মতবাদ নিয়ে ধারাবাহিক প্রবন্ধ লিখতে চেয়েছিলেন। সেই প্রসঙ্গে একখানা চিঠিতে লিখেছিলেন—

"গল্প লেখা তেমন আসেও না, বড় ভালও লাগে না। বয়স হয়েছে, এখন একটু চিন্তাপূর্ণ কিছু লিখতেই সাধ হয়। আমার গল্প লেখা অনেকটা জোর ক'রেই লেখা। জোরজবরদস্তির কাজ তেমন মোলায়েম হয় না।"

তিনি যমুনার সমস্ত লেখা নির্বাচন ক'রে দিতে চেয়েছিলেন—শ্রমস্বীকার ক'রে ফণীবাবুর উপর নির্ভর করতে পারতেন না। তার ফলেই যমুনার সম্পাদক হিসাবে শরৎবাবুর নাম যোগ হয়েছিল।

এই সময়ে বহু মাসিকপত্র হ'তে কেবল ছোটগল্পের জন্যে আবেদন আসত। বিনামূল্যে সম্পাদকরা পত্রিকাও পাঠাতেন। শরৎচন্দ্র অন্যান্য কাগজে লেখা দিতে চাইতেন না—তখন পারিশ্রমিক দেওয়ারও প্রথা ছিল না। শরৎচন্দ্র বিনামূল্যে মাসিকপত্র নিতে রাজী হতেন না—তিনি ভি. পি. করতে বলতেন।

চরিত্রহীন যমুনায় বার হয়—কিন্তু বই আকারে ছাপবার জন্য কেউ অগ্রসর হ'ল না। কারণ, যমুনায় যখন বার হয় তখনই ওর দুর্নাম হয়েছিল। তরুণ

প্রকাশক সুধীর সরকার সাহস করে চরিত্রহীন ছাপাতে সুরু করলেন। শরৎচন্দ্র যখন শিবপুরে বাসা করেছেন—তখন চরিত্রহীন ছাপা শেষ হল। চরিত্রহীনের আগে—ক্রমে চন্দ্রনাথ (সংশোধিত), বৈকুণ্ঠের উইল, অরক্ষণীয়া, শ্রীকান্ত প্রথম পর্ব, দেবদাস, নিষ্কৃতি, কাশীনাথ বার হয়েছিল।

এখানে থাকবার সময় গৃহদাহে চরিত্রহীন উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি ও নারীর ইতিহাসের পাণ্ডুলিপি, বহু পুস্তক ও নিজের আঁকা ছবি পুড়ে যায়। নতুন ক'রে চরিত্রহীনের পাণ্ডুলিপি তৈরী করতে হয়েছিল।

শরৎচন্দ্র বড়ই লাজুক (shy) ছিলেন—তিনি কোনো গণ্যমান্য লোকের সঙ্গে তাঁর নিজের বাড়ী গিয়ে আলাপ করতে পারতেন না। যতদিন না তাঁরা নিজে এসে আলাপ করতেন ততদিন আলাপ পরিচয়ের সুবিধা হ'ত না। অর্থাৎ আগ্রহটা অপরপক্ষের অকপট ও ঐকান্তিক না হলে শরৎচন্দ্র ধরা দিতেন না।

আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম—"নবীন সেনের বই আপনি পড়েছেন নিশ্চয়—কোন্ বই আপনার খুব ভাল লাগে? কোন্ বই তাঁর শ্রেষ্ঠ দান মনে হয়?"

আমি বললাম—"পলাশীর যুদ্ধ।" তখন পর্যন্ত আমার সেই ধারণাই ছিল। তিনি বললেন—"তুমি বাইরণের শিষ্য নবীনচন্দ্রকে বড় মনে কর? আমি ব্যাসের শিষ্য নবীনচন্দ্রকে বড় মনে করি। বাইরণ হ'তে ব্যাস অনেক বড়।"

আমি বললাম—"তিনি শেষ পর্য্যন্ত ব্যাসের অনুসরণ করলেন কই?"

শরৎচন্দ্র বললেন—"তিনি ব্যাসের মহাভারত নিয়েই তো লিখেছেন—তাঁর কাছে তিনি সম্পূর্ণভাবে ঋণী। কিন্তু শেষপর্য্যন্ত অনুসরণ করেন নি বলেই, নিজের মৌলিকতাও তাঁর যথেষ্ট ছিল বলেই, তিনি বড় কবি—তা না হলে তিনি ব্যাসের দ্বিতীয় কাশীরাম হয়েই থাকতেন।"

কলিকাতায় এসে ক্রমশ শরৎচন্দ্র কোন-কোন সভাসমিতির ডাকে যেতে শুরু করেছিলেন। লেখা কমে এসেছিল, রসিকজনের সঙ্গই বেশি পছন্দ করতেন। রবিবাসরের সভায় যেতেন, আর রসচক্রের তো কথাই নেই। তিনিই ছিলেন আমাদের রসচক্রের চক্রবর্তী। নিজের মোটর থাকায় নিমন্ত্রণ-আমন্ত্রণেও যেতেন—তবে কোথাও খেতেন না। সামাজিকতা রক্ষা করার অভ্যাস হয়েছিল।

এই সময়ে তাঁর একটি কুকুর ক্ষেপে গিয়ে তাঁকে কামড়েছিল। Injection নিয়ে তাঁকে বাঁচতে হয়েছিল। সেজন্য তাঁর দুঃখ দেখিনি—কুকুরের মৃত্যুতেই ছিল তাঁর অপরিসীম বেদনা। তিনি বলতেন—"একে অবোলা জীব, তাতে পাগল হ'ল, তার দোষ কি? আমি তো Injection নিয়ে বাঁচলাম—আহা! সে মরে গেল।"

বালিগঞ্জে আসার পর তাঁর সম্বন্ধে যে-সব কথা মনে পড়ছে সেইগুলোই লিখছি। ধারাবাহিকতা হয়ত ঠিক নেই। মুসলমান সমাজ নিয়ে শরৎচন্দ্রের উপন্যাস লিখবার খুব ইচ্ছা ছিল—সে ইচ্ছা কার্যে পরিণত হয়নি।

তিনি বলতেন—"একমাত্র সাহিত্যের মধ্য দিয়েই দুই জাতির মিলন হতে পারে। তবে মুশকিল হয়েছে মুসলমান সমাজের বিশেষ কিছু জানি না। তা ছাড়া, আরো একটা মুশকিল আছে—কোন সমাজ নিয়ে উপন্যাস লিখতে গেলে তার দোষগুণ, গৌরব গলদ দুইই লিখতে হয়। দোষের কথা লিখতে গেলে মুসলমানরা বলবে—'আমাদের সমাজের গ্লানি প্রচারের জন্য হিন্দু সাহিত্যিক কলম ধরেছে।' ছোরার ভয়ও যে নেই তা নয়।"

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ডি. লিট. দিতে পারে নি, জানি না কি বাধা ছিল—'জগত্তারিণী পদক' দিয়েছিল অনেক আগেই। আর কি ক'রে তাঁকে সম্মানিত করবে ঠিক করতে না পেরে একেবারে বি. এ-র Paper-Setter করেছিল, তা তাঁর ভালো লাগে নি। গিরিশ লেকচারার করতে চেয়েছিল—তাতে তিনি অপমানিত বোধ করেছিলেন। তখন পর্যন্ত শরৎচন্দ্রের কোন পুস্তক বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ্যরূপে গৃহীতও হয়নি।

বালিগঞ্জে থাকতে থাকতে তাঁর বিলাত যাওয়ার একবার ইচ্ছা হয়েছিল। অনেকে বলেছিল—তিনি নাকি নোবেল প্রাইজের জন্য চেষ্টা করতে যাচ্ছেন। আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম শরৎদাকে—গুজব সত্য কিনা। তিনি বলেছিলেন—"দিন দিন শরীর খুব খারাপ হচ্ছে—কবে মরে যাব, ও জগৎটা একবার চোখে দেখে আসি। তাছাড়া একটু স্বাস্থ্যেরও উন্নতি হবে বলে সবাই ভরসা দিচ্ছে। নোবেল প্রাইজ-ট্রাইজের কথা যা শত্রুপক্ষ রটাচ্ছে ওসবে বিশ্বাস করো না। বাংলার গ্রাম্যজীবনের ছবি কখনো তারা appreciate করতে পারে? হিন্দী অনুবাদেই রস নষ্ট হয়ে যায়! তা ছাড়া ও দেশে আমার মত Novelist-এর অভাব কি?"

শরৎচন্দ্র চিরদিনই নানা রোগে ভুগতেন, আর বলতেন, পরবর্তী জন্মতিথিতে আর থাকব না। দেহধারণের প্রতি বিতৃষ্ণা তাঁর পত্রগুলির ছত্রে ছত্রে। স্বস্তি ও অবকাশ তিনি চেয়েছিলেন, ক্লান্তি ও অবসাদ তাঁর লেখনীকেও অবলম্বন করেছিল। এমনি করেই ৬২ বৎসর কেটে গেল। আর কাটে না। অর্শ ছিল, অর্শে রক্ত পড়লে অবসন্ন হয়ে পড়তেন। ডাঃ কুমুদশঙ্কর রায় অর্শের অস্ত্রোপচার করেছিলেন। সামতাবেড়ে যতই তিনি মুক্তবায়ুতে থাকুন, জ্বর তাঁকে মুক্তি দিত না—এ ছাড়া বাতের মত একটা ব্যাধি ছিল, তাতে পা ফুলে উঠত।

দু-তিনবার পায়ে দারুণ আঘাতও পেয়েছিলেন। মৃত্যুর পূর্ববৎসর তিনি সর্বদাই ভ্রূর উপরে একটি বেদনা অনুভব করতেন—মাথাও ধরত প্রায়ই। রসচক্রের মজলিসে যখন গল্পগুজব করতেন, তখন মাঝে মাঝে কপাল টিপে ধরতেন—মাঝে মাঝে এসপিরিন খেতেন।

১৯৩৭ সালের শেষ দিকে পেটে একটা বেদনা হল; ক্রমে যা খেতেন তার সবটা দেহের অধোদেশে নামত না। শেষে পাকস্থলী অবরুদ্ধ হয়ে গেল। খেয়ে বমি করতে হ'ত। ডাক্তার বললেন, ক্যান্সার। মাতুল সুরেন্দ্রনাথ তাঁর কাছে থেকে সেবাশুশ্রূষা করতেন। তিনি শরৎচন্দ্রকে জানতে দিলেন না যে, তাঁর ক্যান্সার হয়েছে। Operation করলেই সেরে যাবে এই আশ্বাস দিয়ে Nursing Home-এ নিয়ে যাওয়া হল। এখানে অস্ত্রোপচার করা হল ক্যান্সারের নয়—artificial feeding-এর জন্য। তখনও শরৎচন্দ্রকে জানতে দেওয়া হয়নি যে, তাঁর ক্যান্সার হয়েছে, জীবনের কোন আশা নেই। ১৯৩৮ সালের ১৬ই জানুয়ারী বেলা ১০টার সময়ে তাঁর মৃত্যু হয়।

কৌতূহলী পাঠকদের জন্য তাঁর সর্বজন পরিজ্ঞাত জীবনের চরিত্রাংশ সম্বন্ধে দু'-একটি কথা বলতে চাই। তাঁর জীবনের শেষ কয় বৎসর তাঁর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে ও সাহচর্য লাভের সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। আমি তাঁর সায়াহ্নজীবনের ছায়াচ্ছন্ন চরিত্রে যে বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করেছিলাম তাই বর্ণনা করছি।

শরৎচন্দ্রের সাহিত্য পড়ে কেউ যদি তাঁকে আত্মীয়বৎসল, সেবালুব্ধ, দরদী, ক্ষমাশীল, নির্ভীক, উদাসী পুরুষ বলে মনে করে থাকেন—তবে তিনি কিছুমাত্র ভুল করেন নি। তাঁর আর্থিক অবস্থার যতই উন্নতি হতে লাগল, ততই তিনি আত্মীয়গণকে স্নেহচ্ছায়ায় টানতে লাগলেন। যে সকল আত্মীয় দূরে—বহুদূরে চলে গিয়েছিলেন—তাঁর প্রীতির টানে আবার কাছে এলেন। অনেক দরিদ্র আত্মীয়কে তিনি নিয়মিত অর্থসাহায্য করতেন। ভ্রাতার প্রতি তাঁর স্নেহের তুলনা ছিল না, ভ্রাতার পুত্রকন্যাকে তিনি যেরূপ স্নেহ করতেন—আপন পিতাও তা করেন না। ভ্রাতুষ্কন্যার বিবাহের জন্য তিনি ব্যাঙ্কে কয়েক হাজার টাকা জমা রেখেছিলেন—অত্যন্ত অর্থকষ্টের সময়ও তা তিনি স্পর্শ করেন নি। একবার তিনি বলেছিলেন—"দেখ অমুকের সঙ্গে আচরণটা একটু রূঢ় হয়ে গেছে, সেজন্য আমি বড় দুঃখিত। বংশের একমাত্র সন্তান আমার ভাইপোটির বড় ব্যারাম সে সময়ে আমার মাথার ঠিক ছিল না—একটা লেখার জন্য পীড়াপীড়ি করছিল, বড় কড়া কথা বলে দিয়েছি।"

বাড়ীর কারও কোন অসুখবিসুখ হলে তিনি অস্থির হয়ে পড়তেন, তাঁর

লেখা বন্ধ হয়ে যেত, রোগীর শিয়রেই সারাদিন বসে থাকতেন। দূর আত্মীয়ের ব্যারামের সময়েও তাঁকে হাসপাতালে ছুটাছুটি করতে দেখেছি।

সেবাপরায়ণা নিষ্ঠাবতী পরিচর্যারতা হিন্দু রমণীর চিত্র তাঁর সাহিত্যে অনেক স্থলেই আছে। হিন্দুরমণীর এই সেবাধর্মের মহিমা তাঁকে মুগ্ধ করত। তিনি নিজে চিরকালই এই সেবাপরিচর্যার ভিখারী ছিলেন—জীবনের অধিকাংশ কালই হয়ত তিনি রোগে শোকে কোন পরিচর্যাই লাভ করেন নি। এই সেবার প্রতি তাঁর নিজের বড় লোভ ছিল। জীবনে দৈন্য দূর হওয়ার পর তাঁর গৃহে দাসদাসীর অভাব ছিল না—কিন্তু তিনি আত্মীয়জনের, বিশেষতঃ গৃহলক্ষ্মীদের হাতের যত্ন আদর সেবাচর্যা পেয়েই তৃপ্ত হতেন। সেবামাধুরীর লোভেই তিনি আপন গৃহ থেকে ইদানীং আর দূরে যেতে চাইতেন না—বাইরে কোথাও আহারাদি করতে চাইতেন না। গার্হস্থ্যজীবনের প্রতি তাঁর আসক্তি ও মমতা ক্রমেই বেড়ে গিয়েছিল। হায়! সেই শরৎচন্দ্রকে জীবনের শেষ কয়দিন Nursing Home-এ কাটাতে হল! মৃত্যু হল সেখানে।

শরৎচন্দ্রের বন্ধুপ্রীতি ছিল অতুলনীয়। সাহিত্যিকসমাজে তাঁর অনেক বন্ধু ছিল—কিন্তু সে বন্ধুত্ব সাহিত্য সুবাদে নয়, মনের মিল হওয়ার জন্যই। সাহিত্য-প্রীতি বা সাহিত্য-রচনার শক্তির চেয়ে সহৃদয়তাকে তিনি অনেক বড় মনে করতেন। তিনি বলতেন—'সাহিত্যিক বড় হও না হও, মানুষ বড় হও।"

সাহিত্য-সমাজের বাইরে তাঁর বন্ধুর সংখ্যা ছিল ঢের বেশী। জীবনের নানা ক্ষেত্রে তাঁদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল। একবার যার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হত চিরদিন তার সঙ্গে সে ঘনিষ্ঠতা থেকে যেত। পরিচিতদের মধ্যে যার ভিতর কোন প্রকার মনুষ্যত্বের পরিচয় পেতেন—সে যতই অধম, যতই অশিক্ষিত, যতই নগণ্য হোক, তার সঙ্গেই তাঁর বান্ধবতা জন্মে যেত। তিনি তার পল্লীজীবনের বন্ধুদের কথা নিয়ে গভীর প্রীতির সঙ্গে গল্প করতেন, ভাগলপুরের বন্ধু, ব্রহ্মদেশের বন্ধু, হওড়া-শিবপুরের বন্ধু—এমন কি পথঘাটের বন্ধু, সকলেই চিরদিন তাঁর স্নিগ্ধমধুর প্রীতির অধিকারী ছিল। সকলেই মনে করতেন—'আমাকে শরৎ দাদা যেমন ভালবাসেন—তেমন ভাল বুঝি আর কাউকে বাসেন না।' তাঁর স্নিগ্ধ মধুর কণ্ঠের আপ্যায়নে সকলেই তুষ্ট হতেন।

বন্ধুদের জন্য তাঁকে অনেক ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছে। অনেক অর্থই তাদের জন্য গিয়েছে। নানা শ্রেণীর লোককে বন্ধু বলে স্বীকার করার যে দণ্ড, সে দণ্ড তাঁকে ভুগতে হয়েছিল। মানুষের নাম যশ প্রতিষ্ঠা আর্থিক উন্নতি হলে অনেকেই বান্ধবতা করতে আসে—কিন্তু তাদের বন্ধু বলে স্বীকার করে কয়জন?

বন্ধুদের সঙ্গে মিলতে মিশতে, গল্প করতে, হাসতে খেলতে রঙ্গ রসিকতা করতে ও উৎসবে মাততে তিনি ভালবাসতেন। সভাসমিতি তিনি এড়িয়ে চলতেন—সভায় উপস্থিত হব বলে কথা দিয়েও তিনি কথা রাখতে পারতেন না। সভাপতিত্ব স্বীকার করেও তিনিও অনেক সময়ে সভায় যেতেন না, কিন্তু কখনও আত্মীয় বন্ধুর অথবা বন্ধুগোষ্ঠীর আমন্ত্রণ উপেক্ষা করেন নি। ঘনিষ্ঠ বন্ধুজনের সংসর্গ ও সাহচর্য ত্যাগ করে যেতে হবে বলে অনেক সময়ে তাঁর সভায় উপস্থিত হওয়া সম্ভব হত না। বন্ধুগণকে তিনি অনেক সময় নিজের বাড়ীতেই পেতেন। যখন পেতেন না—তখন নিজেই তাদের বাড়ী গিয়ে উপস্থিত হতেন। দরিদ্র বলে কখনও কোন বন্ধুজনকে তিনি উপেক্ষা করেন নি। যে কুটীরে কখনও কোন বড় লোকের পদার্পণ ঘটে নি—সে কুটীরের বেঞ্চিতে বসে কয়েক ঘণ্টা তিনি গল্প করে কাটিয়ে দিতেন।

বন্ধু ও অনুরক্তগণের সঙ্গে মিশে তিনি শুধু আনন্দই উপভোগ করতেন না—তাদের দুঃখজ্বালারও ভাগ নিতেন। বিপদে-আপদে তিনি সর্বাগ্রে গিয়ে পাশে দাঁড়াতেন, তাদের সাংসারিক সুখদুঃখের খোঁজ নিতেন, তারা বিপন্ন হলে তাঁর উদ্বেগের অবধি থাকত না। যতদিন বিপদ কেটে না যেত—ততদিন তিনি অস্বস্তি অনুভব করতেন, তাদের বাড়ীর কারও ব্যারাম পীড়া হলে নিজে এসে খোঁজখবর নিতেন, চিকিৎসা সম্বন্ধে উপদেশ দিতেন, কোন-কোন ক্ষেত্রে নিজেই শুশ্রূষা করতে লেগে যেতেন।

অনুরক্ত বন্ধুগণের যাতে মানমর্যাদা বাড়ে সেজন্য তাঁর চেষ্টার ক্রটী ছিল না। মুক্তকণ্ঠে তাদের গুণকীর্তন করতেন, তাদের কৃতিত্বে গৌরব অনুভব করতেন ও কখন কখন নিজের মান খর্ব করে তাদের মান বাড়িয়ে তৃপ্তি লাভ করতেন। যাঁরা তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশেছেন, এ সকল কথা তাঁরা ভাল করেই জানেন।

যাঁরা তাঁর সাহিত্য পাঠ করেছেন—তাঁরা জানেন মানুষের প্রতি তাঁর কত দরদ ছিল। এ দরদ তাঁর সাহিত্যরচনাতেই ফুরিয়ে যায় নি—এ দরদ তাঁর সাহিত্য-সৃষ্টির জন্য গোপন উপাদান মাত্র নয়, তাঁর লৌকিক ও ব্যবহারিক জীবনেও এই দরদের পরিচয় পাওয়া যেত। লাঞ্ছিতের প্রতি দরদের জন্যই তিনি রাজনীতি ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। দেশের জন্য যাঁরা নানা নিগ্রহ ভোগ করেছিলেন—তাঁদের জন্য তিনি অজস্র অর্থ ব্যয়ও করেছিলেন এবং নিজেও কঠোর নিগ্রহের সম্মুখীন হয়েছিলেন। যে-শরৎচন্দ্র বিনা পারিশ্রমিকে লেখনী ধারণই করতেন না—অগ্রিম অর্থ নিয়েও সময়মত লেখা দিতে পারতেন না—সেই শরৎচন্দ্রই আবার তাঁদের অনুরোধে বিনা পারিশ্রমিকে অবিলম্বে লেখা যোগাতেন। তিনি

তাঁদের জন্য যে কত প্রকারে ত্যাগ স্বীকার করেছেন—তা তাঁর রাজনীতিক্ষেত্রের সহযোগিগণই জানেন।

দুঃখী-দরিদ্রদের কথা নিয়ে তিনি আলোচনা করতে ভালবাসতেন—তাদের কথা বলতে বলতে তাঁর চোখ ছলছল করে উঠত—তাঁর কণ্ঠস্বর গদ্‌গদ্ হয়ে উঠত। শরৎচন্দ্র যখন সাংসারিক সুখে নিশ্চিন্ত জীবনযাপন করেছিলেন, তখনও তাদের জন্য তাঁর বেদনার অবধি ছিল না। অনেক সময়ে তাঁকে বিষণ্ণ হয়ে বসে থাকতে দেখে বলেছি—"আপনার কি শরীর অসুস্থ? এমন মুখ ভার করে বসে আছেন কেন?"

শরৎচন্দ্র তখন একটা করুণ চিত্রের কথা অথবা কোন দুঃস্থ পরিবারের দুর্গতির কথা উল্লেখ করে বলতেন—"এই ব্যাপারটার জন্য কাল থেকে মনটা বড়ই খারাপ হ'য়ে আছে। কি করা যায় ভেবে পাচ্ছি না। আমি যথাসাধ্য সাহায্য করেছি—কিন্তু তাতে কি হবে? মরুভূমিতে অশ্রুপাত! চিরদিনের দুঃখী এরা, মুষ্টিভিক্ষায় এদের কি হবে?"

এক-এক সময়ে তিনি বলতেন—"আমাদের এই বাংলাদেশ যে কত দুঃখী, কত দুর্গত, তা আমাদের দেশের শাসকরাও জানে না, দেশের বড় বড় পণ্ডিত, কবি, জননেতারাও জানেন না। এ কি শুধু উদরান্নের অভাব? কত অভাব, কত দুঃখ, কত জ্বালা যে তার হিসাব কেউ রাখে? পল্লীগ্রামে বাস না করলে কেউ জানতে পারে না। পল্লীতে যারা স্বচ্ছন্দে বাস করে—তাদের দেখে দেখে চোখ সয়ে গেছে—অস্বাভাবিক বলে একটুও মনে হয় না—তারা অনুভবই করে না। নগরে যারা সুখের জীবনযাপন করছে তারা যদি কিছু কাল পল্লীগ্রামে গিয়ে থাকে এবং তাদের সঙ্গে বন্ধুভাবে মেশে তাহলে বুঝতে পারবে তাদের ব্যথা কত বিচিত্র—কত গভীর কত দুর্বিষহ। তাদের অন্নকষ্ট হয়ত কোনদিন ঘুচলেও ঘুচতে পারে—কিন্তু তাদের পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের যে সব নিদারুণ দুঃখ, সেগুলো কেউ কখনো ঘুচাতে পারবে বলে মনে হয় না।"

এই বলে তিনি একের পর এক বিচিত্র ধরনের দুঃখের কাহিনী বিবৃত করে যেতেন তাঁর স্বভাব-স্নিগ্ধ সরস ভঙ্গীতে। একটা অপূর্ব বেদনাবিলাস দেখেছি তাঁর মধ্যে। দিনের পর দিন, ঘণ্টার পর ঘণ্টা বাঙ্গালী জীবনের বিচিত্র দুঃখের কাহিনী তাঁর মুখে শুনেছি। এতে তাঁর ক্লান্তি ছিল না। হৃদয়ের গভীর বেদনানুভূতির প্রকাশ করে তিনি কি আত্মপ্রসাদ, কি তৃপ্তিই যে লাভ করতেন তা তিনিই জানেন। তাঁর কাছ থেকে উল্লসিত হৃদয়ে ফিরতে পাই নি—বেদনা ভারাক্রান্ত চিত্তে দীর্ঘশ্বাস ফেলতে ফেলতেই গৃহে ফিরতে হয়েছে। তাওারতম্য

সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য অবিরাম বিলাসকে এমন করে সাধে সুখে বেদনার অশ্রুধারায় ধৌত করে ভোগ করতে কাউকেও দেখি নি। ভগবান শরৎচন্দ্রকে বেদনার নবনী দিয়ে গড়েছিলেন—বাল্যকাল থেকে তিনি অনেক দুঃখ পেয়েছিলেন—চিরদিন দুঃখীদের মধ্যেই কাটিয়েছিলেন—দুঃখ দিয়ে তিনি তাঁর সাহিত্য গড়েছিলেন—তাঁর পরিকল্পিত চরিত্রগুলির বেদনাঘন জীবনে তাঁর নিজের জীবনেরই যেন আংশিক অভিব্যক্তি ঘটেছে। পরবর্তী জীবনে তিনি মান যশ প্রতিষ্ঠার চূড়ান্ত সীমায় উঠলেন, কমলার কৃপাও লাভ করলেন, সাংসারিক দুঃখকষ্ট তাঁর কিছুই থাকল না, সন্তান-সন্ততির দল এসে তাঁর শান্তিভঙ্গ ঘটাল না, নিশ্চিন্ত জীবনে তিনি প্রতিষ্ঠিত হলেন। তাঁর জীবনের সকল অঙ্গেরই পরিবর্তন ঘটল—কেবল দরদী হৃদয়টি অপরিবর্তিতই থেকে গেল। দরদের দণ্ড থেকে তিনি অব্যাহতি পেলেন না। জীবনের উৎসব ক্ষেত্রে, তিনি দুঃখের স্মৃতি, দুঃখের স্বপ্ন, দুঃখের চিন্তায় অন্যমনা হয়ে উদাসী হয়ে রইলেন। কারুণ্যঘন হৃদয় তাঁকে সুখৈশ্বর্য ভোগ করতে দিল না। বালিগঞ্জের আত্মসুখসর্বস্ব ভোগপিপাসাময় পরিবেষ্টনীর মধ্যে গৃহনির্মাণ করে তিনি বাস করতে এসেছিলেন—কিন্তু তাঁর মন পড়ে থাকল রূপনারায়ণের কূলে দুঃখী কাঙালদের কুটিরে। তাই বারবারই তিনি সেখানে ছুটে যেতেন, দুর্গত বঙ্গদেশ থেকে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি আপনাকে বিচ্ছিন্ন করতে পারেন নি।

এই রূপনারায়ণ নদীর তীরে গৃহ-নির্মাণ করে বাস করারও একটা ইতিহাস আছে। যখন তিনি শিবপুর ছেড়ে সামতাবেড়ে বাস করতে যান—তখন তাঁর আর্থিক অবস্থা খুবই ভাল। তখন তিনি শিবপুরেই গৃহ-নির্মাণের সংকল্প করছিলেন। সহসা একদিন শুনলেন—তাঁর ভগিনীর গ্রাম সামতাবেড়ে দারুণ দুর্ভিক্ষ হচ্ছে। তিনি তখনই ভাবলেন এই সময়ে ঐ গ্রামে একটা বড় বাড়ী করলে গ্রামের লোক খেটে অন্নোপার্জন করতে পারবে। এই ভেবে তিনি প্রায় বিশ হাজার টাকা খরচ করে একটি প্রকাণ্ড বাড়ী তৈরী করে বাস করতে গেলেন। যে গ্রামে প্রায়ই দুর্ভিক্ষ হয়—বেছে বেছে শরৎচন্দ্র সেই গ্রামেই বাস করতে গেলেন। যেরূপ আর্থিক অবস্থা হলে লোকে দুঃখী কাঙালদের কাছ থেকে দূরে থাকতেই চায়—শরৎচন্দ্র সেই অবস্থায় গেলেন তাদের মধ্যেই বাস করতে। গ্রামের বহু লোক তাঁর গৃহে আশ্রয় পেয়েছিল। সকলেই অন্নবিস্তর তাঁর দ্বারে সাহায্য পেয়েছিল। পরে তিনি গ্রাম ছেড়ে চলে গেলে তারা হাহাকার করেছে।

বাঙালী নারীর দুঃখই শরৎচন্দ্রকে বিচলিত করত সবচেয়ে বেশি। তাঁর সাহিত্যে তাদের বেদনাই সবচেয়ে বেশী স্থান জুড়ে আছে। জীবনে তিনি বহু

অসহায় বিপন্ন নারীর দুঃখ দূর করতে চেষ্টা করেছেন। আমরা দু'চারটি দৃষ্টান্ত জানি। তিনি বলতেন—"বাঙ্গালী নারীর মত দুঃখিনী জগতে নেই। এদের কোন সহায় নেই। পুরুষরা নয়, সমাজ নয়, লৌকিক ধর্ম নয়, শাস্ত্র নয়, দেশের আইন পর্যন্ত এদের সহায় নয়—এমন কি বাঙ্গালী নারীও বাঙ্গালী নারীর সহায় হয় না। বরং নারীই নারীর পরম শত্রু।"

যারা নিজে লাঞ্ছিতা প্রকৃতপক্ষে তারাই অত্যাচার করে সবচেয়ে বেশি। তারা যে লাঞ্ছনা ভোগ করতে বাধ্য হয়—সেই লাঞ্ছনা তারা অপরের উপর করে মনে করে প্রতিশোধ নেওয়া হল—প্রতিকার হল। যে জীবনে কখনো করুণা পায় নি—সে অপরকে করুণা করবে কি করে? কোন অভাগিনী শরৎচন্দ্রের কাছে সাহায্যপ্রার্থী হয়ে ব্যর্থমনোরথ হয় নি।

পতিত, উপেক্ষিত, ভ্রান্ত যারা, তাদের প্রতিও শরৎচন্দ্রের দরদ ছিল খুব বেশী। পথভ্রষ্ট ও অপরাধী বলে কেউ শরৎচন্দ্রের সহানুভূতি হারায় নি। শরৎচন্দ্র বলতেন—"দেখ, কেউ জীবনে ভুল করেছে বা অপরাধ করেছে বলে তাকে ঘৃণা করা মহাপাপ বলে মনে করি। আমরা নিজেরা এত ভুল করি, এত অপরাধ করি যে আমাদের ঘৃণা করবার অধিকারই নেই। অনেক সময়ে বিচারক ও আসামীর মধ্যে তফাৎ অতি সামান্য। একই পাপ করে একজন ধরা পড়েছে বলে আসামী, আর একজন ধরা পড়ে নি বলেই বিচারাসনে বসে তার বিচার করছে। তারপর যাদের আর্থিক দৈন্য তোমরা তাদেরই কৃপার পাত্র মনে কর; যারা morally poor বা intellectually poor তাদের ঘৃণা কর কেন? সকল শ্রেণীর চরিত্রই সমাজে ক্ষমার পাত্র। কাউকে দিতে হবে ভিক্ষা, কাউকে দিতে হবে শিক্ষা। কাউকে দিতে হবে সৎপথে দীক্ষা—কিন্তু সহানুভূতি দিতে হবে সকলকেই।"

আমি শরৎচন্দ্রকে একজন philanthrophist বানাতে চাই না—তিনি জীবনের দুঃখ দূর করবার ব্রত তো গ্রহণ করেন নি, তবে কি করে দেশের দুঃখ নিবারিত হতে পারে সে জন্য হয়ত তিনি মাঝে মাঝে চিন্তা করতেন, কিন্তু সে চিন্তাকে কোন অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানে রূপদান করতে চেষ্টা করেন নি। আমার প্রতিপাদ্য তাঁর হৃদয়টি ছিল কারুণ্যঘন। এই হৃদয়ে তিনি নিজে যে বেদনা ও অস্বস্তি অনুভব করতেন—সেই বেদনা অস্বস্তি থেকে অব্যাহতি পাওয়ার জন্যই তিনি সদা ব্যস্ত হতেন।

মানুষের সম্বন্ধে তাঁর যে দরদ ছিল—পশুপক্ষীর সম্বন্ধেও সেই দরদ ছিল। তাঁর বাড়ীর কাছে একটা খোলা জায়গায় এক গোয়ালা পা ভাঙা রুগ্ন একটি

গাভীকে ফেলে সরে পড়েছিল। গাভীটির আর্তনাদ শরৎচন্দ্রের কর্ণগোচর হলে তিনি গোয়ালার সন্ধান করে বার করলেন। গোয়ালা তাকে কিছুতেই ঘরে নিয়ে যেতে চাইল না—তখন শরৎচন্দ্র Ambulance গাড়ী ডেকে গোরুটিকে নিজ ব্যয়ে পশু হাসপাতালে পাঠিয়ে নিশ্চিন্ত হলেন।

উলুবেড়িয়া মহকুমায় এক পুকুরে এমনি একটি গোরু জীবন্ত অবস্থায় তিলে তিলে পচছিল—গ্রামবাসীরা নাকে কাপড় দিয়ে যাতায়াত করত। শরৎচন্দ্র সংবাদ পেয়ে বহু লোকজনের সাহায্যে সেটিকে তোলালেন। সেটিকে অবশ্য বাঁচাতে পারেন নি, কিন্তু বাঁচাবার চেষ্টার তিনি ত্রুটি করেন নি—এইরূপ বহু ঘটনা ঘটেছে।

কারও বাড়ীতে গিয়ে শীর্ণ জীবজন্তু দেখলে তিনি গৃহস্বামীর উপর কুপিত হতেন, তিরস্কারও করতেন। যতক্ষণ গৃহস্বামী লজ্জিত হয়ে তাদের আহার ও পরিচর্যার ব্যবস্থা করবেন বলে অঙ্গীকার না করতেন—ততক্ষণে তিনি প্রসন্ন হতেন না, অন্য কোন প্রসঙ্গে মনও দিতেন না, আসন পর্যন্ত গ্রহণ করতেন না বা জলগ্রহণ করতেন না। যারা পালিত পশুকে পেট ভরে খেতে দেয় না বা সেবাযত্ন করে না—তাদের প্রতি তাঁর দারুণ অশ্রদ্ধা ছিল।

বন্ধুবর শ্রীগিরিজামোহন সান্যাল একবার শরৎচন্দ্রকে নিয়ে কোন শহরের এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির বাড়ীতে ওঠেন। সেই বাড়ীতে পৌঁছে রাত্রিকালে ভোজনের সময়ে শরৎচন্দ্র বললেন, "গিরিজা, তুমি বলেছিলে এরা খুব সজ্জন সহৃদয় লোক। মিথ্যা কথা বললে কেন? যাদের বাড়ীর পোষা-কুকুরের এমন দশা, পেট ভরে খেতে পায় না, তারা কখনও সজ্জন হতে পারে? না, আমি এক্ষুণি এ বাড়ী থেকে চলে যাব। তুমি আজ রাত্রে না হোক—কাল সকালে আমাকে হোটেলে নিয়ে যেও।"

এই বলে তিনি একে একে পাতের সমস্ত লুচি ও মিষ্টান্নগুলি কুকুরটির মুখে তুলে দিয়ে বললেন—"আচ্ছা, দেখ দেখি জীবটা কতকাল খেতে পায় নি!"

তিনি বলতেন—"দেখ, হিন্দুরা গোরুকে বলে মা ভগবতী। হিন্দুর ঘরে আজকাল মায়ের যেমন দশা—গাভীরও তেমনি দশা। মুসলমান খৃষ্টানে গোহত্যা করে—একেবারেই সাবাড় করে। আর হিন্দুরা গোহত্যা করে তিলে তিলে। আমাদের দেশের গোয়ালাদের মত পাষণ্ড বোধহয় পৃথিবীতে নেই। তাদের অত্যাচারে এদেশে গোদুগ্ধ গোরক্তে পরিণত হয়েছে।"

শরৎচন্দ্রের 'ভেলি' বলে একটি কুকুর ছিল—তার জন্য তাঁর দুর্ভোগ কম হয় নি। ভেলি ক্ষেপে শরৎচন্দ্রকে ক্ষতবিক্ষত করে দিয়েছিল। এই ভেলিকে তিনি

চপ, কাটলেট্ ও রাজভোগ খাওয়াতেন। কেউ যদি শরৎচন্দ্রকে শ্রদ্ধাভরে কোন উৎকৃষ্ট খাদ্য উপহার দিয়ে আসত—তবে তা ভেলিরই ভোগে লাগত। একদিন বলেছিলাম—"আপনার কাছে যা সুখাদ্য, ভেলির কাছে তাই সুখাদ্য হবে এটা মনে করেন কেন? ওর হয়ত পচা মাংস, মাছের কাঁটা ইত্যাদিই রাজভোগ। চপ কাটলেট সন্দেশের মর্যাদা ও কি বুঝবে?"

শরৎচন্দ্র বললেন—"ঠাকুরকে তোমরা কি খেতে দাও? ঠাকুর কি খাদ্য ভালবাসেন তা কি তোমরা জান? ঠাকুর কি তোমাদের তা বলেছেন? তিনি কি খান, না খান সে কথা ছেড়েই দিলাম। তোমার কাছে যা উৎকৃষ্ট খাদ্য তাই তো তুমি ঠাকুরকে দাও। কুকুরকে যদি ঘেন্না না করতে—তবে বলতাম ঠাকুর সম্বন্ধে যে ব্যবস্থা—তাঁর সৃষ্ট জীব কুকুর সম্বন্ধেও সেই ব্যবস্থা। কুকুর তো মুখ ফুটে বলতে পারে না। আমার যা প্রিয় খাদ্য তাই ওকে দিয়ে তৃপ্তি পাই। আমার মনে হয় ভেলি সুখাদ্যগুলোকে appreciate করে। তা না করলে সে-ও ত আগ্রহের সঙ্গে ওগুলো খেত না।"

এই ভেলি কুকুরটি মরে গেলে শরৎচন্দ্র পুত্রশোক পেয়েছিলেন। সে যে তাঁকে কামড়ে তাঁর প্রাণসংশয় ঘটিয়েছিল—সে কথা তিনি একবারও ভাবতেন না।

"একে অবোলা জীব, তাতে তার মৃত্যুরোগ; তার কোন অপরাধই নেই। আমার তো ইন্‌জেকশন নিয়ে প্রাণ বেঁচে গেল—তাকে তো বাঁচাতে পারলাম না।"—এই বলে কত আক্ষেপ করতেন। তিনি ভেলির মৃতদেহের উপর একটি সমাধি রচনা করেছিলেন।

জীবজগতের প্রতি এই অপরিমেয় মমতা নিয়েই তিনি চন্দ্রনাথের শেষে ভরতের উপাখ্যানটি লিখেছিলেন। শরৎচন্দ্রের রচনায় যে দরদ ফুটেছিল তা সাহিত্যসৃষ্টির জন্য মর্মের বাহির থেকে আমদানী করা নয়—তা মর্মের গভীর স্তরের সূক্ষ্মতম সম্পদ।

তাঁর সাহিত্যসেবার বিরুদ্ধে এ দেশে কত অভিযানই না হয়েছিল—চারদিক থেকে কত নিন্দাবাণই না বর্ষিত হয়েছিল! তাতে তিনি কোন বেদনা যে পান নি তা আমি বলছি না। তবে সকল ক্ষেত্রেই তিনি হেসে উড়িয়ে দিতেন। মহাকালের ও মহামানবের বিচারের উপর তাঁর গভীর শ্রদ্ধা ছিল। বিরুদ্ধ সমালোচনার বিষয় নিয়ে তিনি কখনও উষ্মা প্রকাশ করেন নি—উত্তর দেওয়ার জন্য অথবা আত্মসমর্থনের জন্য কখনও লেখনী ধারণ করেছিলেন বলে মনে পড়ে না। তাঁর অনুরাগী ভক্তের তো অভাব ছিল না—তা সত্ত্বেও কখনও তাদের এ শ্রেণীর আক্রমণের জবাব দেবার জন্য, প্রত্যাঘাত করবার জন্য আদেশ বা

অনুরোধ করেন নি। আমরা অনেক সময় বলেছি—"এই আক্রমণের কি আমরা একটা জবাব দেব?" তিনি উত্তর দিয়েছেন—"পাগল নাকি? জবাব দিয়ে তুমি ঐ আক্রমণটির importance বাড়িয়ে আমারই অপমান করবে? এ সকল দোষারোপের কোন জবাব দিলে তোমাদের সঙ্গে আমার কোন সম্বন্ধ থাকবে না। এরা একটু ব্যস্তবাগীশ, মহাকাল কবে বিচার করবেন, তার ভরসায় বসে থাকতে চায় না। এরা চায় এদের বিচারটাই মহাকাল মাথা পেতে নিন।"

যারা একদিন তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করেছিল—তাদের অনেককেই তাঁর গৃহে বসে স্নেহ ও বান্ধবতা লাভ করতে দেখেছি। ক্ষমাশীল শরৎচন্দ্র সব ভুলে যেতেন। তিনি বলতেন—"কদিনের জীবন ভাই, এই স্বল্পায়তন জীবনে লোকের সঙ্গে ঝগড়াবিবাদ কি রাখতে আছে?" বিরুদ্ধবাদীরা আনুগত্য করলে তিনি বলতেন—"যে মানুষ অপরাধ করেছিল সে মানুষ তো আর নেই—রাগ করব কার ওপর? আর অপরাধটা আমারও তো কম হয় না।"

শরৎচন্দ্রের কাছে যাঁদের কৃতজ্ঞ থাকবার কথা এমনও কেউ কেউ তাঁর রচনার গ্লানি প্রচার করেছিলেন। তাঁদের প্রসঙ্গ উঠলে তিনি বলতেন—"দেখ, কৃতজ্ঞতা মানুষের একটা প্রধান অঙ্গ। কৃতজ্ঞতা বিধাতার বড় একটা দান। বিধাতা যাকে সকল দান থেকে বঞ্চিত করেছেন তাকে অত বড় দানটা কি করে দেবেন, বল।"

আমি বললাম—"যারা আপনার লেখার ওপর দশ বছর ধরে দাগা বুলিয়ে লিখতে শিখেছে, আর যা হোক তাদের উচিত নয় আপনাকে ব্যঙ্গ করা।"

শরৎচন্দ্র বললেন—"আরে তুমি যে উল্টা বুঝলে। তারাই তো ব্যঙ্গ করবে—তাদের তো প্রচার করতে হবে যে ঋণী নই, পাছে ঋণ ধরা পড়ে।"

আমি বললাম—ধ্বনিটিরে প্রতিধ্বনি সদা ব্যঙ্গ করে।
ধ্বনি কাছে ঋণী সে যে পাছে ধরা পড়ে॥

শরৎচন্দ্র বললেন—"বাঃ বাঃ বেশ কথাটি তো। এ কার লেখা? এত রবীন্দ্রনাথের না হয়ে যায় না। রবীন্দ্রনাথের তো?"

আমি সম্মতি জানালে তিনি বললেন—"অনেক দুঃখেই লিখেছেন হে।"

বিরুদ্ধবাদীদের নিয়ে এর বেশী কথা তাঁর মুখে কখনও শুনি নি। আমরা অনেক সময়ে তাঁর সঙ্গে সমান তালে তর্কবিতর্ক করেছি। অন্য কেউ হলে বিমুখ হতেন। তিনি আমাদের সকল ধৃষ্টতা, সকল প্রগলভতাই ক্ষমা করেছিলেন।

কোন একজন প্রতিবেশী সাহিত্যিকের সঙ্গে কোন কারণে তাঁর মনোমালিন্য ঘটে। এটা এত দূর গড়িয়েছিল যে পরস্পরের বাড়ী আসা-যাওয়া মুখ দেখাদেখি পর্যন্ত বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। শরৎচন্দ্র যেদিন শুনলেন প্রতিবেশী সাহিত্যিকটির

কন্যার মৃত্যু হয়েছে—সেদিন তিনি সব অমর্যাদার কথা ভুলে তাঁর বাড়ী গিয়ে তাঁকে আলিঙ্গন করলেন। পূর্বেও তাঁর সঙ্গে একবার মনোমালিন্য ঘটেছিল—শরৎচন্দ্র তাঁর জন্মোৎসব বাসরে তাঁকে সাদর আলিঙ্গন করে মনের সমস্ত গ্লানি বিদূরিত করেছিলেন।

শরৎচন্দ্রের মেজাজ ছিল খুবই ঠাণ্ডা। কখনও তাঁকে কুপিত হয়ে কটু বাক্য প্রয়োগ করতে শুনি নি, গৃহের ভৃত্যগণের প্রতিও নয়। ভৃত্যদের তিনি পরিজনের মত মনে করতেন এবং সস্নেহ কণ্ঠে নাম ধরে ডাকতেন।

কেউ কেউ মনে করতেন—শরৎচন্দ্র বুঝি বালিগঞ্জে বাড়ী করে মোটরে চড়ে aristocratic হয়ে গিয়েছিলেন। এ ধারণা সর্বৈব মিথ্যা! তাঁর আহারে-বিহারে, পোশাক-পরিচ্ছদে, আসবাবপত্রে, চালচলনে, কথাবার্তায় বিন্দুমাত্র বড়মানুষির আভাস ছিল না। তাঁর গৃহ দুঃস্থ আত্মীয়গণের আশ্রয় ছিল। তাঁর ঘরে সকলেরই দ্বার অবারিত ছিল—ইস্কুল-কলেজের কোন ছাত্র গেলেও তিনি তার সঙ্গে দুই ঘণ্টা আলাপ করতেন। শরৎচন্দ্র বাড়ীতেই আছেন—অথচ দেখা হল না—এইরূপ ব্যবহার ঘটেনি।

দরিদ্র বন্ধুদের গৃহে তিনি ভাঙা চেয়ারে অথবা ধূলিমলিন সতরঞ্চের উপর ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে কাটাতেন। মোটরে তিনি চড়তেন বটে—কিন্তু পাশে আমাদের মত দরিদ্র ইস্কুলমাস্টারকে নিয়ে বার হতেন। অনেক সময়ে শুধু গেঞ্জি গায়ে দিয়েই সাহিত্যিক মজলিসে আসতেন—রসচক্রের উদ্যানসম্মিলনীতে বেলা তিনটার সময়ে সকলের সঙ্গে কলার পাতায় ভাত-ডাল খেতে তাঁর আপত্তি ছিল না। সবচেয়ে বড় কথা—'দাদা' বলবার অধিকার দান। দেশের অনেক গণ্যমান্য বর্ষীয়ান লোকের সঙ্গেই ঘনিষ্ঠতা আছে—কিন্তু তাঁদের কাউকে দাদা বলে ডাকতে সাহস করি নি। তাঁরাও 'আপনি' না বলে 'তুমি' সম্বোধন করেও সে অধিকার দেন নি। তাঁরা এক মুহূর্তের জন্যও ভুলতে পারেন নি, আমি একজন সামান্য ইস্কুলে মাস্টার আর তাঁরা পদস্থ গণ্যমান্য ব্যক্তি।

শরৎচন্দ্র ছিলেন বয়ঃকনিষ্ঠ সকল পরিচিত লোকেরই দাদা।

একদিন তিনি বলেছিলেন—"দাদাই যদি বল—তবে নাম ধরে দাদা বল কেন? আমি যে দাদা—সে বিষয়ে সন্দেহ তো একেবারেই নেই; এক পরিবারে জন্মালেই শুধু দাদা-ভাই সম্বন্ধ হয় না। সরস্বতী যদি মা-ই হন—তবে আমরা তো এক মায়েরই ছেলে। বিধাতা আমাকে দাদা করেই যে সৃষ্টি করেছেন।"

বাড়ী-গাড়ী আমাদের সঙ্গে তাঁর কোন ব্যবধানই সৃষ্টি করতে পারেনি।

একদিনের কথা মনে পড়ে—সঙ্গে ছিলেন অসমঞ্জবাবু। সাহিত্যিক অধ্যাপক

চারুবাবুর মেয়ের বিয়ে। বরানগরের নিকটবর্তী একটি গ্রামে তাঁর অস্থায়ী বাসা ছিল। সেদিন অবিশ্রান্ত বৃষ্টি হচ্ছিল—শরৎচন্দ্রের সেদিন অসহ্য দন্ত-শূল। আমি বললাম—"এমন দুর্দিনে অত দূরে গিয়ে আর কাজ নেই। আপনারও শরীর অসুস্থ; আকাশটাও ভালো নেই।"

শরৎচন্দ্র বললেন—"বল কি? চারুর মেয়ের বিয়ে। ঢাকায় নয়, কলকাতার কাছেই। না গেলে কি চলে? যেতেই হবে।"

বড় রাস্তার উপর মোটর দাঁড়াল—আর চলার উপায় নেই। সেখান থেকে কাঁচা রাস্তা অনেকটা। রাস্তায় এক হাঁটু জল দাঁড়িয়েছে। হেঁটেই যেতে হবে। অসমঞ্জবাবু বললেন—"ফিরতেই হল দাদা। আর তো যাবার উপায় নেই।" শরৎচন্দ্র বললেন—"তোমরা বড় শহুরে বনে গেছ। পাড়া-গাঁ হলে কি করতে? জুতো হাতে করে এ পথটুকু হেঁটেই যাব। এতদূর এসে ফিরে যাব, বল কি?"

শরৎচন্দ্র জুতো হাতে করে অন্ধকারে জল ভেঙ্গে চললেন—বাধ্য হয়ে অনুসরণ করলাম। পথে সুরকী গাদা করা ছিল—তার মধ্যে পড়ে দুর্গতির অবধি থাকল না।

শরৎচন্দ্র বললেন—"চিরকাল এই করে এসেছি। পাড়াগেঁয়ে লোক আমি, সহসা বাবু বনে যাব কোন্ দুঃখে? তোমাদেরই কষ্ট হলো। আমার কোন কষ্ট হয় নি।"

শরৎচন্দ্রের সাহিত্যে যে পল্লীজীবনের প্রতি মমতা ফুটেছে তা আদৌ পোশাকী ধরনের নয়। শরৎচন্দ্রের পল্লীপ্রীতি ছিল আন্তরিক ও অকৃত্রিম। বালিগঞ্জে প্রবাসী শরৎচন্দ্র একটি দিনের জন্যও পল্লীকে ভুলতে পারেন নি।

এমন যে দরদী শরৎচন্দ্র—তিনি নির্ভীক কম ছিলেন না। ইন্দ্রনাথ জীবন্ত মানুষ—শরৎচন্দ্র সত্যই তাঁর দুঃখের সঙ্গী ছিলেন। বাল্যযৌবনে শরৎচন্দ্র ভয় কাকে বলে তা জানতেন না। তাঁর কাছে শ্মশানে ও নাটমন্দিরে কোন তফাৎ ছিল না। কোন বিভীষিকাই তাঁকে কোনদিন বিহ্বল করেনি। বড় গঙ্গা পরে হতে যেমন তিনি ভীত হতেন না—ভূতের সন্ধানে অন্ধকারে বনবাদাড়ে বেড়াতে যেমন তাঁর সাহসের অভাব হয়নি—মহামারীর মধ্যে বিচরণ করতেও তাঁর ভয় করত না। এ-তো গেল বহিরঙ্গের সাহসের কথা। অন্তরঙ্গের সাহস বা moral courage-ও তাঁর কম ছিল না। সাহিত্যে তিনি যে অন্ধ সংস্কারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়েছিলেন—অনেক অপ্রিয় সত্য কথা বলেছেন—লৌকিক আচার-ব্যবহারের বিরুদ্ধে সার্বজনীন সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন—মিথ্যাচারী ভণ্ড কপট সমাজকে কশাঘাত করেছেন—প্রচলিত গার্হস্থ্য ও

সামাজিক প্রথা-পদ্ধতির অসারতা দেখিয়েছেন—তাতে শুধু সাহিত্যিক সাহসই প্রকাশ পায়নি, তাঁর চরিত্রের নির্ভীকতাও তাতে সমভাবে পরিস্ফুট। চরিত্রের দৃঢ়তা ও তেজস্বিতা না থাকলে—আর যে কোন ক্ষেত্রে হোক, সাহিত্যে বিদ্রোহী হওয়া যায় না। কারণ এ সাহিত্যের জন্য সমাজের কাছে সাহিত্যিককে জবাবদিহি করতে হয়।

'পথের দাবী'র লেখককে কতটা সাহস দেখাতে হয়েছে—তা আর নাই বললাম। সামাজিক জীবনেও তাঁকে যথেষ্ট সাহস দেখাতে হয়েছে। সবদিক থেকে বিচার করলে শরৎচন্দ্রকে একজন বীরপুরুষই বলতে হয়। বীরের মতই তিনি নিঃশব্দে ধীরে ধীরে মৃত্যুকে বরণ করেছেন। তিন মাস আগে থেকেই তিনি বুঝেছিলেন—মৃত্যু আসন্ন। প্রায়ই তাঁকে দেখতে যেতাম—কোনদিন তাঁর কথায় মৃত্যু-ভীতি লক্ষ্য করি নি, কোনদিন ব্যাকুলতা বা অস্থিরতাও লক্ষ্য করি নি, মৃত্যুর কথা ভুলে বরং হাস্য-পরিহাসই করেছেন। চূড়ান্ত মান-গৌরব ও পরিপূর্ণ সৌভাগ্য-ভাণ্ডার ছেড়ে তাঁকে যেতে হয়েছে—কিন্তু পিছুপানে চেয়ে কোনদিন হাহাকার করেন নি। সবচেয়ে বড় কথা—যে অজ্ঞাত রহস্যময় দৈবশক্তিকে তিনি কোনদিন মানেন নি—প্রাণের ভয়ে তিনি তাঁরও শরণ গ্রহণ করেন নি। এতে তাঁকে নিরীশ্বর বলে মনে হতে পারে—কিন্তু তদ্দ্বারা নির্ভীকতার চূড়ান্তই তো সূচিত হয়। মৃত্যুকে ভৌতিক দেহটার অনিবার্য পরিণতি বলে মনে করেই তিনি অনাকুল-চিত্তে মৃত্যু বরণ করে গিয়েছেন।

শরৎচন্দ্রের মধ্যে বাল্য থেকেই একটি উদাসী বাউল নিভৃতে সাধনা করেছে। সে গোপীযন্ত্র বাজিয়ে সমাজ-সংসারকে চিরদিন উড়িয়ে দিয়ে এসেছে। সেই বাউলই শরৎচন্দ্রকে ভবঘুরে করে ঘুরিয়েছে—সেই তাঁকে চিরদিন দেহের প্রতি উদাসীন করে রেখেছিল। উত্তরজীবনে সেই বাউলটিকে মন থেকে তাড়াবার চেষ্টা হয়েছিল—কিন্তু সে চলে যাবার লোক নয়! সর্বস্ব ত্যাগের পথে সেই শরৎচন্দ্রকে সঙ্গে করে নিয়ে চলে গিয়েছে। শরৎচন্দ্রের শেষজীবনের রোগভোগ একে একে সকল বন্ধন-মুক্তিরই নিভৃত সাধনা ছাড়া আর কিছুই নয়।

একদিন শরৎচন্দ্রকে বলেছিলাম—"দাদা, আপনার মধ্যে কোথায় একটা দুর্বলতা আছে। সংস্কারমুক্তির বাণী আপনি প্রচার করেছেন—সমাজশাসনকে আবার আপনি মেনেছেন বড় বেশি। সবার উপরে মানুষ সত্য—মানবধর্ম সকল ধর্মের চেয়ে বড় এটা আপনার সাহিত্যেরই মূল-মন্ত্র, অথচ বর্ণাশ্রম ধর্মের দিকে আপনার ঝোঁকও খুব বেশি। আপনার সাহিত্যে দেখি যে-মানুষ সংস্কার-মুক্ত হয়ে চলছে, সমাজকে দিয়ে তার এমনি সাজা দিয়েছেন যেন সে নিদারুণ

অপরাধ করেছে। সংস্কারযুক্ত চরিত্রগুলো শেষকালে সমাজশাসন মেনে নিচ্ছে—অসত্যের সঙ্গে সংগ্রামে সত্যের পরাজয় হচ্ছে বারবার।"

শরৎচন্দ্র বললেন—"বাঙ্গালী সমাজটাই তাই! বাঙ্গালী চরিত্র যা, আমি ঠিক তাই এঁকেছি। বাঙ্গালীর মনে সংস্কারমুক্তির বাণী এসেছে—কিন্তু জীবনে আসেনি, ব্যক্তিতে এসেছে, সমাজে আসেনি। এটা বাঙ্গালীর সমাজজীবনের Transition Period. এই period-এর সাহিত্যে ঐরূপ অসামঞ্জস্য দেখবেই—বঙ্কিমের উপন্যাসেও যা, রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসেও তাই—আমার লেখাতেও তাই। যতদিন না একটা আদর্শ সমাজ গড়ে উঠছে, ততদিন বর্তমান সমাজকে উপেক্ষা করবার উপায় নেই। এই দেখ না, আমি একজন নিজে বাঙ্গালী। জান তো আমি কিছুই মানি না, শাস্ত্রশাসন, সমাজশাসন, ধর্মের শাসন, গুরুপুরোহিতের শাসন কোনটাই মানি না মনে মনে। তবু আচার-আচরণে কিছু কি বুঝতে পার? যাদের নিয়ে এ সংসারে আছি—যাদের ভালবাসি—যারা আমাকে ভালবাসে, তারাও যদি না মানত তাহলে কোন গোল হত না। কিন্তু যারা মানে—তাদের মনে ব্যথা দিয়ে, তাদের উপেক্ষা করে, বিদ্রোহের ধ্বজা তুলে আমি সংস্কারক সাজতে চাই না। তাদের সুখী করে পল্লীজীবনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সমাজ মেনেই চলি। একে দুর্বলতা বলতে পার, ভীরুতা বলতে পার, কপটতা বলতে পার—এটাই খাঁটী বাঙ্গালীর স্বভাব। এর দ্বারাই তারা জাতীয় স্বাতন্ত্র্যটা এখনো রক্ষা করছে।"

পরিশিষ্ট

পত্রাবলী

সুপ্রসিদ্ধ প্রবীণ সাহিত্যিক রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত জলধর সেনের সভাপতিত্বে রসচক্র সাহিত্য সংসদের পক্ষ থেকে বেলঘরিয়ার একটি উদ্যান সম্মেলনে কবি শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন বাগচীকে সম্বর্ধনা দেওয়া হয়। যে সমস্ত প্রবীণ ও নবীন লেখকগণ বিশেষ কারণে এই সম্মেলনে যোগদান করতে পারেন নি তাঁরা পত্রে শুভেচ্ছা জানিয়েছিলেন। এখানে সেইরূপ কয়েকটি পত্র উদ্ধৃত করা হল—

সামতাবেড়, পানিত্রাস
জেলা—হাওড়া

কল্যাণীয়েষু,

ভাই কালিদাস, তোমার চিঠি পেলাম। আমার একটা দুর্নাম আছে যে আমি জবাব দিইনে। নেহাৎ মিথ্যে বলতে পারিনে, কিন্তু যে বিষয়টি নিয়ে তুমি নিমন্ত্রণ পাঠিয়েছো তারও যদি সাড়া না দিই তো শুধু যে অসৌজন্যের অপরাধ হবে তাই নয়, কোন দিক থেকেই যে যতীনকে সমাদর করবার অংশ নিতে পারলাম না সে দুঃখের অবধি থাকবে না। অনেকেই জানে না যে যতীনকে আমি সত্যিই ভালোবাসি। শুধু কেবল কবি বলে নয়, তাঁর ভেতরে এমনি একটি স্নেহ-সরস বন্ধু-বৎসল ভদ্র মন আছে যে তার স্পর্শে নিজের মনটাও তৃপ্তিতে ভরে আসে।

যতীন জানেন, আমি তাঁর কবিতার একান্ত অনুরাগী। যখন যেখানেই তাদের দেখা পাই, বার বার ক'রে পড়ি। স্নিগ্ধ সকরুণ নির্ভুল ছন্দগুলি কানে কানে যেন কত কি বলতে থাকে।

কারও সম্বন্ধেই নিজের অভিমত আমি সহজে প্রকাশ করিনে,—আমার সঙ্কোচ বোধ হয়। ভাবি, আমার মতামতের মূল্যই বা কি, কিন্তু যদি কখনো বলতেই হয় তো সত্যি কথাই বলি। যতীনকে স্নেহ করি, কিন্তু স্নেহের অতিশয়োক্তি দিয়ে তাঁকেও খুশি করতে পারতাম না সত্যি না হলে। যাক এ কথা।

তোমাদের অনুষ্ঠানটি ছোট,—হবেই তো ছোট। কিন্তু তাই বলে তার কাযটি ছোট নয়। এ তো, চ্যাটরা দিয়ে বহুলোক ডেকে এনে উচ্চ কোলাহলে "জয় যতীন্ বাগচী কি জয়!" বলার ব্যাপার নয়, এ তোমাদের ছোট্ট রসচক্রের

প্রীতি-সম্মেলন। অর্থাৎ, কোন একটি বিশেষ দিনে ও বিশেষ স্থানে জনকয়েক সত্যিকার সাহিত্য-রসিক ও সাহিত্য-সেবী একসঙ্গে মিলে আর একজন সত্যিকার সাহিত্যসেবককে সাদরে আহ্বান ক'রে এনে বলা—'কবি, আমরা তোমার সাহিত্যসাধনায় আনন্দ লাভ করেছি, তোমার বাণীপূজা সার্থক হয়েছে, তুমি সুখী হও, তুমি দীর্ঘায়ু হও, আমরা তোমাকে সর্বান্তঃকরণে ধন্যবাদ দিই,—তুমি আমাদের অভিনন্দন গ্রহণ কর।' এই তো? আয়োজন সামান্য বলে তোমরা ক্ষুণ্ণ হয়ো না। কিন্তু তবুও সম্মিলনে একটুখানি ত্রুটি ঘট্‌লো—আমি যেতে পারলাম না। কারণ, আমি বোধকরি তোমাদের সকলের চেয়ে বয়সে বড়।

এ অঞ্চলটায় ব্যারাম-স্যারাম নেই, কিন্তু হঠাৎ কোথা থেকে হতভাগা ডেঙ্গু এসে জুটেছে। সকাল থেকে ছোট্ট ছেলে মেয়ে দুটির চোখ ছল্‌-ছল্‌ করছে, চাকর জন দুই ছাড়া সবাই বিছানা নিয়েছে, আমার এক নাক বন্ধ, অন্যটায় টিউব-ওয়েলের লীলা সুরু হয়েছে, রাত্রি নাগাদ বোধ হয় দেহ-মনপ্রাণ উৎসবে যোগ দিবেন আভাসে ইসারায় তার খবর পৌঁছাচ্ছে। নইলে এ অনুষ্ঠানে আমার নামে তোমাকে গরহাজিরির ঢ্যারা টানতে দিতাম না।

অনেকে উপস্থিত আছো, এই সুযোগে একটা দুঃখের অনুযোগ জানাই। কালিদাস, তুমিও তো প্রায় সাবালক হতে চললে। আগেকার দিনের সকল কথা তোমার স্মরণে না থাকলেও কিছু কিছু হয়তো মনেও পড়বে। এ দিনের মতো সেদিনে আমরা এমন ক'রে পরস্পরের ছিদ্র খুঁজে বেড়াতাম না। এক-আধটা ব্যতিক্রম হয়ত ঘটেছে, কিন্তু এখনকার সঙ্গে তার তুলনাই হয় না। সাহিত্যসেবকদের মাঝখানে ভাবের আদান-প্রদান, একের কাছে অপরের দেওয়া এবং পাওয়া চিরদিনই চলে আসছে এবং চিরদিনই চলবে। কিন্তু তরুণ দলের মধ্যে আজকাল এ কি হতে চললো? নিন্দে করার এ কি উদ্দাম উৎসাহ, গ্লানিপ্রচারের এ কি নির্দয় অধ্যবসায়। কেবলি একজন আর একজনকে চোর প্রতিপন্ন করতে চায়। খবরের কাগজে কাগজে যত দেখি ততই যেন মন লজ্জায়, দুঃখে পরিপূর্ণ হয়ে আসে। ক্ষমা নেই, ধৈর্য নেই, বেদনাবোধ নেই, হানাহানির নিষ্ঠুরতার যেন শেষ হতেই চায় না। কোথায় কার সঙ্গে কার কতটুকু মিলেছে, কার লেখা থেকে কে কতখানি নকল করেছে, রুক্ষ কটু কণ্ঠে এই খবরটা বিশ্বের দরবারে ঘোষণা করে যে এরা কি সান্ত্বনা অনুভব করে আমি ভেবেই পাইনে। ঘরে বাইরে কেবলি জানাতে চায় যে বাঙলাদেশের সাহিত্যিকদের বিদেশের চুরি করা ছাড়া আর কোন সম্বলই নেই।

যতীনকে জিজ্ঞেস করলেই জানতে পারবে অতি পরিশ্রমে খুঁজে খুঁজে এই গোয়েন্দাগিরির কাজটা তখনও আমাদের সাহিত্যিকমহলে প্রচলিত হয়ে ওঠেনি। যাই হোক, কামনা করি তোমাদের রসচক্রের রসিকদের মধ্যে যেন এ ব্যাধি কখনো প্রবেশ করবার দরজা খুঁজে না পায়। কবি নই, মনের মধ্যে কথা জমে উঠলেও তোমাদের মত প্রকাশের ভাষা খুঁজে পাইনে, গুছিয়ে বলা হয় না। তাই চিঠি লেখা হয়ে যায় আমার চিরদিনই এলোমেলো।

তা' হোকগে এলোমেলো, তবু এমনি করেই বলি, তোমাদের রসচক্রের জয় হোক, তোমাদের আজকের আয়োজন সফল হোক এবং যতীনকে বোলো শরৎদা তাঁকে এই চিঠির মারফৎ স্নেহাশীর্বাদ পাঠিয়েছেন। ইতি—৫ই ভাদ্র, ১৩৩০।

—শরৎদা

University of Dacca,
Dacca Hall—Ramna, Dacca
২০।৮।৩১

প্রিয়বরেষু,

কালিদাস,

যতীন ভায়ার অভিনন্দন সংবাদে অত্যন্ত আনন্দিত হলাম। যতীন্দ্রমোহন আমার প্রিয় বন্ধু, তার সাহচর্যে আমার জীবনের বহুদিবস মধুময় হয়েছে, সে সদানন্দ, রহস্যপটু, সুরসিক, মধুবাক, তার লেখনী মধুবর্ষী, সে বাংলা সাহিত্যকে সুমধুর করেছে, তার ভাষার লালিত্য, শব্দের মাধুর্য, আর ভাবের নবীনতা তাকে আমাদের দেশের অগ্রগণ্য কবিদের মধ্যে স্থায়ী আসন দান করেছে। তার সম্বর্দ্ধনা বহু পূর্বেই আমাদের করা উচিত ছিল, এতদিনে তোমরা যে করছ তাতে আমি আন্তরিক আনন্দ ও উৎসাহ অনুভব করছি। যতীন্দ্রমোহনকে আমার আন্তরিক প্রীতিসম্ভাষণ জানাচ্ছি ও আমার অভিনন্দন ও সম্বর্দ্ধনা জানাচ্ছি। ভগবান তাকে সুস্থ রেখে আমাদের বন্ধুজনের ও বঙ্গসাহিত্যের আনন্দ বিধান করুন।

তোমাদের কুশল কামনা করি।

তোমাদের বন্ধুমুগ্ধ
—শ্রীচারু বন্দ্যোপাধ্যায়

ORIENTAL MED. HALL
Bhatta Bazar—Purnea
20. 8. 31

প্রিয় কবিশেখর ভায়া,

তোমার পত্রখানি আমাকে একটু সৌভাগ্যের সুযোগ দিয়েছে, সেটা মফস্বলের লোকের অধিকারের বাইরে। সেজন্য তোমার কাছে আমি কৃতজ্ঞ। প্রবাসী চিরদিনই 'দুঃখভাগিনঃ'। তাই "ছেড়েছি সব অকস্মাতের আশা"। কিন্তু তোমার পত্রে আজ শুনতে পেলুম আগামী রবিবার, কবিবর যতীন্দ্রমোহন বাগচী মশাইকে 'রসচক্রের' তরফ হতে একটি অভিনন্দন দেওয়া হবে। একি অকস্মাৎ। তুমি সংবাদ হিসেবে লিখলেও, আমি সৌভাগ্য হিসেবেই পেলুম। ভারী আনন্দ হচ্ছে।

১২ বছর আগে, 'প্রবাসজ্যোতির' সাহিত্যপ্রসঙ্গে, আক্ষেপ করে লিখেছিলুম·········দেশে কবিতার পাঠক বাড়লেও কবিতা পুস্তক কিনে পড়বার লোক নেই বললেই হয়। গত বিশ বছরের মধ্যে কত শক্তিশালী কবি ও তাঁদের কাব্য আমরা পেয়েছি যা বঙ্গবাণী মন্দিরের প্রিয় সম্পদ। তা থেকে চয়ন করে ২।৪ খানা Selection বেরুলেও যে, পাঠকেরা লেখকদের রস পরিচয় পান, ও উপভোগ করে মুগ্ধও হন, কবিদেরও শ্রম সার্থক হয়। তাঁদের সমগ্র গ্রন্থ পাবার জন্যে তখন লোকের আগ্রহ স্বতঃই বাড়তে থাকে। সকল সভ্যদেশেই এ প্রথা আছে। আমাদের দেশের প্রকাশকেরা এ কাজটিতে হাত দিলে, আমার বিশ্বাস,—ক্ষতিগ্রস্ত হতে হবে না ; দেশ উপকৃত হবে, সাহিত্য-সমৃদ্ধির সাহায্য করা হবে। ইত্যাদি।

আজ ঘাটের কাছাকাছি এসে, শ্রদ্ধেয় কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচী মহাশয়কে অভিনন্দিত করবার সংকল্প দেখে স্বতঃই প্রার্থনা করছি, বাংলাদেশ যেন যোগ্যকে সম্মান দানে কোনদিন কৃপণ না হয়। এ সম্মান দেশেরই সম্মান।

যতীনবাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয়ের সৌভাগ্য আমার ঘটেনি, বা ভাগ্য ঘটতে দেয় নি। তখন কাশীতেই থাকতুম, কিন্তু যেদিন তিনি শ্রীমান সুরেশ চক্রবর্তীর সারস্বত উৎসবে সকলকে আনন্দ দিয়েছিলেন, আমি সেদিন অনুপস্থিত। আবার গত ফেব্রুয়ারী মাসে কলিকাতায় যাই, সেথায় সুরেশের সঙ্গে অভাবনীয় দেখা। শুনলুম সুরেশ শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রবাবুর অতিথি। বললুম—বাঃ বেশ হয়েছে, চলো তাঁর সঙ্গে আলাপ করে আসি। যাঁর কবিতা অত আনন্দ দেয়, তাঁকে দেখব না। ব্রাহ্মণসন্তান অতিথি হতে আমারও তো বাধা নেই, বরং ধর্ম রক্ষাই

হবে। সুরেশ বললে—তিনি তো উপস্থিত নেই, বিষয়কর্ম উপলক্ষে বাইরে গেছেন যে! ভাগ্য! যাক্‌।

একসময়ে 'মানসী ও মর্মবাণী' খুলে প্রথমেই যাঁর কবিতা খুঁজতুম, আজিও যিনি বঙ্গবাণীর সেবায় অকুণ্ঠ, ছন্দে ও রসে খদ্ধ, বঙ্গভারতী তাঁকে অক্ষুণ্ন স্বাস্থ্যে ও সামর্থ্যে রেখে দীর্ঘদিন তাঁর সেবা গ্রহণ করুন, এই প্রার্থনা করি।

আজ এই সুযোগে আমার আনন্দোজ্জ্বল সম্ভাষণ তাঁকে জানাচ্ছি, শুভ কামনাটা অন্তরে। তিনি আমাদের 'কেয়া ফুলের' সুবাস পুনঃ পুনঃ দিন; বধুর মর্ম-ব্যথা আমাদের অসাড় হৃদয়ে সহানুভূতি আনুক, তাঁর অন্ধকার আমাদের পথ দেখাক।

তোমাদের—শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

৪, বলরাম বসু ঘাট রোড
ভবানীপুর

ভাই কালিদাস,

আমি পীড়িত—শয্যাগত। আমি তোমাদের এই সদনুষ্ঠানে যোগ দিতে পারলাম না এজন্য বড়ই দুঃখিত।

তুমি জান, আমি চিরদিনই যতীনবাবুর রচনার অনুরাগী। এই উপলক্ষে আমার কিছু লিখবার এবং সভায় তা পড়বার ইচ্ছা ছিল। তা'ত হলো না। তুমি আমার হ'য়ে সুহৃদবর যতীন্দ্রমোহনকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন জানাবে। প্রার্থনা করি, তিনি দীর্ঘায়ু হ'য়ে কাব্য-সাহিত্যের সম্পদ বৃদ্ধি করুন। ইতি—

তোমার
শ্রীসতীশচন্দ্র ঘটক

কলিকাতা
৩নং সুকিয়াস রো

প্রিয়বরেষু,

ভাই কালিদাস, তোমার পত্র পাইলাম। তোমরা যে 'রসচক্র'-এর পক্ষ হইতে কবি শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহনের সংবর্ধনা করিতেছ ইহা বড়ই আনন্দের কথা। তোমাদের সাহিত্য প্রতিষ্ঠানটির এই সাধু উদ্যোগ সাহিত্যানুরাগী বাঙ্গালীমাত্রে

সুখী হইবেন। নানা কার্য্যের ঝঞ্ঝাটে তোমাদের এই শুভ অনুষ্ঠানে যোগ দিবার অবসর ঘটিয়া উঠিবে না। আশা করি তুমি ও 'রসচক্র'-এর অন্য বন্ধুগণ আমার অনুপস্থিতি মার্জনা করিবেন। তোমাদের উদ্যান সম্মিলনী সার্থক ও সাফল্যমণ্ডিত হউক, কবি শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন এবং সমাগত সাহিত্যিকমণ্ডলী তোমাদের হৃদ্যতায় ও প্রীতিতে আপ্যায়িত হউন, ইহাই আমাদের আন্তরিক কামনা। আমি উপস্থিত থাকিতে পারিব না বলিয়া বিশেষ দুঃখ অনুভব করিতেছি—তুমি শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহনের কবিপ্রতিভা ও সাহিত্যসাধনার প্রতি আমার হার্দ্দিক শ্রদ্ধা ও অনুরাগ আমার পক্ষ হইতে জ্ঞাপন করিবে। কবিবর দীর্ঘকাল ধরিয়া, শতায়ু হইয়া, সুস্থ দেহে ও মনে বঙ্গভারতীর আসন তাঁহার নব নব কবিতাপুষ্পের দ্বারা অলঙ্কৃত করিতে থাকুন, বাঙ্গালী জাতিও তাহার সৌরভে-মুগ্ধ হইয়া চিরকালের নিমিত্ত তাঁহার জয়গান করুক। কবির সাধনা যতদিন ধরিয়া আমাদের ভাষা ও সাহিত্য থাকিবে ততদিন ধরিয়া জয়যুক্ত হউক, তাঁহার লেখনী মুমূর্ষু বাঙ্গালী জাতির পক্ষে অমৃতবর্ষিণী হউক, শ্রীভগবানের নিকট ইহাই আমার আন্তরিক প্রার্থনা। ইতি—

৩রা ভাদ্র, বঙ্গাব্দ ১৩৩৮
তোমাদের
শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

49, Georgetown
ALLAHABAD
9.8.31.

মান্যবরেষু,

আপনার পত্র পাঠ করিয়া অত্যন্ত সুখী হইলাম। কবিবর যতীন্দ্রমোহন বাগচীকে যে আপনারা অভিনন্দন দিতেছেন ইহা অতীব আনন্দের বিষয়। আমার জ্যেষ্ঠভ্রাতা কবিবর ৺দেবেন্দ্রনাথ সেন-এর সহিত তাঁহার গভীর সখ্য ছিল। আমার ভ্রাতা তাঁহার উপর একটি কবিতা রচনা করেন। তিনিও তাহার যথোপযুক্ত প্রত্যুত্তর প্রদান করিয়াছিলেন।

কবিবরের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হইবার সৌভাগ্য আমার ঘটে যখন তিনি কয়েক বৎসর পূর্ব্বে সপরিবারে আমার গৃহে পদার্পণ করেন। তিনি যে কবির সমাজে অগ্রগণ্য তাহা সুধীমাত্রেই অবগত আছেন। এ সম্বন্ধে আমার

বলা বাহুল্য মাত্র। এই পত্রে তাঁহার প্রতি আমার আন্তরিক সহানুভূতি এবং শুভকামনা জ্ঞাপন করিতেছি। ভগবান তাঁহাকে দীর্ঘায়ু এবং বঙ্গভাষার সেবায় উত্তরোত্তর সামর্থ্যবান করুন ইহাই প্রার্থনা!

আশা করি আপনি কুশলে আছেন। ইতি—

বিনীত

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন

শ্রীশঃ

বোলপুর

২০।৮।৩১

সুহৃদবরেষু,

আপনার নিমন্ত্রণ-লিপি পাইয়া কৃতার্থ হইয়াছি। রসচক্র কবিবর যতীন্দ্রমোহনের সম্বর্দ্ধনার আয়োজন করিয়াছেন ইহা অত্যন্ত সন্তোষ এবং আনন্দের কথা; ইহা তাঁহার প্রাপ্য—আমরা এতদিন ঋণগ্রস্ত ছিলাম।

আমি অনুষ্ঠানে উপস্থিত হইতে পারিলাম না; আমার দুঃখের সীমা নাই। দূর হইতেই অনুষ্ঠানের সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করিতেছি। আমার শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন।

কবিবরের সুদীর্ঘ কাব্যসাধনা আমাদের হৃদয়ের সহিত রস সংযুক্ত হইয়া অমরত্ব লাভ করুক—তাঁহার আয়ুঃ নির্বিঘ্ন এবং দীর্ঘতম হইয়া দিন দিন অধিকতর রূপসমৃদ্ধ হউক সর্বান্তঃকরণে ইহাই কামনা করি।

সভাকে আমার নমস্কার জানাইতেছি। ইতি—

আপনাদের

শ্রীজগদীশ গুপ্ত

38, Nilkhet Road
P.O. Ramna, Dacca
24.8.1931

ভাই কালিদাস বাবু,

চিঠিতে সমুদয় অবগত হইলাম। আপনার পূর্বপত্রের উত্তর না দেওয়ার কারণ, সাহিত্য ও নিজ সাহিত্যিকজীবন প্রসঙ্গে আমি বর্তমানে মুনিবৃত্তি

অবলম্বন করিয়াছি ; সাহিত্যের কিছু করিবার ক্ষমতা বা উৎসাহ আর নাই—ও সঙ্গ ও প্রসঙ্গ বর্জন করিলেই শেষের কয়টা দিন একটু শান্তিতে যাপন করা যাইতে পারে। আমাদের দিন গিয়াছে ; এবং সম্ভবতঃ বাংলা সাহিত্যের এখন কিছুকাল মোহাবস্থা চলিবে, তাই সাহিত্যপ্রসঙ্গে কিছু লিখিতে আর প্রবৃত্তি হয় না। আপনাদের রসচক্রের যে পরিচয় মাঝে মাঝে পাই তাহাতেও বিশেষ উৎসাহ বোধ করি না ; তথাপি আপনাদের নিরুৎসাহ করিতেও চাই না—আপনাদের জীবনীশক্তির জিদ্‌কে তারিফ করি। পান্তাভাত বাতাস দিয়া জুড়াইয়া খাওয়ার যে করুণ দৃষ্টান্ত আছে তাহাই মনে পড়ে—আপনাদের রসচক্রের চক্রবর্তীরা যদি সেই আত্মপ্রবঞ্চনার সুখ পান তবে তাঁহাদের বাহাদুরী আছে। দুই যতীন্দ্র ও আপনি নিজে যে আসরে সমাসীন, তাহাতে কখনও রসের অসদ্ভাব হওয়া সম্ভব নয় বটে। কিন্তু রস পরিবেশনে অরসিকের পাত্র বিনা জল মিশ্রণে ভরিয়া দিতে পারেন কি ? আজিকার এই তরুণোৎসবে তাড়ির পরিবর্তে সোমরসের প্রচলন কি নিতান্তই চক্রান্ত-সাপেক্ষ নয় ? দুয়ার জানালা ভাল করিয়া বন্ধ করিতে হয়, এবং অতিশয় মৃদুস্বরে সোম-সাম গাহিবার কালে, মাঝে মাঝে অপেক্ষাকৃত উচ্চ-স্বরে কিছু কিছু অথর্ব-মন্ত্রও তাহাতে যোজনা করিতে হয়, নতুবা একঘরে হওয়া অবশ্যম্ভাবী। কাজেই 'রসচক্র' সম্বন্ধে আমার আশা আশঙ্কামুক্ত নয়। আপনার দ্বিতীয় পত্রে আপনাদের সে অবস্থাসঙ্কটের আভাস আছে।

বাংলাদেশে কবি বা কাব্যের আদর এককালে কিছু ছিল। মধুসূদন দত্ত হাসপাতালে মরিলেও, তিনি জীবদ্দশায় যে স্নেহ, আদর ও সম্মান পাইয়াছিলেন তাহা অল্প নহে ; তখনও বাংলাদেশে শিক্ষিত ও অশিক্ষিত দুই জাতীয় রসিক-সমাজ ছিল—বাঙ্গালী কবিতা বুঝিত। সহসা কাব্যের আদর্শ বদলাইয়া গেল কিন্তু বাঙ্গালী সাধারণের রসপিপাসা ভিন্নমুখী হইতে চাহিল না। রবীন্দ্রনাথকে ঘেরিয়া মুষ্টিমেয় শিক্ষিত বাঙ্গালী, রামমোহন রায়ের ধর্মসভার মত, একটি অন্তরঙ্গ রসিক সমাজ বা রসচর্চার Inner Circle গড়িয়া তুলিল—তাহার পর হইতে সাধারণের সঙ্গে চিত্তব্যবধান ক্রমশঃ বাড়িয়া চলিল, ফলে বাঙ্গালীর সর্বরসক্ষুধার তৃপ্তিমার্গ হইল রঙ্গমঞ্চের নাটকাভিনয় ; গিরিশ ঘোষ ও ডি. এল. রায় প্রমুখ কবিই হইলেন তাহাদের রসস্রষ্টা। এও ছিল ভালো ; রবীন্দ্রনাথের আদর্শ ভিন্ন সমাজে নিজ বিশুদ্ধি রক্ষা করিয়া বাংলাসাহিত্যের aristocracy অক্ষুণ্ণ করিবার উপায় করিয়াছিল। কিন্তু শীঘ্রই, বিশেষতঃ রবীন্দ্রনাথ Nobel Prize পাওয়ার পর হইতে সাহিত্যের এই হীনযানী সম্প্রদায় বড় গোল বাধাইল, রবীন্দ্রনাথের মহাকবিত্ব একটা sentiment-এর বস্তু হইয়া দাঁড়াইল, তাহা না বুঝিবার ভান

না করিলে fashionable হওয়া যায় না। এই অবুঝ ভক্তির প্রবল প্রবাহে কোনও রসবোধের বালাই আর রহিল না—মুড়ী ও মিছরী এক দরে বিকাইতে লাগিল—যাহা বুঝি না তাহাই যখন উৎকৃষ্ট, তখন যাহা উৎকৃষ্ট তাহাও বুঝিবার প্রয়োজন আর রহিল না। এমনি করিয়া জেলেপাড়া ও বামুন পাড়া amalgamate হইয়া গেল। কবিতা বুঝিবার অধিকার সকলেরই আছে। ভালো লাগা না লাগার কোনও শাস্ত্র নাই—যাহা কস্মিনকালে বুঝি নাই এবং ভালো লাগে নাই তাহাও যখন উৎকৃষ্ট, তখন ভালমন্দ যাহা কিছুকে একটি উদার মনোভাবের দ্বারা বরণ করিয়া আত্মরুচির জয়ঘোষণায় এবং রসবোধের ক্ষেত্রে সর্বাশ্রয়ী 'ভূমা'র প্রতিষ্ঠায় আর কোনও বাধা রহিল না। এই গড্ডালিকা বৃত্তির চরম পরিণাম অতি আধুনিক সাহিত্যসমাজে প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। এ যে "মাল্লাদের জাত—কে দেয় কার-হাত"! এ ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথের উত্তরজীবনের ব্যক্তিগত প্রভাব গৌণ ও মুখ্যভাবে কাজ করিয়াছে ও করিতেছে। এ বিষয়ে এখানে কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই। বর্তমানে তাহারাই সাহিত্যের 'অধিকারী' যাহাদের বিদ্যা বুদ্ধি জ্ঞান রুচি ও রসবোধ এ সকলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে; তাহারাই সাহিত্যস্রষ্টা যাহারা বাংলা ভাষা ও বাঙ্গালীয়ানাকে অস্বীকার করিয়া আধুনিক য়ুরোপের হট্টগোলের চীৎকারটাকেই গ্রামোফোন যন্ত্রের মত বিকৃত করিয়া পথে ঘাটে সাহিত্যিক পণ্যশালার বিজ্ঞাপনবৃদ্ধি করিতেছে। পত্রিকা-সম্পাদক পুস্তক-বিক্রেতা ইহাদেরই পৃষ্ঠপোষক, না হইলে ব্যবসায় চলে না। এহেন সমাজে সরস্বতীর আসন কোথায়? যাঁহারা সারস্বত আদর্শের সাধনা করেন তাঁহারাই জাতিচ্যুত। আপনি লিখিয়াছেন মল্লবীর ও Cinema অভিনেত্রীর ও সম্মান আছে, কবির নাই—ইহাই ত স্বাভাবিক। কবিকে চায় কে? কবিতায় যদি মল্লক্রীড়া ও Cinema অভিনেত্রীর হাবভাবপটুতা থাকে (হাবভাবপটুতাও নয়—বীভৎস নগ্নতা) তবে তাহাই দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে। অভিজাত শ্রেণীর মাসিকপত্রগুলিতে দেখিতে পাই—এক রবীন্দ্রনাথের ছাড়া আর কাহারও কবিতা কখনও কোনও ক্রমে প্রথম পৃষ্ঠায় স্থান পাইতে পারে না; এবং ফোটো-সম্বলিত পরিচয় দাবী করিতে হইলে অন্ততঃপক্ষে চিত্রকর হওয়া চাই—তা যেমন চিত্রকরই হউন। কবিতার প্রতি এই প্রগাঢ় শ্রদ্ধার জন্যই কবিতা নির্বাচনেও কোনও ধর্মতত্ত্ব থাকে না। এ অবস্থায় আপনারা মনের দুঃখে যে প্রতীকারপন্থা আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহাতে কাঁদিতে গিয়াও না হাসিয়া পারিতেছি না।

আমার মনে হয়, আজিকার দিনে যে সম্মান কবির পক্ষে দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে

সে সম্মান দিতে পারে এমন লোকও নাই। আজিকার দিনে জনপ্রিয়তার কোন মূল্য নাই এই জন্য যে, এখন কবির প্রশংসাও মতবাদমূলক, কাব্যরস-বোধের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়, সে Culture ধ্বংস পাইয়াছে। কোন কবিকে সম্মান করিব কেন?—না, তিনি অভিনব নীতি বা মনস্তত্ত্বের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, তিনি বিদ্রোহ করিয়াছেন, তিনি সুন্দরকে অপমান করিয়াছেন;—অর্থাৎ যাহারা কোন কালে রসের ধার ধারিত না, এবং আজকাল শিক্ষিতের নামে যাহাদের সংখ্যাধিক্য অতিরিক্ত হইয়া উঠিয়াছে তাহাদের সেই বেরসিকতা ও রুচিহীনতার প্রশ্রয় যে দেয় সেই-ই কবি-সম্মানের অধিকারী। ইহাদের নিকট সম্মানলাভের লোভ দমন করাই সকল সুকবির আত্মসম্মান রক্ষার পক্ষে আবশ্যক। অতি-আধুনিক বাংলাসাহিত্যে কাব্যের যে আদর্শ প্রতিষ্ঠা লাভ করিতেছে, তাহাতে আমাদের মত অ-কবির অসম্মানই গৌরবকর। বাংলা ভাষার যে দুর্গতি দেশসুদ্ধ শিক্ষিত-অশিক্ষিত প্রাচীন ও নবীন যে ভাবে সমর্থন করিতেছে, তাহাতে মনে হয়, সম্মান তো দূরের কথা দাঁড়াইবার স্থানটুকুও আর রহিবে না। কবিতার এই গণিকাবৃত্তির যুগে যাহারা সাহিত্যের পণ্যশালার দালাল অথবা খরিদ্দার তাহাদের নিকট যদি সম্মানের আশা করিতে হয় এবং তাহা না পাইলে যদি দুঃখ হয় তাহা হইলে আপন কাব্যলক্ষ্মীর প্রতিই শ্রদ্ধার অভাব প্রকাশ পায়। এ দুর্দিনে কবির একমাত্র সান্ত্বনা নিজের একক নিঃসঙ্গ বাণীপূজার আত্মতৃপ্তি। আর একটা সান্ত্বনা এই বিশ্বাসে যে, যদি রসসৃষ্টি করিয়া থাকি অর্থাৎ যদি কাব্যের সত্যসাধনা করিয়া থাকি তবে যে অদৃশ্য রস সঞ্চারপথ গোপনে প্রাণ হইতে প্রাণে আনন্দ-সংবেদনার অববাহিকারূপে বিরাজ করিতেছে, সেই পথে কত অপরিচিতের সঙ্গে মন জানাজানি হইবেই, রস-সৃষ্টির দ্বারা সেই আত্মীয়তা বা আত্ম-সম্প্রসারণ কখনও ব্যর্থ হইতে পারে না।

আপনাদের অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য যদি কবিকে সম্মান দেওয়াই হয়, তবে তাহাতে আমার আস্থা নাই; কারণ এরূপ আত্মীয়সমাজ, কবির প্রাপ্য যে সম্মান তাহা দান করিতে সমর্থ নয়। এ যেন "দুধের সাধ ঘোলে মিটানো।" ইহার ভিতরে যেন একটা দৈন্য বোধ উঁকি দিতেছে। আমার ঘরে আমার বন্ধুকে সম্বর্ধনা করিব—এ সম্বর্ধনার যাহা কিছু মূল্য তাহা ওই ব্যক্তিগত স্নেহ ও শ্রদ্ধা। যে সম্মান বাহিরের সমাজে কবির প্রাপ্য তাহার সম্বন্ধে অবিচার হইয়াছে বলিয়া আমাদের, অর্থাৎ কবির চিরভক্ত আত্মীয় কয়েকজনের নূতন করিয়া এই শ্রদ্ধা জাহির করার কোনও আবশ্যকতা আছে? আমরা কাহাদের প্রতিনিধি? নিশ্চয়ই নিজেদেরই। তবে তাহাতে কবির সম্মান বৃদ্ধি পাইল

কোথায় ? বরং এই যে বাহিরের বিরুদ্ধেই যেন ঘরের মধ্যে আশ্রয় লইয়া আমরা আমাদের শ্রদ্ধার দ্বারা একটা প্রতিবাদভঙ্গি করিতেছি ইহাতে আমাদের ব্যর্থ-বাসনার অভিমানই কি ফুটিয়া উঠে না ? আমাদের যে শ্রদ্ধা সম্বন্ধে কাহারো মতামতের অপেক্ষা রাখি না, যে শ্রদ্ধার অস্তিত্ব সম্বন্ধে বাহিরের কেহ সংশয় প্রকাশ করাও আবশ্যক বিবেচনা করে না, তাহাকেই একটু ঘটা করিয়া বিজ্ঞাপন করিলে কবির অনাদায় সম্মানের কোন ক্ষতিপূরণ হইবে ? আমার মনে হয় ইহাতে একটা কাঙালপনার ভাব ধরা পড়ে। তাই আপনাদের উদ্দেশ্যসিদ্ধির পক্ষে এরূপ অনুষ্ঠানের সার্থকতায় আমার সন্দেহ আছে।

কিন্তু যদি বাইরের দিকে না চাহিয়া কেবলমাত্র অন্তরঙ্গজনের আন্তরিক শ্রদ্ধা-জ্ঞাপনের জন্য একটি একত্র উৎসবের আনন্দ উপভোগ করাই আপনাদের উদ্দেশ্য হয়, তবে সে উৎসবে আমাকে নিমন্ত্রণ করিয়া আপনারা আমার সম্মান করিয়াছেন। কবি যতীন্দ্রমোহনের কাব্য আমার সাহিত্যিক জীবনের উন্মেষকালের সহিত একটি সুখমধুর স্মৃতি জড়িত হইয়া আছে। কতদিন হইয়া গেল তবু মনে হয় সেদিন যতীন্দ্রমোহন তাঁহার তৎকালীন কলিকাতাস্থ গৃহে একটি অতিশয় ভাবপ্রবণ কবিতামুগ্ধ বালকের সাক্ষাৎ প্রায়ই পাইতেন, এবং সস্নেহে তাহার সেই কাব্যানুরাগকে লালন করিতেন। তখন আমি কবিযশঃপ্রার্থী ছিলাম না, কবিহৃদয়সন্ধানী ছিলাম। যতীন্দ্রমোহন সেকালের সেই পরিচয়হীন অর্বাচীন বালককে এক মুহূর্তে সমধর্ম ও সমপ্রাণের অধিকারগৌরব দিয়াছিলেন। তাঁহার কবিতার ছন্দমাধুর্য ও লিপিকুশলতা আমাকে অপার বিস্ময়ে অভিভূত করিত—কি যে আনন্দ পাইতাম, আজ এই পরিণত বয়সের অভিশাপে তাহার কণামাত্রও ফিরিয়া পাই না। একটি অতি কোমল ও গভীর অনুভূতি, একটি সহজ ও সরল ভাবজীবনের রোমান্স, বাস্তবের খররৌদ্রদীপ্তির অবকাশে ছায়ানিকুঞ্জের পত্রমর্মর অথবা স্তব্ধ জ্যোৎস্নারাত্রে স্রোতস্বিনীর কল-ব্যথার মত একটা অনতি-প্রকট উগ্রতাহীন যে করুণ গভীর বেদনা তাঁহার কবিতার মধ্যে অনুভব করিতাম—সেই ব্যথার একটি পেলবভঙ্গী ভাষায় ও সুরে আজও তাঁহার কবিতায় বিদ্যমান। শ্রাবণ সংখ্যার 'উপাসনা'য় তাঁহার কবিতাটি এখনও তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। এই সুর ও তাহার ভাবা যতীন্দ্রমোহনের স্বকীয়। খাঁটি বাংলা লিরিকের একটি বিশিষ্ট রূপ এই সকল যতীন্দ্রমোহনী কবিতায় বাঙ্গালীর রসপিপাসা চরিতার্থ করিয়াছে। যতীন্দ্রমোহনের কাব্যে (তাঁহার স্বকীয় কবিতাগুলিতে) প্রকৃতি ও মানব-হৃদয়ের একটি অতি সহজ সরল অনাড়ম্বর মধুর সম্পর্কের দিক ফুটিয়া উঠিয়াছে—সেখানে কোমও জোরজবরদস্তি নাই, কল্পনার দুরূহ প্রয়াস বা

ভাবনার ধর্ম্ম‌ভঙ্গ পণ নাই—আছে আলো-ছায়ার সহজ মাধুরী, সমবেদনার শরৎ-প্রসন্নতা। কিন্তু সবচেয়ে গৌরবজনক তাঁহার ভাষার শুচিতা। এইখানেই তাঁহার রবীন্দ্রশিষ্যত্বের সার্থকতা। রবীন্দ্রোত্তর বাংলাকাব্যে বাংলা ভাষার মর্য্যাদা রক্ষা যাঁহারা করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে যতীন্দ্রমোহন অগ্রগণ্য। বঙ্গভারতীর—সকল ভারতীরই—সেবকের পক্ষে ভাষাসম্বন্ধে যে দিব্য রুচি ও সহজাত নিষ্ঠার প্রয়োজন—যে গুণের অভাব ও সদ্ভাব সাহিত্যিক প্রতিভা নির্ণয়ে সর্বপ্রথম লক্ষণ, যতীন্দ্রমোহনের সাহিত্যসাধনায় সেই লক্ষণ চিরদিন বিদ্যমান; এই instinct তাঁহাকে কখনও ত্যাগ করে নাই, মূলে ধর্মভ্রষ্ট তিনি কখনও হন নাই। তাঁহার সম্বন্ধে এই কথাটা সর্বত্র স্মরণযোগ্য। তাঁহার কাব্যে এই ভাষাই স্পন্দিত হইয়াছে, অতি সরল স্বাভাবিক সুখদুঃখ সৌন্দর্য্য-সংবেদনায়, ভাব ভাষায় idiomকেই আশ্রয় করিয়া বড় সুন্দর ভঙ্গি ধরিয়াছে। আমার মনে হয়, যতীন্দ্রমোহনের কবিশক্তির একটা বৈশিষ্ট্য এই যে তিনি তাঁর উৎকৃষ্ট lyrics-গুলিতে একটি অতি Simple emotion-কে একটা বিশেষ ক্ষণ বা মুহূর্তের তীব্রতায় উদ্ভাসিত করিতে পারেন—lyric অনুভূতিকে একটা dramatic situation-এ মণ্ডিত করিয়া তাহাকে আরও real ও concrete করিয়া তোলেন। উদাহরণস্বরূপ 'অন্ধবধূর' উল্লেখ করা যাইতে পারে। এবার তাঁহার 'উপাসনা'র কবিতাটিও ওই ধরনের। কিন্তু তাঁহার অনেক কবিতার যে একটি মধুর করুণ লিরিক আকৃতি আছে—তাহার সরলতার মধ্যেই একটি আশ্চর্য্য নৈপুণ্য আছে তাহাই বোধহয় আমার সেকালের সেই unsophisticated প্রাণকে এমন করিয়া মুগ্ধ করিত। "বাতাবী কুঞ্জে সন্ধ্যার পর পুষ্প-পরাগ-চোর। কলঙ্কী মন! চেয়ে দেখ আজ সঙ্গী মিলেছে তোর"—এর মোহ আজও ঘুচে নাই।

যতীন্দ্রমোহন একান্তভাবে বাঙালীর প্রাণ ও বাংলা ভাষার পূজারী। তাঁহার কবিতায় বাঙ্গালীর গ্রাম-গৃহ-অঙ্গন শরৎ জ্যোৎস্না গোধূলিতে স্নেহ-প্রেম-মমতার অমুখর গীতিগুঞ্জনে ভরিয়া উঠে। আজিকার দিনে এ কবিকে চায় কে? এ যুগে বাঙ্গালী হওয়ার মত অপরাধ আর আছে কি? তাই যতীন্দ্রমোহনের মত কবি অপাংক্তেয়; তাঁহার ভাষা বাংলা বলিয়াই তাহা অশ্রদ্ধেয়। আজ এই যুগসন্ধির মন্বন্তরে কিছু বলিয়া ফল নাই। কবিকে চিরন্তনী বঙ্গমাতার চরণে সমর্পণ করিয়া আপনারা তৃপ্তি লাভ করুন! ইতি—

আপনাদের
শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

রসচক্রে যোগদান

1/C Lake Rd.
Kalighat

শ্রীচরণকমলেষু,

শরৎদাদা, আমাদের রসচক্রের পক্ষ হইতে কুমুদবাবু আপনার কাছে যাইতেছেন। কুমুদবাবুর মুখে সব কথা শুনিবেন।

Text Book লইয়া বড়ই বিব্রত আছি, নতুবা আমিই যাইতাম। আমরা রসচক্রের পক্ষ হইতে আপনাকে অভিবাদন ও প্রণাম জানাইতেছি। ইতি—

আপনার স্নেহানুগত
শ্রীকালিদাস রায়

কালিদাস,

কুমুদবাবুর কাছে সমস্ত শুনলাম। আনন্দের সঙ্গে অর্থাৎ পরমানন্দে সম্মতি দিলাম। শুধু দেখো ভাষাটা যেন গোড়ার লেখাটার সঙ্গে মেলে। নইলে একটুখানি বেমানান্ দেখাতে পারে।

শরৎদাদা

তোমার রসচক্রে একদিন যোগ দেবার বাসনা রইলো।

পরম শ্রদ্ধাস্পদ সুহৃদ

কথাশিল্পী শ্রীযুক্ত অসমঞ্জ মুখোপাধ্যায় মহোদয়ের শ্রীকরকমলে—

হে রসশিল্পী, তুমি তোমার শান্ত-সংযত অনাড়ম্বর সাহিত্য-সাধনার দ্বারা যে অনাবিল আনন্দ দান করিয়াছ, তাহার প্রতিদানস্বরূপ আজ তোমাকে আমরা শ্রদ্ধাভরে অভিনন্দিত করিতেছি।

উপেক্ষার খর রৌদ্র-দাহে, দৈবদুর্বিপাকের ঝঞ্ঝা-বজ্রে, দৈন্য-দুঃখের তুষার-পাতে কখনও তোমার চিত্তের বসন্তশ্রী ও জীবনের রস-প্রফুল্লতা বিনষ্ট হয় নাই। তোমার জীবনের বহিরঙ্গের সকল রস-মাধুর্য্য নিষ্করুণ কাল ক্রমে শোষণ করিয়া লইতেছে, কিন্তু অন্তরের অন্তস্তলে যেখানে তোমার রস প্রবাহের উৎস, সেখানে কালের প্রবেশাধিকার নাই। সেখানে তোমার জীবনের সকল গরল জ্বালা, সকল ক্ষুব্ধতা, সকল অশ্রু, রসধারায় পরিণত হইতেছে।

হে গুণি, আমাদের এই দুর্গতদেশের যাঁহারা সাহিত্যতীর্থের যাত্রী, তাঁহাদের অনেকেরই পথধূলি কঙ্করময়, কণ্টকাকীর্ণ ও ছায়াবর্জিত। তাঁহাদের প্রতিনিধি-স্বরূপ গণ্য করিয়া, আজ তোমাকে আমরা যে মর্য্যাদা দান করিলাম, তাহা তাপ-জ্বালাক্লিষ্ট, উপেক্ষা-লাঞ্ছিত, একনিষ্ঠ সাহিত্য সাধনারই উদ্দেশে নিবেদিত। যজ্ঞকুণ্ডে নিবেদিত সকল আহুতি যেমন হুতবহ দেবতাগণের সকাশে বহন করেন, তুমিও তেমনি আমাদের শ্রদ্ধাভিবাদন তোমার দুর্গমপথের সহযাত্রিগণের হৃদয়দ্বারে বহন কর।

যাঁহাদের পদমর্য্যাদা, পাণ্ডিত্য-খ্যাতি ও আভিজাত্য গৌরব আছে, যাঁহারা লক্ষ্মীর বরপুত্র, যাঁহাদের আনুকূল্যে ও অভিভাবকতায় বহু লোকের স্বার্থসিদ্ধ হয় তাঁহাদের স্তাবকের অভাব ঘটে না। যে সকল সাহিত্যসেবীর ধন, মান, পদ-গৌরব, প্রতিষ্ঠা ও কৌলীন্যবল আছে, তাঁহাদের বন্দনা গাহিয়া বহু লোকই কৃতার্থ হয়। কিন্তু সাহিত্য-মাধুরী ছাড়া যাঁহার অন্য কোন সম্বল নাই, রস-সাধনা ছাড়া যাঁহার অন্য কোন ব্রত নাই, তাঁহাকে কেহই কোনদিন মর্য্যাদা দান করে না। হে সর্ব-গৌরবহীন অনন্যব্রত রসশিল্পী, আজ তোমাকে অভিনন্দিত করিয়া আমরা অবিমিশ্র সাহিত্যসেবাকেই সম্মানিত করিলাম।

হে রসলক্ষ্মীর মালঞ্চের মালাকার, রসরাজের চরণে আমাদের আকিঞ্চন, তোমার কুটীরাঙ্গনের মালঞ্চখানি সকল দীনতা, সকল রিক্ততা, সকল কণ্টকক্ষত এমনি নব নব পুষ্প সমারোহে সমাচ্ছন্ন করিয়া বহুবর্ষ ধরিয়া যেন মধুমাসকে বন্দী করিয়া রাখে। ইতি—২রা জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৪ সাল*

* অভিনন্দন-বাণী পাঠ করে শরৎচন্দ্র অভিনন্দনপত্রে সহি করলেন। তারপর কবিশেখরের দিকে চেয়ে বললেন—রসচক্রের সেক্রেটারী হিসাবে তুমিও এতে স্বাক্ষর কর। কবিশেখরও সই করলেন।

অভিনন্দনপত্রের লেখাটা শরৎচন্দ্রের নিজের লেখা নয় বলেই মনে হয়, কারণ অভিনন্দনপত্র লেখার মত ভাষা শরৎচন্দ্রের তেমন আয়ত্ত না থাকায় কবিশেখরের ওপরই ওটা লেখার ভার পড়ে, এই রকমই শুনেছিলুম। এরকম সমৃদ্ধ, সুন্দর ও সালঙ্কার শব্দসম্ভারপূর্ণ রচনা কবিশেখর কালিদাস রায়ের দ্বারাই সম্ভব। মনে মনে তাঁকে অজস্র ধন্যবাদ জানালাম।

(অসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের গ্রন্থ)

কবিশেখর রচিত 'রচনাদর্শ' সম্বন্ধে শরৎচন্দ্রের অভিমত

শ্রীমান কালিদাস রায় আজ বাইশ বৎসর শিক্ষকতা করিতেছেন এবং দীর্ঘ ত্রিশ বৎসর ব্যাপি সাহিত্যসেবা করিয়া আসিয়াছেন; বাঙ্গালা ভাষা রচনায় ছাত্রগণকে আদর্শ রীতি শিক্ষা দেওয়ার অধিকার তাঁহার যতখানি আছে বলিয়া জানি, তাহা কম লোকেরই দেখিয়াছি। এত বড় কথাটা অকপটে বিশ্বাস করি বলিয়াই লিখিতে পারিলাম, না হইলে পারিতাম না; বলিতে নিজেরই লজ্জা করিত। তাঁহার এই রচনার বইখানি আমি আদ্যোপান্ত মনোযোগের সহিত, শ্রদ্ধার সহিত পড়িয়াছি এবং উপকৃত হইয়াছি। যে কেহ বাঙ্গালা ভাষা বিশুদ্ধ ও সরস করিয়া লিখিতে চাহেন, তাঁহাকেই পড়িতে অনুরোধ করি। পড়া ব্যর্থ হইবে না।

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

১৬ই ভাদ্র, ১৩৪২